অরণ্যবাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার কোনও ভদ্রপল্লীতে একটী দ্বিতল বাটী। বাটীটি পুরাতন এবং সংস্কারাভাবে জীর্ণ। বাটীটি দেখিয়া মনে হয়, পূর্ব্বে গৃহস্বামীর অবস্থা ভাল ছিল। বহির্ব্বাটীতে দুইটী বৈঠকখানা ঘর। দুইটী ঘরের মধ্যস্থলে সদর দ্বার। সেই দ্বার দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, একটী প্রশস্ত উঠানের মধ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। উঠানের এক দিকে পূর্ব্বোক্ত দুইটী বৈঠকখানা [illegible] বিপরীত দিকে উচ্চ ঠাকুর-দালান। ঠাকুর-দালানে [illegible]আর কোনও দেব-দেবীর পূজা হয় না। তাহার [illegible] বড় থামগুলি হইতে চুন বালি খসিয়া পড়িতেছে এবং ছাদ জীর্ণ হইয়াছে। ঠাকুর-দালানের এক কোণে কতকগুলি ভাঙ্গা বাক্স, পিপে ও আবর্জ্জনা-স্তূপীকৃত রহিয়াছে। বৈঠকখানা ঘর দুইটীও সংস্কারাভাবে প্রায় অব্যবহার্য্য হইয়াছে। আর তাহা যে কেহ ব্যবহার করে, তাহাও দেখিয়া বোধ হয় না। ঠাকুর-দালানের বাম পার্শ্বেই অন্তঃপুর। অন্তঃপুরের উঠান স্বতন্ত্র। বহির্ব্বাটীর সহিত অন্তঃপুরের কোনও সম্পর্ক নাই। কেবল গতায়াতের জন্য একটী দ্বার আছে মাত্র।

এই বাটীটি কোনও গন্ধবণিকের। বর্ত্তমান গৃহস্বামীর পিতামহ ব্যবসায় দ্বারা বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এই বাটী নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায় মহাসমারোহে দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া যান। তদীয় পুত্র অর্থাৎ বর্ত্তমান গৃহস্বামীর পিতাও, তাঁহার আমলে দুই চারি বৎসর পৈত্রিক উৎসবাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু উপর্য্যুপরি কয়েকবার ব্যবসায়ে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তিনি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন এবং বাটীখানি উত্তমর্ণের নিকট বন্ধক রাখিতেও বাধ্য হন। ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, তিনি অতিশয় চিন্তাকুল হন এবং অবস্থার উন্নতিসাধনার্থ প্রাণপণে যত্ন করেন; কিন্তু তাঁহার যত্ন সফল হয় নাই। নানা প্রকার ভাবনা-চিন্তায় তাঁহার শরীর জর্জ্জরিত ও স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়ে এবং কিছুদিন পরে তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীও পরলোক গমন করেন।

তাঁহার একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী ক্ষেত্রনাথ বর্ত্তমান গৃহস্বামী। পিতার মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়ঃক্রম আনুমানিক পঁচিশ বৎসর ছিল। ক্ষেত্রনাথ বাল্যকালে স্কুল ও কলেজে পড়িয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতার অবস্থান্তর ঘটায় বি-এ পাশ করিয়া আর অধিক পড়িতে পারেন নাই। তিনি বাধ্য হইয়া কলেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতার কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহাদের

ব্যবসায়ের উন্নতি হইল না। যাহা আয় হইত, তাহা সংসারের খরচেই নিঃশেষ হইতে লাগিল। এদিকে মহাজনের ঋণও দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সুদে মূলে ক্রমে ক্রমে তাহা বৃহদাকার ধারণ করিল। ইহার উপর পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে এবং দুই বৎসর পরে একটী ভগিনীর বিবাহ দিতে ক্ষেত্রনাথকে আরও টাকা কর্জ্জ করিতে হইল। হাজার চেষ্টা করিয়াও ক্ষেত্রনাথ দুই সহস্র টাকার কমে ভগিনীর শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন করিতে পারিলেন না। এইরূপে ক্ষেত্রনাথ পিতা অপেক্ষাও অধিকতর ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। এদিকে তাঁহার পরিবারবর্গও দিন দিন সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন তাঁহার ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাঁহার তিনটী পুত্র ও একটী কন্যা। কন্যাটি সর্ব্ব কনিষ্ঠা।

ক্ষেত্রনাথের পত্নী মনোরমা উচ্চবংশজাতা, সাধ্বী ও সুশীলা। স্বামীর দুরবস্থা দর্শনে মনোরমা অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতেন এবং তাঁহার চিন্তাভার লাঘবের জন্য সামান্য খরচে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু যখন দুঃসময় আসে, তখন হাজার চেষ্টাতেও দুরবস্থা নিবারণ করা যায় না। কন্যাটীর জন্মের পর, মনোরমা কঠিন-পীড়াক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন। ক্ষেত্রনাথ কষ্টেস্থষ্টে পত্নীর চিকিৎসা করাইয়া সে যাত্রা তাঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন

হইয়া পড়িল। মনোরমার চিকিৎসা করাইতে গিয়া তাঁহার অলঙ্কারগুলিও ক্ষেত্রনাথকে বন্ধক রাখিতে হইল। সাধ্বীর করদ্বয় নিরাভরণ হইল। দুই চারি খান সামান্য মূল্যের কাচের চুড়ী পরিয়া মনোরমা সধবাচিহ্ন ধারণ করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ সেই ভঙ্গুর চুড়ী ভাঙ্গিয়া গেলে, সাধ্বী রমণী দক্ষিণ হস্তে লাল সূতা বাঁধিয়া কোনও প্রকারে সধবা-চিহ্ন রক্ষা করিতেন। এত কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও, মনোরমা এক দিনের জন্যও নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন নাই, অথবা স্বামীর প্রতি সামান্য বিরক্তভাবও প্রকাশ করেন নাই। হৃদয় সর্ব্বদা চিন্তাকুল থাকিলেও, তিনি সর্ব্বদা স্বামীর নিকট হাস্যমুখে উপস্থিত হইতেন এবং স্বামীকে নানা প্রকার উৎসাহ-বাক্যে আশ্বস্ত করিতেন। স্বামীকে মনোরমা দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। ক্ষেত্রনাথের এরূপ দুঃসহ কষ্টময় জীবনে মনোরমাই তাঁহার একমাত্র সুখের কারণ ছিলেন। কিন্তু মনোরমার ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকিতেন এবং মনে মনে ভাবিতেন, "মনোরমাই আমার অন্ধকারময় জীবনের একমাত্র আলোক। মনোরমার জন্যই এখনও আমি সংসারে দাঁড়াইয়া আছি। হায়, মনোরমা মরিলে আমি কি করিব?" যখনই ক্ষেত্রনাথের মনে এইরূপ চিন্তা উপস্থিত হইত, তখনই তাঁহার চক্ষু হইতে দরদর ধারে অশ্রু বর্ষিত হইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মকাল ; জ্যৈষ্ঠমাস ; রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়াছে। লোকে গরমের জ্বালায় "ত্রাহি ত্রাহি" ডাক ছাড়িতেছে। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ব্যক্তিরা বরফওয়ালার প্রতীক্ষা করিতেছে। কেহ ছাদে, কেহ বারাণ্ডায়, কেহ অন্যত্র শয়ন ও উপবেশন করিয়া শীতল বাতাসের অনুসন্ধান করিতেছে। মনোরমা দ্বিতলের বারাণ্ডায় একটী মাদুর পাতিয়া কন্যা ও দুইটী পুত্র সহ শয়ন করিয়া আছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্র এখনও দোকান হইতে প্রত্যাগত হয় নাই। ক্ষেত্রনাথ আজ পনর দিন কার্য্যান্তরে মফঃস্বলে কোথায় গিয়াছেন। তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অবধি বাড়ীতে কোনও চিঠি পত্র লিখেন নাই। মনোরমা স্বামীর কোনও কুশলসংবাদ না পাইয়া অতিশয় চিন্তাকুল আছেন। এদিকে সংসারেরও খরচপত্র নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে ভার হইয়া উঠিয়াছে। মুদীর দোকানে আর ধারে জিনিষপত্র পাওয়া যায় না ; তাহার অনেক টাকা পাওনা হইয়াছে। গোয়ালিনীর তিন চারি মাসের হিসাব নিকাশ হয় নাই ; সেও দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। মনোরমা কচি মেয়েটীকে নিজ স্তন্যপান করাইয়া কোনওরূপে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। ক্ষেত্রনাথের দোকানেও জিনিষপত্রের অভাবে বেচাকেনা এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। নগেন্দ্র দশ পনর দিনের মধ্যে যাহা

বিক্রয় করিয়াছিল, তাহা মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স দিতেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। নানারূপ চিন্তায় মনোরমার রাত্রিতে আর নিদ্রা হয় না। প্রায় সমস্ত রাত্রিই জাগরণে কাটিয়া যায়। অদ্যও মনোরমা মাতুরের উপর শয়ন করিয়া এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। বালক দুইটী ও কন্যাটী নিশ্চিন্তমনে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। সহসা সদর দ্বারের কড়া নড়িল এবং পরক্ষণেই নগেন্দ্র "মা মা" বলিয়া মনোরমাকে ডাকিল। মনোরমা নীচে নামিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং পুনর্ব্বার দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া পুত্রের সহিত উপরে আসিলেন। মনোরমা প্রদীপ জ্বালিয়া নগেন্দ্রের জন্য রক্ষিত আহারসামগ্রী বাহির করিয়া দিলেন।

আলোক প্রজ্বলিত হইবামাত্র, নগেন্দ্র দীপালোকের নিকট একটী কাগজ লইয়া পাঠ করিতে লাগিল। পাঠ শেষ হইলে, তাহার মুখমণ্ডল চিন্তাকুল ও বিবর্ণ হইল। মনোরমা নগেন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কিসের কাগজ, নগিন্?" নগেন্দ্র দুঃখিত মনে বলিল "আর কিসের কাগজ, মা? পনর দিনের মধ্যে মর্গেজের টাকা দিতে না পারিলে, আমাদের এই বাড়ীখানা বিক্রী হ'য়ে যাবে। তারই নুটীশ।"

মাতাপুত্রে আর কোন কথা হইল না। নগেন্দ্র চিন্তাকুল মনে আহার করিতে লাগিল। মনোরমা নগেন্দ্রের কথা

শুনিয়া অবধি দাঁড়াইতে কিম্বা বসিয়া থাকিতে না পারিয়া মাদুরের উপর শয়ন করিয়া পড়িয়াছিলেন।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। কোলাহলময়ী কলিকাতানগরী নিস্তব্ধপ্রায়। কেবল মধ্যে মধ্যে রাস্তার উপর যে দুই একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী যাইতেছে, তাহাদেরই ঘর্ঘর শব্দ এবং একটা কালপেঁচার বিকৃত ও বিকট স্বর নিশীথ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। নগেন্দ্রের কথা শুনিয়া অবধি, মনোরমার মস্তক ঘূর্ণিত ও সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই। আপনাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, মনোরমা চিন্তায় আকুল হইয়াছেন। বাটী বিক্রয় হইয়া গেলে, হায়, তাঁহাদের দাঁড়াইবারও আর স্থান নাই! ভগবান্ কি তাঁহাদের অদৃষ্টে এতই কষ্ট লিখিয়াছেন? শেষকালে কি পুত্রকন্যা লইয়া মনোরমাকে পথের ভিখারিণী হইতে হইবে? মনোরমার চক্ষে জল আসিল। চক্ষের জলে তাঁহার উপাধান ভিজিয়া যাইতে লাগিল। মনোরমা ভাবিতে লাগিলেন, "এই বেলা আমার মরণ হয়, তো বাঁচি।" সহসা মনোরমা শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন "হে হরি, হে কাঙ্গালের ঠাকুর, আমাদিগকে দয়া কর। আমাদিগকে এই বিপদে রক্ষা কর। প্রভু, তুমি বই আমাদের আর কেউ গতি নাই।" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে অশ্রুধারায় মনোরমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল এবং তিনি কাতর হৃদয়ে মাদুরের উপর বসিয়া রহিলেন।

সহসা সদর দ্বারে আবার কড়া নড়িবার শব্দ হইল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রনাথের কণ্ঠস্বরও শ্রুত হইল। ক্ষেত্রনাথ পুত্র নগেন্দ্রের নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। নগেন্দ্র সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। মনোরমা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া সদর দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাস্তায় গ্যাসের আলোকে ক্ষেত্রনাথ মনোরমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন "কে? মনোরমা? ছেলেরা সব ভাল আছে তো? তুমি কেমন আছ?" মনোরমা হাস্যমুখে বলিলেন "হাঁ, সব ভাল আছে। চল, ওপরে চল।" এই বলিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরের ঘরে আসিলেন।

মনোরমা তাড়াতাড়ি আবার প্রদীপ জ্বালিয়া স্বামীর হস্তপদ প্রক্ষালনের জন্য একঘটী জল ও গামোছা লইয়া আসিলেন। ক্ষেত্রনাথ হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। স্বামী রাত্রিতে কি আহার করিবেন, মনোরমা তাহা ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না। গৃহে আহারসামগ্রী কিছুই সঞ্চিত নাই। এই কারণে, মনোরমা ব্যাকুল ও কাতরনয়নে স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাহা বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "আমি কি খাব, তাই তুমি ভাবছো বুঝি? আমি খেয়ে এসেছি; তার জন্য চিন্তা নাই।" মনোরমা স্বামীর কথায় বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু

ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, রেলের গাড়ীতে আসিতে আসিতে তিনি বর্দ্ধমান ষ্টেশনে উদর পূর্ণ করিয়া খাইয়াছেন। আর কিছু খাইবার ইচ্ছা ও প্রয়োজন নাই। মনোরমা সে কথায় বেশ প্রত্যয় করিলেন না; কিন্তু স্বামী যখন বলিতেছেন যে, তাঁহার জন্য আহারসামগ্রীর আর প্রয়োজন নাই, তখন সাধ্বী আর কি করিবেন?

ক্ষেত্রনাথ পথশ্রম দূর করিয়া মাদুরের উপর উপবিষ্ট হইলে, মনোরমা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন এবং স্বামীর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সাংসারিক সুখদুঃখের কথা বলিতে লাগিলেন। সংসার অচল হইয়াছে; তাহার উপর বাটী বিক্রয়ের এক নুটীশ আসিয়াছে। এই-সমস্ত কথা বলিতে বলিতে মনোরমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল।

ক্ষেত্রনাথ মনোরমাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "বাড়ী যে বিক্রী হ'য়ে যাবে, তা' আমি জানি। বাড়ীখানা কিছুতেই রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বো না। এখন তোমার কি রকম বুদ্ধি-শুদ্ধি যোগাচ্ছে, বল দেখি?"

মনোরমা বলিলেন "আমার আর বুদ্ধিশুদ্ধি কি? আমার বুদ্ধি লোপ্ হয়েছে; দেখেশুনে, আমি বুদ্ধিহারা হয়েছি। ভগবান্‌কে তাই বল্‌ছিলাম—বলি, ঠাকুর, শেষকালে কি আমাদের পথের কাঙ্গালী ক'র্‌লে?" এই বলিয়া মনোরমা অঞ্চলে মুখ চক্ষু আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "দেখ, মনোরমা, বিপদের সময় এরূপ অধীর হ'লে চল্‌বে কেন? বিপদের সময় ধৈর্য্য চাই। আমি যে আজ পনর দিন বাড়ীতে ছিলাম না, তা আমি বিপদের প্রতীকারের জন্যই বিদেশে গিয়েছিলাম। আমি তো এক রকম ঠিক্ ক'রে এসেছি। এখন তোমার মত হ'লেই হয়।"

মনোরমা ব্যাকুলনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি, বল না?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "দেখ, আমি অনেক ভেবেচিন্তে দেখেছি, আমাদের মতন লোকের কল্‌কাতায় বাস না করাই ভাল। যারা বড়লোক, যাদের অনেক টাকাকড়ি, তাদের পক্ষেই কল্‌কাতা ভাল। আর এ অবস্থায় আমরা কল্‌কাতায় থাক্‌তে গেলে, ছেলেপিলে নিয়ে মারা পড়্‌বো। দেখ, বাড়ীখানা তো যাবেই। কলকাতায় থাক্‌তে গেলে, এখন আমাদের বাড়ী ভাড়া ক'রে থাক্‌তে হ'বে। একে এই সংসারের খরচপত্র চালাতে পারি না; তার উপর আবার বাড়ীভাড়া! এখানে কাজকর্ম্মেরও আর তেমন সুবিধা নাই। আমি এই বাড়ীখানা বেচে ফেলবার ঠিক্ করেছি। যা' টাকা পাব তাতে সমস্ত দেনা শোধ ক'রে, আমাদের হাতে প্রায় সাত হাজার টাকা থাক্‌বে। এই টাকাতে কল্‌কাতায় একখানা বাড়ী হ'তে পারে বটে; কিন্তু খাবার যোগাড় কই? দোকান-পাট আর চল্‌বে না। যদি এখন এই

টাকা নিয়ে অন্য কাজ করি, আর সে কাজেও লাভ কর্‌তে না পারি, তা হ'লে তো সবই যাবে; আমাদের বাঁচ্‌বার আর কোনও উপায় থাক্‌বে না। এই কারণে আমি মনে করেছি, এই টাকা নিয়ে আমরা কিছু দিনের জন্য বিদেশে বাস কর্‌বো। পাড়াগাঁয়ে খরচপত্র কম; আর যেখানে আমরা যাব মনে করেছি, সেখানের জল-বায়ুও খুব ভাল। তোমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেছে। ডাক্তার তোমাকে পশ্চিমে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু টাকাকড়ির অভাবে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি নাই। এখন অনায়াসেই তোমার পশ্চিমে থাকা ঘট্‌বে। আর সেখানে কাজকর্ম্মেরও সুবিধা আছে। যোগাড় করে কাজ চালাতে পার্‌লে, দুই পয়সা রোজগার হবারও সম্ভাবনা আছে। সেখানে থাক্‌লে, তোমাকে সংসারের খরচপত্রের জন্য আর কিছু ভাবতে হবে না।"

মনোরমা উৎসুক-হৃদয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে দেশ কোথায়?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "কল্‌কাতা থেকে অনেক দূর; কিন্তু রেলে একদিনেই যাওয়া যায়। জায়গাটি ছোটনাগ-পুরে; রেলের ষ্টেশন্‌ থেকে তিন ক্রোশ দূরে। সেখানে বল্লভপুর নামে একটী গ্রাম আছে; সেই গ্রামটি ২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকায় আমি খরিদ কর্‌বার কথাবার্ত্তা স্থির করেছি। গ্রামটিতে প্রায় আড়াই হাজার বিঘা জমি

আছে। ষাট সত্তর ঘর প্রজা আছে। পাহাড় আছে; শালের জঙ্গল আছে। দেখ্‌লেই তোমার মন খুসী হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে আমাদের দেশের লোক নাই যত লোক, সেই দেশেরই। তারা কেমন একরকম খোট্টা-বাঙ্গালায় মেশামিশি কথা বলে, তা শুন্‌লেই হাসি পায়। কিন্তু লোকগুলি ভাল।"

মনোরমা স্বামীর কথা শুনিতে শুনিতে অন্ধকার মধ্যে যেন আলোক দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মন অনেকটা প্রফুল্ল হইল। কিন্তু তিনি জীবনে কখনও কলিকাতার বাহিরে যান নাই। বিদেশে তাঁহারা একাকী কিরূপে থাকিবেন, তাহাই তাঁহার ভাবনা হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি যা ভাল মনে কর্‌চো, তাই কর। আমি আর কি বল্‌বো? বলি, সে দেশে কি আমাদের দেশের কোনও লোক নেই?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আছে বই কি? তবে আমরা যেখানে থাক্‌বো, সেখানে কেউ নাই বটে। দশ বার ক্রোশ দূরে আছে। তুমি যে তাকে চেনো না। ঐ চাঁপাতলার নীলমণি মুখুয্যে সেখানে মেয়েছেলে নিয়ে আছে। তার সেখানে দুইখানা গ্রাম। সে রাজার মত সেখানে আছে। কোনও কষ্ট নাই। নীলমণি আমাদের সঙ্গে প'ড়্‌তো, তারপর শালকাঠের জঙ্গল নিয়ে সেই দেশে কাঠের ব্যবসা কর্‌তে কর্‌তে সে এই রকম বিষয়পত্র

করেছে। সেই তো আমাকে আমাদের কষ্টের কথা শুনে সব কথা বলে। তারই তো কথা শুনে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। সেই আমাকে বল্লভপুর গ্রামটি খরিদ ক'রে দিচ্ছে। তুমি কিছু ভেবো না। আমরা সেখানে গেলে, ভালই হ'বে। অন্নের সুখে অরণ্যে বাস। ভগবান দিন দেন, তো আবার আমরা কল্‌কাতায় আস্‌বো।"

সে রাত্রিতে আর বেশী কথাবার্তা হইল না। দুঃখ-দারিদ্র্যের এত যন্ত্রণার মধ্যেও, দম্পতির মনে সে রাত্রিতে যেন সুখের আশা সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্ষেত্রনাথ দুই চারি দিনের মধ্যেই বাটী বিক্রয় করিয়া উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন এবং বল্লভপুরে গিয়া তাহারও কোবালা সম্পাদিত ও রেজেষ্টরী করিয়া লইলেন। অতঃপর তিনি পরিবারবর্গকে বল্লভপুরে লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন। তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া বিদেশে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা শুনিয়া তাঁহাকে যাঁরপর-নাই তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন "ক্ষেত্তর, তোমার মত আহাম্মক লোক আর দুটী দেখি নাই, হে। আরে, কল্‌কাতা ছেড়ে কি কোথাও যেতে আছে?

এখানে একবেলা শাকান্ন খেতে, তাও ভাল ছিল। কোথায় বন জঙ্গল, বাঘ ভালুক আর ধাঙ্গড়ের মধ্যে বাস করতে যাবে? সহুরে লোক কি পাড়াগাঁয়ে বাস করতে পারে? মারা পড়বে যে! দেখ্‌ছ না, পাড়াগেঁয়ে মেড়ারা পাড়াগাঁ ছেড়ে কল্‌কাতায় এসে বাস কর্‌ছে, আর তুমি কিনা, সেই কল্‌কাতা ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে চল্লে! তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে, দেখ্‌ছি।” ক্ষেত্রনাথের শ্বশুর মহাশয় একজন অবস্থাপন্ন লোক। জামাতার কষ্টের সময়ে একবার তাঁহাদের খোঁজ খবরও লয়েন নাই। জামাতা এখন কলিকাতা ছাড়িয়া, ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়া, বনজঙ্গলে বাস করিতে যাইতেছেন, ইহা অবগত হইয়া তাঁহার উপর রুষ্ট হইলেন এবং জামাতাকে উদ্দেশ করিয়া আত্মীয় স্বজনের কাছে বলিতে লাগিলেন “ওটা দত্তবংশে কুলাঙ্গার জন্মেছিল। পিতৃপিতামহের নাম লোপ কর্‌লে। ওকে আমি কোনও কথা বল্‌তে চাই না। তার যা ইচ্ছা হয়, করুক্‌।” ক্ষেত্রনাথের শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী কন্যার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পাড়ার মেয়েদিগকে বলিতে লাগিলেন “মণিকে আমি জলে ফেলে দিয়েছিলাম, গো, জলে ফেলে দিয়েছিলাম।” সকল কথাই ক্ষেত্রনাথ ও মনোরমার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। কিন্তু ক্ষেত্র নিজ সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত না হইয়া বল্লভপুরে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন।

কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার দিনে, মনোরমার হৃদয়

বড়ই ব্যথিত হইতে লাগিল। মনোরমা প্রায় সমস্ত দিন ধরিয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। স্বামীর এই পৈত্রিক ঘরবাড়ী—যেখানে মনোরমা কত সুখ, আনন্দ ও কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছেন। এই ঘরবাড়ী পরের হইবে। পরের ছেলেপিলে আসিয়া এইখানে আনন্দ করিবে। আর তাঁহার ছেলে মেয়েরা আজ বনবাসে চলিল! মনোরমার মনে যতই এইরূপ চিন্তা হইতে লাগিল, ততই তাঁহার পক্ষে অশ্রুবেগ সম্বরণ করা কঠিন কার্য্য হইল। এদিকে ক্ষেত্রনাথ, নগেন্দ্রের সাহায্যে, সমস্ত দিন ধরিয়া জিনিষপত্র প্যাক্ করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রের ছোট ভাই দুইটীর উৎসাহের সীমা নাই। মধ্যম সুরেন ও কনিষ্ঠ নরু মহোল্লাসে পিতার নিকট জিনিষপত্র বহিয়া আনিতে লাগিল। সুরেনের বয়স দশ এবং নরুর বয়স পাচ বৎসর মাত্র। সুরেন মাঝে মাঝে নরুকে ভয় দেখাইয়া বলিতে লাগিল "নরু, আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখানে বড় বড় পাহাড় জঙ্গল, বাঘ ভালুক, আর হাতী আছে।" নরু পাহাড় জঙ্গলকে বাঘ ভালুকেরই মত কোনও জানোয়ার মনে করিয়াছিল এবং তাহাদের আকার প্রকারের কল্পনা করিয়াও ভীত হইতেছিল। তাই সে মাঝে মাঝে দাদার বিরুদ্ধে বাবার নিকট অভিযোগ করিয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল "ভাখ, বাবা"। কখনও বা সাহস করিয়া বীরদর্পে

সুরেনকে বলিতে লাগিল "আমি পাহাড়কে মেরে ফেল্‌বো।" তাহার কথা শুনিয়া দুঃখের মধ্যেও সকলে হাসিয়া উঠিতেছিলেন। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল।

রাত্রি দশটার সময় ক্ষেত্রনাথ সপরিবারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। পাড়ার লোকে কেহ জানিতেও পারিল না। গৃহ পরিত্যাগ করিবার সময় মনোরমার হৃদয় ভাবাবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাঁহার পক্ষে অশ্রুবেগ সম্বরণ করা অসম্ভব হইল। ক্ষেত্রনাথও পত্নীকে বিহ্বল দেখিয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, এবং তাড়াতাড়ি সকলকে গাড়ীতে তুলিয়া হাবড়ায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে জিনিষপত্র লগেজ করিয়া এবং টিকিট কিনিয়া যথাসময়ে সকলে গাড়ীতে উঠিলেন। রেলগাড়ী অন্ধকার ভেদ করিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিতে লাগিল। নরেন, সুরেন প্রভৃতি কখনও রেলগাড়ীতে চড়ে নাই। সুতরাং তাহারা আর ঘুমাইল না। এক একটী ষ্টেশনে গাড়ী থামিবামাত্র তাহারা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আবার গাড়ী ছাড়িলে, শয়ন করে। ভোরের সময় গাড়ী আসানসোল ষ্টেশনে পঁহুছিল। সেখানে তাঁহারা সকলে নামিয়া বেঙ্গল নাগপুর লাইনের গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। দামোদর নদের উপর যে বৃহৎ সেতু আছে, তাহা পার হইবার সময় বেশ ফর্শা হইয়াছিল। এত বড় নদীর এক পার্শ্বে সামান্য স্রোত মাত্র; অবশিষ্টাংশ বালুকা-

রাশিতে ধূ ধূ করিতেছে। নদী দেখিয়া মনোরমা প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত হইলেন। ক্রমে পাহাড় পর্ব্বত দেখা যাইতে লাগিল। সুরেন নরুকে পাহাড়ের ভয় দেখাইয়াছিল বটে; কিন্তু সে স্বচক্ষে কখনও পাহাড় দেখে নাই। পাহাড় দেখিয়া সে পিতাকে কত প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। নরু পাহাড়কে বাঘ ভালুকের মত না দেখিয়া আশ্বস্ত ও সাহসী হইল, এবং সুরেনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল "দাদা, এই দেখ, পাহাড়। আমি পাহাড়কে আর ভয় করি না।" নরুর কথা শুনিয়া আবার সকলেই হাস্য করিতে লাগিল।

যথাসময়ে তাঁহারা গন্তব্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। নীলমণি বাবু তাঁহাদের আগমনপ্রতীক্ষায় ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ক্ষেত্রনাথকে সপরিবারে তাঁহার আবাসস্থানে যাইতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষেত্রনাথের কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু বল্লভপুর সেখান হইতে দুই তিন ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী বলিয়া তিনি বল্লভপুরে যাওয়াই স্থির করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বল্লভপুরের মাতব্বর চারি জন প্রজা ক্ষেত্রনাথের আদেশানুসারে তাহাদের গোগাড়ী লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল।

গাড়ীগুলির উপরে ঘর বাঁধা; ঘরের মধ্যে খড় আস্তীর্ণ। ক্ষেত্রনাথ ও নরেন্দ্র, প্রজাদের সাহায্যে, দুইটী গাড়ীতে জিনিষপত্র বোঝাই করিল। অপর দুইটী গাড়ীতে আস্তীর্ণ খড়ের উপর সতরঞ্চ ও বিছানা পাতা হইল। ক্ষেত্রনাথ মনোরমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন "এই একটী গাড়ীতে উঠে ব'স; এখানে ঘোড়ার গাড়ী নাই।" মনোরমা তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন; সুতরাং স্বামীর প্রত্যুত্তরে ঈষদ্ধাস্য মাত্র করিয়া কন্যা ও নরুকে লইয়া একটী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। নগেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের সহিত ক্ষেত্রনাথ অপর একটী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

ষ্টেশন হইতে বল্লভপুরাভিমুখে চারিখানি গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। কিছু দূর পাকা রাস্তা। সেই রাস্তার উপর গাড়ী বেশ চলিয়া যাইতে লাগিল। তার পরই কাঁচা রাস্তা। কোথাও উঁচু নীচু, কোথাও খাল খন্দর, কোথাও ছোট নদী ইত্যাদি। এইরূপ রাস্তার উপর চলিতে চলিতে গাড়ীগুলি ক্যাঁকোচ্ ম্যাঁকোচ্ ঠোকশ্ ঢোকশ্ করিতে লাগিল। কোথাও আরোহীরা পরস্পরের গায়ে পড়িয়া যায়, এবং কোথাও পরস্পরের মাথা ঠোকাঠুকি হয়; আর অমনি সকলের মধ্যে হাসি পড়িয়া যায়। এইরূপে যাইতে যাইতে তাহারা একটি পার্ব্বতীয় নদী পার হইল। তাহার নাম কালী নদী। নদীর এক পার্শ্বে বালুকার উপর দিয়া কাচের মত স্বচ্ছ জল বহিয়া

যাইতেছে। গাড়ীগুলি সেই নদীর উপর দিয়া পার হইতে লাগিল। সকলে গাড়ী হইতে নামিয়া সেই নদীর জলে মুখ হাত ধুইলেন। জল কোথাও একহাঁটুর বেশী নহে। জলের মধ্যে নানা বর্ণের গোল গোল ছোট ছোট পাথর ও নুড়ি রহিয়াছে। বালকেরা প্রত্যেকেই দুই দশটি নুড়ি সংগ্রহ করিল। নদীর ঠিক্ উপরিভাগেই পাহাড়শ্রেণী উচ্চ দেওয়ালের মত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে কত প্রকার গাছ ও লতা এবং বাঁশের বন রহিয়াছে। পাহাড়ের উপর কোথাও রাখাল বালকেরা গরু চরাইতেছে। কোথাও কোল ও মুণ্ডারি বালিকারা কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া যাইতেছে। নদীর একপার্শ্বে কতকগুলি স্ত্রীলোক বালি ধুইয়া কি বাহির করিতেছে। ক্ষেত্রনাথ ও নগেন্দ্র তাহাদের নিকটে গিয়া জানিল যে, তাহারা বালু ধুইয়া সোণা বাহির করিতেছে। এই সমস্ত বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। গাড়ীগুলি নদী পার হইয়া দুই পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের মধ্যস্থল দিয়া গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বেলা প্রায় দশটা বাজিয়াছে। ক্ষেত্রনাথ ও মনোরমা কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার সময় ভ্রমক্রমে ছেলেদের জন্য বেশী খাবার আনেন নাই। সামান্য খাবার যাহা ছিল, তাহা সুরেন ও নরু ষ্টেশনেই খাইয়াছিল। কিন্তু নদী পার হইয়া নরুর ক্ষুধাগ্নি পুনর্ব্বার

প্রবল হইল এবং সে খাবার পাইবার জন্য জননীকে উত্যক্ত করিতে লাগিল। জননী তাহাকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিলেও নরু শান্ত হইল না এবং ক্রন্দন আরম্ভ করিল। ক্ষেত্রনাথ নরুর ক্রন্দনের কারণ অবগত হইয়া চিন্তিত হইলেন। গাড়োয়ান বলিল, সম্মুখে মাধবপুর নামে যে গ্রাম রহিয়াছে, তাহাতে মাধব দত্তের বাড়ী। মাধব সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁহার বাড়ী হইতে সে দুগ্ধ আনিয়া দিবে। ক্ষেত্রনাথ গাড়োয়ানকে দুগ্ধের মূল্য দিতে চাহিলেন; কিন্তু গাড়োয়ান জিভ্ কাটিয়া বলিল, মাধব দত্ত সম্ভ্রান্ত লোক; তিনি কখনও দুগ্ধ বিক্রয় করেন না। তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যহ বড় কড়ার এক কড়া দুগ্ধ হয়। চাহিবা-মাত্র তিনি এক ঘটী দুগ্ধ দিবেন। গাড়ী অল্পক্ষণের মধ্যে মাধব দত্তের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র, গাড়োয়ান একটী ঘটী লইয়া তাঁহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে দুগ্ধ লইয়া বাহির হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে হুকায় তামাক খাইতে খাইতে একটী স্থূলাকার প্রবীণ ব্যক্তিও বাহির হইলেন। তিনি ক্ষেত্রনাথের গাড়ীর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মশাই কোথায় যাবেন ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "বল্লভপুরে।"

"সেখানে কি উদ্দেশে যাওয়া হচ্ছে ?"

- "সেখানে আমরা থাক্‌বো।"

"ওঃ, তবে আপনিই বুঝি বল্লভপুর খরিদ করেছেন

"হাঁ।"

"আপনারা ?"

"গন্ধবণিক্ ?"

প্রশ্নকর্ত্তা উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। "মশাইরা কোন্ আশ্রম ?"

"সত্রীশ।"

"সত্রীশ ? সত্রীশের কি ?"

ক্ষেত্রনাথ প্রশ্নটি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন না; বলিলেন "আমার নাম শ্রীক্ষেত্রনাথ দত্ত; আমরা হর্ব্বিয্ দত্ত।" (অর্থাৎ ঔর্ব্ব ঋষিগোত্রের দত্ত।)

"হর্ব্বিব্ দত্ত ? কুলীনসন্তান ? কি পরম সৌভাগ্য! নমস্কার, মশাই, নমস্কার। আমিও সত্রীশ আশ্রমের গন্ধ-বণিক্; এই জঙ্গল দেশে পড়ে আছি। আজ আমার কি সুপ্রভাত যে, এখানে আপনাদের দর্শন পেলাম। আপনারা গাড়ী হতে নামুন। আজ আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা না দিয়ে যেতে পার্‌বেন না। আমিও শাণ্ডিল্য দত্ত, মশাই। হুগলী জেলায় বাড়ী। এই দেশে প্রায় ২৫ বৎসর হ'ল বাস কর্‌ছি। আপনার নিবাস কল্‌কাতায়, তা আমি শুনেছি। কিন্তু আপনি যে গন্ধবণিক্ তা জান্‌তাম না। কি পরম সৌভাগ্য, কি পরম সৌভাগ্য!"

ক্ষেত্রনাথ মাধব দত্ত মহাশয়ের সাদর সম্ভাষণ ও

আত্মীয়তা দেখিয়া বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তিনি বল্লভপুরে তখনি যাইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মাধব দত্ত বলিলেন "সে কি হয়? এই মধ্যাহ্ন উপস্থিত। বল্লভপুর এই নূতন যাচ্ছেন, সেখানে সমস্ত নূতন বন্দোবস্ত করতে হ'বে। আজ আমার বাড়ীতে অবস্থিতি করে কাল সেখানে যাবেন। আমি নিজে গিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে দিব। কি পরম সৌভাগ্য, কি পরম সৌভাগ্য! আপনি গন্ধবণিক্? হবিষ্ দত্ত? কুলীন-সন্তান? আজ বহুকাল পরে আমি কুটুম্ব-নারায়ণ পেয়েছি! আজ কুটুম্বের সেবা করে আমি ধন্য হ'ব। আসুন, আসুন, সকলে নেমে আসুন।"

ক্ষেত্রনাথ, মাধব দত্ত মহাশয়ের সৌহার্দ্দ্য ও আত্মীয়তা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করা অসম্ভব হইল। এদিকে মাধব দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র গৃহে জননীকে সকল সংবাদ বলায়, তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ বাহিরে মনোরমার গাড়ীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। মনোরমা কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময়ে ক্ষেত্রনাথ নিকটে আসিয়া বলিলেন "ওগো, নাম; দত্ত মহাশয় আমাদের স্বজাতি, কুটুম্ব। তাঁর অনুরোধে আজ আমাদের এবেলা এখানে থাকতে হ'বে। তাঁর অনুরোধ ঠেলা ভার।"

সকলেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। সুরেন, নরেন ও কন্যাকে লইয়া মনোরমা অন্তঃপুরে গেলেন। গাড়ীর বলদগুলিকে জোয়াল হইতে খুলিয়া দেওয়া হইল এবং গাড়ীগুলিকে মাধব দত্তের বৈঠকখানার সম্মুখে রাখা হইল। মাধব দত্তের বৈঠকখানা ঘরটি প্রশস্ত। বাড়ীখানি ইষ্টক-নির্ম্মিত, পাকা, ও একতলা। মাধব দত্তের পুত্রেরা ক্ষেত্র-নাথের হস্ত-পদ-প্রক্ষালনের নিমিত্ত এক গাড়ু জল ও গামোছা আনিয়া দিল এবং বাঁধা হুকায় তামাক সাজিয়া দিল। মাধব দত্তের আতিথেয়তা দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন।

এদিকে মাধব দত্ত পুষ্করিণী হইতে মাছ ধরাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, কুটুম্বগণের আহারাদির সুব্যবস্থা করিলেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় ক্ষেত্রনাথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যে লক্ষ্মীশ্রী দেখিলেন, তাহাতে চমৎকৃত হইলেন। অন্তঃপুরের বৃহৎ উঠান। উঠানের মধ্যে অনেক ছোট বড় ধানের গোলা ও মরাই। উঠানটী পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। থালা, ঘটী, ঘড়া, তৈজসপত্র রাশীকৃত রহিয়াছে। পুরুষেরা সকলে একত্র ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে, মাধব দত্ত কন্যাদিগকে ও পুত্রবধূকে ডাকিয়া ক্ষেত্রনাথকে প্রণাম করিতে বলিলেন। সকলেই একে একে আসিয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া গেল। ক্ষেত্রনাথ মাধব দত্ত মহাশয়ের

আচার ব্যবহার ও আত্মীয়তা দেখিয়া তাঁহাকে পরমাত্মীয় মনে করিলেন।

আহারাদির পর, মাধব দত্ত মহাশয় ক্ষেত্রনাথকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার গোলা প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। গোলা ও মরাই সমূহে প্রায় পাঁচ হাজার মণ ধান্য মৌজুৎ আছে। এই সমস্ত ধান্য তাঁহার নিজ জোতে উৎপন্ন হয়। প্রতি বৎসর প্রায় দুই হাজার মণ ধান্য জন্মে। ভাণ্ডার-গৃহে ক্ষেত্রনাথ গিয়া দেখিলেন, তাহা চাউল, গম, কলাই, ছোলা, অড়হর, মুগ, সরিষা, গুঞ্জা প্রভৃতি শস্যে পরিপূর্ণ। এই সমস্তই মাধব দত্তের জমীতে উৎপন্ন হয়। লবণ, মসলা, ও পরিধেয় বস্ত্রাদি ব্যতীত তাঁহাকে প্রায় আর কিছুই ক্রয় করিতে হয় না। জমী হইতে শস্যাদি আনীত হইয়া যেখানে মাড়াই ও ঝাড়াই হয় তাহার নাম খামার-বাড়ী। ক্ষেত্রনাথ সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহারও উঠান প্রকাণ্ড। সেই উঠানের একপার্শ্বে পর্ব্বতাকার খড় ও বিচালী স্তূপীকৃত রহিয়াছে। এই সমস্ত খড় কাঁচা ঘরের ছাদন ও গবাদির আহার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। তৎপরেই গোয়ালঘর। গোয়ালঘরে দশটি দুগ্ধবতী গাভী ও তাহাদের বৎসগুলি বাঁধা রহিয়াছে ও জাব খাইতেছে। ক্ষেত্রনাথ মাধব দত্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে, তাঁহার গৃহে প্রত্যহ প্রায় অর্দ্ধমণ-পরিমিত দুগ্ধ হইয়া থাকে। এই দুগ্ধ হইতে বাটীর স্ত্রীলোকেরা

সর, ছানা, মাখন, দধি ও ঘৃত প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ক্ষেত্রনাথ বিস্মিত হইয়া সব দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন, এমন সময়ে কৃষাণেরা কুড়িটি লাঙ্গল ও বলদ সহ সেই গোয়াল-বাড়ীতে প্রবেশ করিল। মাধব দত্ত বলিলেন "এই লাঙ্গলগুলি দিয়ে প্রাতঃকাল থেকে আমার খাসখামার জমী চষা হচ্ছিল।"

ক্ষেত্রনাথ যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশান্বিত ও উৎসাহিত হইলেন। অপরাহ্ণ হইলে, ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মাধব দত্ত মহাশয় তাঁহাদিগকে সেদিন তাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু যাইবার জন্য ক্ষেত্রনাথের আগ্রহ দেখিয়া আর অধিক জেদ করিলেন না। মাধব দত্ত মহাশয় বলিলেন "চলুন, আমিও বল্লভপুরে গিয়ে আপনাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসি। বল্লভপুর এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূর মাত্র। আমি সন্ধ্যা নাগাইদ বাড়ী ফিরে আস্‌বো।" মাধব দত্তের পরিবারবর্গের নিকট বিদায় লইয়া মনোরমা ও ক্ষেত্রনাথ ছেলেমেয়েদিগকে লইয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই বল্লভপুরে উপস্থিত হইলেন। মাধব দত্ত মহাশয়ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারে আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বল্লভপুরের নিকট যে সকল পাহাড় আছে, ঐ-সকল পাহাড়ে স্বর্ণ পাওয়া যায় বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলেই স্থানীয় লোকেরা পাহাড়ের ধারে ধারে ঘুরিয়া বেড়ায়। বৃষ্টির জলে পর্ব্বতগাত্র হইতে মৃত্তিকা ধৌত হইয়া গেলে, মৃত্তিকা-প্রোথিত স্বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাট কেহ কেহ কদাচিৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থলে স্বর্ণ পাওয়া যায় না। তৎপরে পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকলের বালুকা ধৌত করিয়াও অনেকে স্বর্ণ-কণা সংগ্রহ করে। এই অঞ্চলে স্বর্ণের খনি আছে, এইরূপ একটী প্রবাদ বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। সেই প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া, স্বর্ণ উত্তোলন করিবার উদ্দেশ্যে, কতিপয় ইংরাজ একটী কোম্পানী গঠন করেন। তাঁহারা যে উপায়ে প্রভূত লাভের আশা দিয়া জনসাধারণের মনে বিশ্বাস সমুৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে আর বলিব না। ফলতঃ তাঁহারা লোকের মনে কুবেরের ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন জাগরিত করিয়া দিয়াছিলেন। জনসাধারণেও তাঁহাদের কুহকে ভুলিয়া গিয়া অত্যল্প দিনের মধ্যে কোম্পানীর শেয়ার-সমূহ ক্রয় করিয়া ফেলিল। বহু লক্ষ টাকা কোম্পানীর হস্তগত হইল। সেই টাকা লইয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ কার্য্যারম্ভ করিলেন। তাঁহাদের বাসের

জন্য বল্লভপুরে একটী বাটী নির্ম্মিত হইল। কতিপয় মাস মহাড়ম্বরে কার্য্য চলিতে লাগিল। কিন্তু স্বর্ণ আর সংগৃহীত হইল না। স্বর্ণের খনি কোথায় যে তাহা হইতে স্বর্ণ উত্তোলিত হইবে? কিছুদিন পরে কোম্পানী কার্য্য তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র লোকও নিঃস্ব হইয়া পড়িল।

বল্লভপুরের জমীদারের সহিত কোম্পানীর এইরূপ সর্ত্ত হইয়াছিল যে, কোম্পানী যতদিন কার্য্য করিবেন, ততদিন তাঁহাদের বাটী প্রভৃতি তাঁহাদের অধিকারে থাকিবে; কিন্তু কোম্পানীর কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গেলে তাহা ভূস্বামীর দখলে আসিবে। কোম্পানী কার্য্য তুলিয়া দিলে, এই সর্ত্ত অনুসারে, কর্ম্মচারিবর্গের বাটীটি ভূস্বামীর দখলে আসিল। কিন্তু ভূস্বামীর বাস অন্যত্র থাকায়, তিনি তাহাতে বাস না করিয়া, তাহা কাছারী-বাটীতে পরিণত করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রনাথ যখন বল্লভপুর ক্রয় করেন, তখন তৎসঙ্গে এই বাটীও তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল।

ক্ষেত্রনাথ এই বাটীতেই বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়া পরিবারবর্গকে বল্লভপুরে লইয়া গেলেন। বাটী দ্বিতল এবং গ্রামের বহির্ভাগে অবস্থিত। ইংরাজগণের প্রবাসের উপযুক্ত করিয়া ইহা নির্ম্মিত হইলেও, একটী বাঙ্গালী পরিবার ইহাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। বাটীর চারিদিকে বিস্তর স্থান পড়িয়া ছিল; তন্মধ্যে আম্র কাঁটাল

প্রভৃতি দুই চারিটি ফলবৃক্ষও রোপিত হইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ পূর্ব্বেই বাটীর আবশ্যক-মত সংস্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পরিবারবর্গ বল্লভপুরের বাটীতে উপনীত হইয়া রাত্রিযাপন করিলেন। মাধব দত্ত মহাশয় তাঁহাদের গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নিজ বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন এবং দুই এক দিন অন্তর তাঁহাদিগকে দেখিয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

মনোরমা এবং বালকেরা তাহাদের নূতন আবাস-বাটী দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। ক্ষেত্রনাথ মনোরমাকে বাটী সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কোনও কথাই বলেন নাই। সুতরাং বাটী দেখিয়া মনোরমার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। কলিকাতার আবাস-বাটী বিক্রীত হওয়াতে মনোরমার মনে যে দুঃখ হইয়াছিল, এই সুন্দর ও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাটী দেখিয়া তাঁহার সে দুঃখ তিরোহিত হইল। মনোরমার দুই চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রাতঃকালে গ্রামের প্রজাবর্গ তাঁহাদের নূতন ভূস্বামীর আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া দলে দলে "কাছারী-বাটীতে" উপস্থিত হইল। প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ এক এক টাকা নজর দিয়া নবীন ভূস্বামীকে অভ্যর্থনা করিল। নগেন্দ্র পিতার পার্শ্বে বসিয়া ছিল। সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্র দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই

ব্যাপার দেখিতেছিল। প্রজাবর্গও অনিমিষলোচনে বালকগুলির সুন্দর মূর্ত্তি ও পরিষ্কৃত বেশভূষা অবলোকন করিতেছিল। প্রজাবর্গ বিদায় লইয়া একে একে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলে, সুরেন্দ্র জননীর কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল "মা, ওরা সব বাবাকে কত টাকা দিয়ে গেল! হ্যাঁ মা, ওরা বাবাকে কেন টাকা দিলে?" মনোরমাও জানিতেন না, লোকে কেন তাঁহার স্বামীকে টাকা দিল। সুতরাং পুত্রের কথার কি উত্তর দিবেন, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময়ে ক্ষুদ্র নরু হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল "মা,—মা,—এই দ্যাখ আমি একটা টাকা পেয়েছি; বাবা আমাকে দিয়েছে!" এই বলিয়া সুচারু দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া, ও টাকাটী মুষ্টির মধ্যে বদ্ধ করিয়া, হাসিতে হাসিতে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্ষেত্রনাথ আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্ষেত্রনাথ সহাস্যমুখে স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমাদের বল্লভপুরের প্রজারা এসে আজ আমার সঙ্গে দেখা করে গেল। শুধু হাতে দেখা করার নিয়ম এদেশে নাই। তাই তারা প্রত্যেকে এক একটী টাকা নজর দিয়ে দেখা করলে। এতেই আজ প্রায় সত্তর টাকা আদায় হয়েছে। তুমি এই টাকাগুলি রেখে দাও। এই আমাদের লক্ষ্মী!" মনোরমা টাকাগুলি বাক্সের মধ্যে সযত্নে রাখিলে, ক্ষেত্রনাথ

তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি কেমন আছ? দেশটা কেমন লাগ্‌ছে?" মনোরমা ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন "আমার বিশেষ কোনও অসুখ নাই। আর দেশটা বেশ চমৎকার বোধ হচ্ছে। চারিদিকে পাহাড়, বন। আর আমাদের বাড়ীটাও বেশ হয়েছে। বাড়ীর চারিদিকে কত ফাঁকা জায়গা। কল্‌কাতায় আমরা যেন হাঁপিয়ে মর্‌তাম। কল্‌কাতা ছেড়ে এসেছি ব'লে আমার মনে এখন আর কোনও কষ্ট নাই। অল্পক্ষণ আগে এখানকার মেয়েরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল! দেখ্‌ছি এখানে বাঙ্গালী বামুন কায়েতও আছে। বামুনদের মেয়েগুলি দেখ্‌তে বেশ সুন্দর। তবে এদেশের মেয়েদের কথাগুলি কিছু বাঁকা বাঁকা। আমি তাদের সব কথা বুঝ্‌তে পারি নাই। তাদের হাতে সব রূপার গয়না ও শাঁখা; পরণের কাপড়ও মোটা। মেয়েগুলির মনে কোনও অহঙ্কার নাই; বড় সাদাসিদে। দেখে আমার বড় আনন্দ হয়েছে। তা'রা বিকেল বেলায় আবার আস্‌বে বলেছে। দেখ, এখানে এসে আমার মনে বড় স্ফূর্ত্তি হচ্ছে। আমার অসুখ আপনিই সেরে যাবে। আহা, বাতাস কেমন পরিষ্কার! আমাদের ইন্দারার জলও ঠিক কলের জলের মতন।" বলিতে বলিতে মনোরমার কি মনে হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, ঐ যে

জমী পাহাড় ও জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, ঐ সমস্তই কি আমাদের ?”

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, ঐ সমস্তই আমাদের বটে ; কিন্তু ওগুলির মধ্যে কতক প্রজাদেরকে বন্দোবস্ত করা আছে, আর কতকগুলি আমাদের খাসে আছে। পাহাড়ের উপর যে জঙ্গল দেখ্‌ছ, তা আমাদের খাস। ঐ পাহাড়ের নীচে যে ধানের জমী দেখ্‌ছ, তাও আমাদের খাস, আর ঐ বাড়ীর উত্তরদিকে যে জমী দেখ্‌ছ, তাও আমাদের খাস। আমাদের নিজের প্রায় একশত বিঘা ধানের জমী খাসে আছে। তা ছাড়া ডাঙ্গা জমী অনেক আছে। কৃষাণ রেখে আমরা এইগুলি নিজে চাষ করবো।”

মনোরমা বলিলেন, “তা হ'লে তো আমাদি'কেও বলদ আর লাঙ্গল রাখ্‌তে হ'বে ?”

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “তা হ'বে বই কি ? আমি আজ পাঁচজোড়া বলদ ও দুইজোড়া মহিষ (মহিষকে এখানে কাড়া বলে) কিনে আন্‌তে পাঠিয়েছি। প্রজারা আমার অনুরোধে কতক কতক জমীতে চাষ দিয়ে রেখেছে। কিন্তু তাদের নিজের জমীও তো আছে। তারা তো আর আমার সমস্ত জমী চষে দিতে পারবে না। এই জন্য আমাদের নিজের লাঙ্গল ও বলদ চাই। লাঙ্গল, বলদ, মহিষ ও দুইটী গাই কিন্‌তে প্রায় ২০০৲ টাকা খরচ হবে।”

মনোরমা বলিলেন "গরু মোষ রাখবে কোথা ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তুমি দেখ নাই বুঝি? ঐ দেখ, পূর্ব্বধারে একটী খড়ো ঘর প্রস্তুত হয়েছে। ঐখানে এখন তা'দের রাখা হ'বে। আমি তোমাদের আন্‌তে যাবার আগেই ঐ ঘর তৈয়ার কর্‌বার বন্দোবস্ত করেছিলাম।"

মনোরমা আবার বলিলেন, "ধান হ'লে ধান রাখ্‌বে কোথায় ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "তারও বন্দোবস্ত কর্‌ছি। এখন ধান বোনা হ'বে। কিন্তু ধান পাক্‌বে সেই অগ্রহায়ণ মাসে। তখন ধানের খামার প্রস্তুত করে ফেল্‌বো। এই বাড়ীটা ছিল সাহেবদের, তাদের বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীর থাকে না। মাঠের মাঝে ফাঁকা জায়গায় একটা বাড়ী। আমি তাড়াতাড়ি প্রাচীর দেওয়াতে পারি নাই। বাড়ীর দক্ষিণদিক্‌টা সদর হ'বে। দক্ষিণদিকের নীচের ঘর আমাদের বৈঠকখানা ঘর হ'বে। এই উত্তরদিক্‌টি ঘিরে প্রাচীর দেব, এই দিকেই তোমার অন্দর হবে। কিন্তু এখানে ইট কিন্‌তে পাওয়া যায় না। যার দরকার হয়, সে ইট পুড়িয়ে নেয়। কাজেই এখন প্রাচীর দিতে পার্‌ছি না। অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটা শেষ হ'লে, ইট তৈয়ার করিয়ে পোড়াব। তারপর প্রাচীর দেওয়া হবে ; এখন শাল গাছের রোলা পুতে প্রাচীর দেওয়া হবে। তাও খুব শক্ত হবে। গোয়ালঘরের চারিদিকেও এই

বেড়ার প্রাচীর হবে। আমাদের জঙ্গলে রোলার অভাব নাই। আমি রোলা কাটতে হুকুম দিয়েছি।”

স্বামীর মুখে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া মনোরমার মন প্রফুল্ল হইল। মনোরমার চক্ষে সকলই নূতন। তাঁহার মনে ক্রমশঃই কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মনোরমা সকলই দেখিতে ও জানিতে পারিবেন, এই আশায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথ কতিপয় দিবস প্রাঙ্গণের প্রাচীরাদি প্রস্তুত করাইতে একান্ত ব্যস্ত রহিলেন। জঙ্গল হইতে শালের রোলা আনীত হইল। বালকেরা এবং মনোরমাও বিস্ময়ের সহিত এই অভিনব প্রাচীর-নির্ম্মাণ-কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। কাড়ার (মহিষের) গাড়ীতে রোলা-সকল পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে বাহিত হইতে লাগিল। সে গাড়ীর চাকাও চমৎকার। কাষ্ঠের মোটা তক্তাকে একত্র গাঁথিয়া তাহা গোলাকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। চাকাগুলি দেড় হাতের অধিক উচ্চ হইবে না। সেই চাকাগুলি অতিশয় দৃঢ়। উচ্চ-নীচ স্থান ও খাল-নদীর উপর গাড়ী লইয়া যাইতে হইলে, এইরূপ চাকাই একান্ত উপযোগী। কিন্তু যখন গাড়ী চলে, তখন চাকা ও লিগের ঘর্ষণে এরূপ ভয়ঙ্কর ও কর্কশ শব্দ উত্থিত হয় যে, তাহা অর্দ্ধ মাইল হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। প্রজাবর্গ আপনাদের গাড়ী দ্বারা শালের রোলা ও বাঁশ পর্ব্বত হইতে বহিয়া আনিয়া দিল। মজুরেরা ক্ষেত্রনাথের নির্দ্দেশ-মত সেই রোলাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট করিয়া ভূমিতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিল, এবং দুইদিকে বাঁশের বাকারি দিয়া তাহা রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিল। রোলার সূক্ষ্ম অগ্রভাগগুলি আকাশের দিকে

রহিল। প্রাচীর এরূপ দৃঢ় ও উচ্চ হইল যে, তাহা কাহারও পক্ষে লঙ্ঘন করা দূরূহ হইল।

প্রাচীর প্রস্তুত হইলে গৃহের প্রাঙ্গণটি প্রশস্ত হইল। দুই চারিটি "কামিন" (স্ত্রীমজুর) মাটী ও গোময় লেপিয়া তাহা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করিল। ইন্দারাটী প্রাঙ্গণের মধ্যেই পড়িল। মনোরমা সযত্নে তাহার পার্শ্বে একটী তুলসী-বৃক্ষ রোপণ করিলেন। বালকেরা বাগানে সাহেব-দের রোপিত দুই চারিটি পুষ্প-বৃক্ষের চারা আনিয়া স্থানে স্থানে রোপণ করিল। ইন্দারার অনতিদূরে, উত্তর দিকের প্রাচীরের সংলগ্ন স্থানে একটি কাঁচা রান্নাঘর প্রস্তুত হইল। কাছারী-বাটীর নিম্নতলের একটী প্রশস্ত গৃহ ভাণ্ডার-গৃহে পরিণত হইল।

প্রজারা নবীন ভূস্বামীর প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইল যে, তাঁহার যখন যাহা অভাব হইতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ তাহারা তাহা মোচন করিয়া দিতে লাগিল। তাঁহার নিজের বলদ ও লাঙ্গল না আসা পর্য্যন্ত, প্রজাবর্গ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিজ জোতের ভূমি কর্ষণ করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার নিজের লাঙ্গল ও বলদ আসিতেও অধিক বিলম্ব হইল না। পাঁচ জোড়া বলদ, দুই জোড়া কাড়া ও দুইটী পয়স্বিনী গাভী ক্রীত হইয়া গোশালায় রক্ষিত হইল। গো-মহিষ গোশালায় আসিল বটে, কিন্তু তাহাদের আহার্য্য তৃণাদি কিরূপে ও কোথা হইতে সংগৃহীত

হইবে, তাহাই চিন্তার বিষয় হইল। বল্লভপুরে খড় ইত্যাদি ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। প্রজাবর্গ ভূস্বামীর অভাবের কথা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকে কিছু কিছু খড় আনিয়া দিল। এইরূপে যে পরিমাণে খড় সংগৃহীত হইল, তাহাতে গোমহিষাদির প্রায় ছয় মাসের আহার্য্য সম্বন্ধে ক্ষেত্রনাথ নিশ্চিন্ত হইলেন।

গোশালায় পয়স্বিনী গাভী দুইটীর স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিল বটে, কিন্তু ক্ষেত্রনাথ অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে তাহাদের জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘরও প্রস্তুত করিলেন। গাভী দুইটী সেই ঘরেই সর্ব্বদা মনোরমার চক্ষে চক্ষে থাকিত। গৃহকর্ম্মে মনোরমার সহায়তা করিবার জন্য "যম্‌নীর (যমুনার) মা" নামে একটী কার্য্যদক্ষা স্ত্রীলোক পরিচারিকা-রূপে নিযুক্ত হইয়াছিল। সে গাভী দুইটীকে নিজহস্তে খাওয়াইত। গোসেবা করা পুণ্যময় কার্য্য বলিয়া মনো-রমাও অবসরক্রমে তাহাদিগকে নিজহস্তে খাওয়াইতেন। দুইটী গাভীতে প্রায় ছয় সের দুগ্ধ প্রদান করিত। সে দুগ্ধ এরূপ সুমিষ্ট যে, ক্ষেত্রনাথ, মনোরমা বা তাহাদের সন্তানেরা কেহই কলিকাতায় কখনও এরূপ দুগ্ধ পান করে নাই। যমুনার মা প্রত্যহ নিজহস্তে গাভীদের দুগ্ধ দোহন করিত।

এদিকে কৃষিকার্য্যের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। আষাঢ় মাস পড়িয়াছে। প্রায় প্রত্যহই বৃষ্টি হইতেছে। এই

সময়ে ধান্য রোপণ বা বপন না করিলে, শস্য "নামী" হইবে। সুতরাং কৃষিকার্য্যের জন্য সাত জন নিপুণ ও বলিষ্ঠ "মুনিষ" (মনুষ্য ?) নিযুক্ত হইল এবং গোমহিষাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন "বাগাল" (রাখাল, অর্থাৎ যে গরু বাছুরকে বাগায়, বা চরাইবার সময় একত্র করিয়া রাখে) নিযুক্ত হইল। এদেশের প্রথানুসারে, মুনিষ, বাগাল ও কামিনেরা গৃহস্থের ঘরে খাইয়া থাকে। মনোরমার যেরূপ দুর্ব্বল দেহ, তাহাতে তিনি যে একাকিনী এতগুলি লোকের আহার্য্য প্রস্তুত করিতে পারিবেন, তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। বাগাল ও মুনিষেরা যে জাতীয় ব্যক্তি, যমুনার মাও সেই জাতীয়া স্ত্রীলোক। সুতরাং যমুনার মা ইহাদের সকলের আহার্য্য প্রস্তুত করিবার ভার লইল। যমুনা নাম্নী তাহার বিধবা কন্যাটিও জননীকে এবং মনোরমাকে গৃহকার্য্যে সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইল।

বাগাল মুনিষদের আহার্য্য প্রস্তুত করা সহজসাধ্য কার্য্য ছিল না। মুনিষেরা প্রত্যুষে লাঙ্গল লইয়া ক্ষেত্রে গমন করিত। প্রত্যুষ হইতে বেলা প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত তাহারা ভূমিকর্ষণ করিত। এগারটার সময়ে, তাহারা লাঙ্গল ছাড়িয়া "বেসাম" (জলপান) খাইবার জন্য প্রস্তুত হইত। বাগাল এই সময়ে "জলপান" লইয়া মাঠে যাইত। সাতজন মুনিষ এবং বাগাল—এই আটজনের

জলপান ; অর্থাৎ দুইটী বড় ধামা-পূর্ণ মুড়ি এবং কতকগুলি “সঁপর‍্যা” (লঙ্কা) ও কিঞ্চিৎ লবণ। যমুনার মা প্রত্যহই প্রাতে চারি সের চাউলের মুড়ি ভাজিত। মুড়ি ভাজা হইলে, সে তাহাদের জন্য ভাত রাঁধিত। যমুনা, যমুনার মা, এবং আটজন মুনিষ বাগাল, সর্ব্বসমেত দশ জনের জন্য প্রায় আট সের চাউলের অন্ন, তদুপযুক্ত কলাইয়ের ডাল এবং তরকারী প্রভৃতি রন্ধন করা হইত। মুনিষেরা লাঙ্গল বলদ ও কাড়া লইয়া বেলা প্রায় চারিটার সময় মাঠ হইতে গৃহে আসিত। আসিয়া বলদ ও কাড়া-সকলের আহার্য্যের বন্দোবস্ত করিত। তৎপরে তৈল মাখিয়া স্নান করিতে যাইত ; স্নানান্তে আহারে বসিত। আহার শেষ হইলে, তাহারা বলদ ও কাড়াসকলকে রাত্রির জন্য পুনর্ব্বার আহার্য্য তৃণাদি দিয়া বৈঠকখানার বারাণ্ডায় আসিয়া শয়ন করিত। সমস্ত দিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর, শয়ন করিবামাত্র, তাহারা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইত।

ক্ষেত্রনাথের ভাণ্ডারে ধান্য চাউল বা কলাই সঞ্চিত ছিল না। প্রত্যহ তাঁহার গৃহে যেরূপ খরচ, তাহাতে পসারীর দোকান হইতেও চাউলাদি ক্রয় করিয়া আনা তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক বোধ হইতেছিল না। এই কারণে, মাধব দত্ত মহাশয়ের পরামর্শক্রমে তিনি এক শত টাকার ধান্য ক্রয় করিয়া আনাইলেন এবং উঠানের এক

পার্শ্বে গাভীদের জন্য যে গোশালা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহারই সন্নিকটে একটী ঢেঁকী বসাইলেন। যমুনা ও যমুনার মা অবসরক্রমে ধান্য সিদ্ধ করিয়া তাহা শুকাইয়া রাখিত। দুইটী ঠিকা কামিন আসিয়া তাহা ঢেঁকিতে "ভানিয়া" (ভাঙ্গিয়া) চাউল প্রস্তুত করিত। এইরূপে ভাণ্ডারে চাউল সঞ্চিত হইতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ নিকটবর্ত্তী হাট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে কলাইও ক্রয় করিয়া আনাইলেন, এবং গৃহে একটী যাঁতা বসাইয়া, যমুনা ও যমুনার মার সাহায্যে তাহা হইতে ডাল প্রস্তুত করাইলেন। তিনি আপনাদের ব্যবহারের জন্য কিছু উৎকৃষ্ট গমও ক্রয় করিয়া আনাইলেন। যাঁতাতে সেই গম পিষ্ট হইলে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট আটা, ময়দা ও সুজি উৎপন্ন হইত। গমের চোকল ও কলায়ের ভূষি প্রভৃতি গাভীদের আহার্য্য হইত।

কৃষিকার্য্য, গৃহস্থালী এবং অন্যান্য বিষয়ের সুব্যবস্থা করিবার জন্য ক্ষেত্রনাথের কিছুমাত্র অবসর ছিল না। এই-সমস্ত বিষয়ে তিনি মাধব দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে যথেষ্ট সদুপদেশ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুই তিন দিন অন্তর তিনি স্বয়ং আসিয়া কৃষিকার্য্য প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া না দিলে, অনভিজ্ঞ ক্ষেত্রনাথ নিজ বুদ্ধিতে কিছুই করিতে পারিতেন না। ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথও সকল বিষয়ে পিতার যথেষ্ট সাহায্য করিতে

লাগিল। নগেন্দ্র প্রত্যহ ক্ষেত্রসমূহে গমন করিয়া মুনিষদের কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিত। তাহার চক্ষে সমস্তই নূতন ব্যাপার। লাঙ্গল দ্বারা ভূমিতে চাষ দেওয়া, মই দেওয়া, ধান্য বপন, ধান্য রোপণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাহার নিকট নূতন। এই কারণে, কুতূহলী নগেন্দ্রনাথ মহান্ আগ্রহের সহিত প্রত্যহ মাঠে গমন করিত এবং সমস্ত কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিত ও শিখিত। সুরেন এবং নরুও নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে সকল ব্যাপারের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে কৌতূহল প্রকাশ করিত। কলিকাতার ক্ষুদ্র সীমা হইতে বহির্গত হইয়া বালকেরা স্বয়ং প্রকৃতি দেবীর মহান্ শিক্ষামন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং অত্যল্প দিনের মধ্যে তাহাদের চিত্ত এবং মনেরও যে যথেষ্ট বিকাশ হইল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

আর মনোরমা? বল্লভপুরে আসিয়া মনোরমার দেহ ও মনের যে পরিবর্ত্তন হইল, তাহা বিস্ময়জনক। পার্ব্বতীয় প্রদেশের নির্ম্মল বায়ু সেবন ও বিশুদ্ধ জল পান করিয়া মনোরমার দেহের অর্দ্ধেক রোগ সারিয়া গেল। তাহার উপর তাঁহার মনের স্ফূর্ত্তি অল্প হইল না। কোথায় কলিকাতার দুর্ব্বিষহ চিন্তা ও সাংসারিক কষ্ট, আর কোথায় বল্লভপুরের সর্ব্ববিষয়ে প্রাচুর্য্য ও স্বচ্ছলতা! বল্লভপুরের সুন্দর বাটীর চতুর্দ্দিকে আপনাদের বিস্তৃত

ভূসম্পত্তি, গোমহিষ, লোক জন, দাস দাসী,—প্রতিবাসিগণের নিকট সম্মান, স্বামীর উন্নতির সূত্রপাত, পুত্রগণের উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি—এবং সর্ব্বোপরি, তাহাদের নশ্বর দেহ এবং আনন্দময় বদন অবলোকন করিয়া, মনোরমার মনে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। মনোরমা কেবল স্বামী ও পুত্রকন্যাদের জন্য স্বয়ং রন্ধন করিয়া আহার্য্য প্রস্তুত করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক কার্য্য অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছিল। তাঁহাকে গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্যই পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। পরন্তু মনোরমা ইহাতে কোন কষ্ট অনুভব করিতেন না। যমুনা ও যমুনার মা তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিত। ইহাদের পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা দেখিয়া মনোরমা একএকবার মনে অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিতেন। মনোরমা তাহাদিগকে আত্মীয়ার ন্যায় যত্ন করিতেন; তাহারাও "গিন্নী"কে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তাহাদের আকার প্রকার পরিচ্ছদ এবং কথাবার্ত্তা রূঢ় হইলেও, তাহাদের হৃদয় অতিশয় চমৎকার ছিল। মনোরমা তাহাদের নিকট মুড়ি ভাজা, ধান সিদ্ধ করা, এবং চাউল প্রস্তুত করা ইত্যাদি নানা অত্যাবশ্যক বিষয়ের প্রক্রিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কোন কোন দিন কৌতূহলপরবশ হইয়া, মনোরমা যমুনার মাকে সরাইয়া

দিয়া, নিজেই মুড়ি ভাজিতেন। মনোরমার গৃহস্থালী দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যেন তাহাতে লক্ষ্মী দেবীর অবির্ভাব হইয়াছে।

মধ্যাহ্নের সময় কিঞ্চিৎ অবসর পাইলে, মনোরমা নরুকে কাছে বসাইয়া পড়াইতেন। সুরেন্দ্র পিতার কাছে প্রাতে ও সন্ধ্যায় পুস্তক পাঠ করিত। বল্লভপুরে ভাল পাঠশালা অথবা কোনও স্কুল না থাকায়, নরুর বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছিল। সেই কারণে মনোরমা স্বহস্তে তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে প্রতিবাসিনী রমণীরাও কোনও কোনও দিন মনোরমাদের বাটীতে আসিয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে গল্প করিত। মনোরমা সকলকেই মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট করিতেন। কখনও কখনও মনোরমা দ্বিতলের বারাণ্ডায় একাকিনী দণ্ডায়মানহইয়া নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহে কৃষিকার্য্যের প্রক্রিয়া কৌতূহল সহকারে অবলোকন, করিতেন। স্বামী এবং নগেন্দ্রনাথ কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছেন, দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে ও উল্লাসে পরিপূর্ণ হইত; এবং আপনাদের পূর্ব্ব অবস্থা স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইবামাত্র কখনও কখনও তাঁহার সুন্দর ও বিশাল চক্ষুর্দ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু বর্ষিত হইত। মনোরমা কলিকাতায় সেই স্মরণীয় রাত্রিতে হৃদয়ের আবেগে ভগবান্‌কে যে কাতর ভাবে ডাকিয়া-

ছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। দয়াময় হরি তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন, তাহা মনোরমার বিশ্বাস হইয়াছিল। সেই অবধি মনোরমার হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হইয়া উঠে। মনোরমা স্নানান্তে প্রত্যহ পুষ্প চন্দন লইয়া একাগ্রচিত্তে ইষ্টদেবের পূজা করিতেন এবং ভগবান্‌কে কাতরমনে ডাকিয়া বলিতেন "হে দয়াময় ঠাকুর, তুমি আমাকে দয়া কর; আমরা যেন কখনও তোমার দয়ায় বঞ্চিত না হই। তুমি আমার স্বামী ও সন্তানগুলিকে সুখে ও সুস্থশরীরে রাখ। ঠাকুর তোমার পদে যেন চিরকাল আমাদের সকলেরই ভক্তি অচলা থাকে।" এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে সতীর দুই গণ্ডস্থল বহিয়া পূত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আষাঢ় মাসের মধ্যে কৃষিকার্য্য প্রায় এক প্রকার শেষ হইয়া গেল। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে এরূপ ভয়ানক বৃষ্টিপাত হয় যে, কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলের লোক সেরূপ বৃষ্টিপাত কখনও চক্ষে দেখেন নাই। সামান্য মেঘের সঞ্চার হইলেই, মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে। বল্লভপুরের প্রায় চারিদিকেই পাহাড়। সেই পাহাড়-সমূহের গাত্র বহিয়া ভীষণ শব্দে জলস্রোত নামিতে থাকে। সে শব্দ এরূপ প্রচণ্ড যে, কর্ণ বধির হইয়া যায়। পর্ব্বতের সানুদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "জোড়" বা তটিনী আছে। সেই তটিনীসমূহ মুহূর্ত্ত মধ্যে বন্যার জলে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। কিন্তু সুখের বিষয় এইযে, তটিনীর জল খরবেগে শীঘ্র প্রবাহিত হইয়া যায়। সুতরাং বৃষ্টিপাতের অর্দ্ধঘণ্টা বা এক ঘণ্টা পরে, তাহার বিশেষ কোনও চিহ্ন লক্ষিত হয় না। এই আষাঢ় মাসে কৃষকগণের নিশ্বাস ফেলিবারও অবসর থাকে না। ক্ষেত্রনাথ আপনার সাতজন মুনিষ ও কামিন্ লাগাইয়া ধান্যরোপণ কার্য্য শেষ করিলেন। প্রথম হইতে উদ্যোগ না থাকায়, এ বৎসর পঞ্চাশ বিঘার অধিক জমীতে আবাদ হইল না। এই পঞ্চাশ বিঘা জমীই উৎকৃষ্ট জমী। অবশিষ্ট জমী "টাঁড়" (ডাঙ্গা

জমী)। পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে টাঁড় জমীগুলি আনত হইয়া আসিয়াছে। প্রচুর বর্ষা হইলে, এই টাঁড় জমীতে আশু (আউশ) ধান্য হইতে পারে; অন্যথা, ইহাতে কলাই, টুমুর (অড়হর), রমা (বরবটী) প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধান্যের জমীতে ধান্য রোপণ শেষ হইয়া গেলে, মাধব দত্ত মহাশয়ের পরামর্শক্রমে, ক্ষেত্রনাথ এই টাঁড় জমীগুলিতে চাষ দেওয়াইলেন, এবং কতকগুলিতে কলাই, কতকগুলিতে বরবটী এবং কতক-গুলিতে টুমুর বা অড়হরের বীজ ছড়াইয়া দিলেন। এই-রূপে সর্ব্বসমেত প্রায় পঞ্চাশ বিঘা টাঁড় জমীতে আবাদ করা হইল। এতদ্ব্যতীত, ধান্যের জমী ও টাঁড় জমী আরও প্রায় একশত বিঘা ইতস্ততঃ অকৃষ্ট পড়িয়া রহিল।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি ধান্যের ক্ষেত্রে ধান্য-গাছ-সকল হরিদ্বর্ণ ধারণ করিল। তখন ক্ষেত্রসমূহের চমৎ-কারিণী শোভা হইল। টাঁড়সমূহেও কলাই, অড়হর প্রভৃতির চারা গাছ বাহির হইয়া তাহাদের অপূর্ব্ব শোভা-সম্পাদন করিল। ক্ষেত্রনাথ শস্যক্ষেত্র-সমূহের শোভা দেখিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন; মনোরমাও দ্বিতলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া তদ্দর্শনে আনন্দিত হইতে লাগিলেন। মুনিষদের কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাট অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল; তাহারা কোদালিহস্তে

এখন প্রত্যহ প্রাতে ধান্যক্ষেত্রে গিয়া ক্ষেত্রের ভগ্ন আলি বন্ধন করিত এবং ক্ষেত্র হইতে ঘাস ইত্যাদি নিড়াইয়া ফেলিত। মধ্যাহ্নে তাহাদের বিশেষ কোনও কার্য্য থাকিত না। সেই সময়ে তাহারা বাড়ীর উত্তরদিকে বিস্তৃত ভূখণ্ডে উৎপন্ন শাকসব্জী প্রভৃতির যত্ন করিতে নিযুক্ত রহিত। ইতিমধ্যেই বেগুণ, লাউ, কুমড়া (ডিঙ্গ্‌ল্যা), ঝিঙ্গে প্রভৃতি অনেক অত্যাবশ্যক তরকারীর গাছ বড় হইয়াছিল এবং কোনও কোনও গাছে ফল ধরিতেও আরম্ভ করিয়াছিল। বর্ষার প্রারম্ভেই যমুনার মা মুনিষদিগকে বলিয়া একদিন খানিকটা জমীতে লাঙ্গল দেওয়াইয়াছিল। যমুনা ও যমুনার মা গ্রাম হইতে শাকসব্জীর বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহা এই জমীতে বপন করিয়াছিল। মনোরমা স্বয়ং এই বপন কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। কোথাও শাকের ক্ষেত, কোথাও বেগুণের ক্ষেত, কোথাও লাউ ও কুমড়ার লতা, কোথাও পুঁইশাকের মাচা, কোথাও ঝিঙ্গে এবং করোলার লতা, কোথাও "রামঝিঙ্গা"র (ঢেঁড়শের) গাছ, কোথাও "শকরকন্দ" আলুর ক্ষেত ইত্যাদি। মনোরমা প্রত্যহ অবসরক্রমে এই তরকারীর ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং শাক, ঝিঙ্গে, করোলা, কুমড়া, লাউ, প্রভৃতি স্বহস্তে তুলিয়া আনিতেন। তাঁহারা প্রথম প্রথম বল্লভপুরে আসিয়া তরকারীর বড় অভাব অনুভব করিয়াছিলেন।

তিনক্রোশ দূরে একটী গ্রামে সপ্তাহের মধ্যে এক দিন মাত্র হাট হয়। সেই হাটে যে তরকারী প্রভৃতি আমদানী হইত, তাহা সামান্য। এদেশের লোকেরা তরকারী প্রায় কিনিয়া খায় না। সুতরাং হাটেও তরকারী তত আমদানী হইত না। সেই কারণে, মনোরমা যমুনার মার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাঁহাদের রান্নাঘরের পশ্চাদ্ভাগে প্রায় দুই তিন বিঘা জমীতে এই-সমস্ত আনাজের গাছ উৎপন্ন করাইয়াছিলেন।

একদিন ক্ষেত্রনাথ, মনোরমার সহিত, তরকারীর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। মনোরমা, যমুনার মার সাহায্যে, যে দুই চারিটী তরকারীর বীজ পুঁতিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন; কিন্তু গাছগুলি বড় হইয়া যে এত শীঘ্র ফলবান্ হইয়াছে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। মনোরমার সঙ্গে তিনি ক্ষেত্রের মধ্যে বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে সুরেন ও নরু ছুটিয়া আসিয়া বলিল "বাবা, এই দেখ, আমাদের গাছ কেমন বড় হয়েছে। আমরা নিজেই বীজ পুঁতেছিলাম। গাছগুলি প্রথমে ছোট ছোট ছিল। তার পরে, দেখ, এখন কত বড় হয়েছে। এই দেখ, বাবা, ঝিঙ্গে গাছে কেমন ঝিঙ্গে ধরেছে! এই দেখ, ঝিঙ্গের কেমন হলদে হলদে ফুল!" এই বলিয়া উভয় ভ্রাতায় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ ও

মনোরমা পুত্রদের আনন্দ দেখিয়া হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

ক্ষেত্রনাথ তরকারী-ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে করিতে জমীর উর্ব্বরাশক্তি দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইতেছিলেন। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে অনেক জমী পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি ভাবিতেছিলেন, এই জমীতে গোলআলু, কপি প্রভৃতি অনায়াসেই উৎপন্ন করা যাইতে পারে। স্বামীকে কিছু অন্যমনস্ক দেখিয়া, মনোরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি ভাব্‌ছ?" ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "আমি ভাব্‌ছি, তোমার গিন্নীপনা; আর ভাব্‌ছি যে যখন অল্প চেষ্টাতেই এখানে এত শাক্‌সব্‌জী জন্মিতে পারে, তখন খানিকটা জমীতে আলু চাষ কর্‌লে হয় না?" মনোরমা হাসিয়া বলিলেন, "আমিও যমুনার মাকে সেই কথা বলেছি।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "তা তো বটে; কিন্তু আলুর চাষ কর্‌তে গেলে, তাতে যে মাঝে মাঝে জল সেচন কর্‌তে হ'বে। জল কোথায়? একটা ইন্দারা কাটাতে না পার্‌লে, দেখ্‌ছি আলুর চাষ হ'বে না।" মনোরমা বলিলেন, "হবে না কেন? ঐ যে আমাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে ছোট নদীটি রয়েছে; ঐ নদীতে বারমাসই তো অল্প অল্প জল ব'য়ে যায় ব'লে শুনেছি। সেই জল আলুর ক্ষেতে চালাতে পার না?"

ক্ষেত্রনাথ হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। মনোরমা সহসা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। ক্ষেত্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "নদীর জল রইল কত নীচে, আর তোমার আলুর ক্ষেত হ'ল কত উপরে। অত নীচে থেকে উপরে জল উঠ্‌বে কেমন করে?"

মনোরমা সলজ্জমুখে ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, "কেমন ক'রে উঠ্‌বে, তা আমি অত জানি না। তবে সেদিন বারাণ্ডায় ব'সে ব'সে আমি ভাবছিলাম, যদি ঐ নদীটীর মাঝখানে মাটীর একটা খুব শক্ত বাঁধ দিয়ে দাও, তা হ'লে জল আট্‌কে যাবে আর উঁচুও হ'বে। আর ঐ নদীর পাশের জায়গাতেই যদি আলুর ক্ষেত কর, তা হ'লে সেখান থেকে সহজেই ক্ষেতে জল আস্‌তে পার্‌বে।"

ক্ষেত্রনাথ সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে মনোরমার মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনোরমাও স্বামীর মুখমণ্ডলে সহসা ভাবান্তর দেখিয়া চমকিত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। ক্ষেত্রনাথ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "মনোরমা, বাঃ, কি চমৎকার কথাই বলেছ! এ তো চমৎকার বুদ্ধির কথা! তোমার মাথায় এরূপ বুদ্ধি কেমন ক'রে এল? আমি তো হাজার বছর ব'সে ব'সে ভাব্‌লেও, এ কথাটি ভেবে উঠ্‌তে পারতাম না। তুমি ঠিক কথাই বলেছ।

আশ্বিন মাসে নদীর মাঝখানে একটা বাঁধ দিলে দশদিনেই জল আট্‌কে যাবে। বাঁধের এক কোণে যদি খানিকটা করে জল বেরিয়ে যেতে পায়, তা হ'লে জলের ভারে বাঁধটি ভাঙ্গবে না। বা! চমৎকার কথা! থাম, আমি সব কথা ভাল ক'রে ভেবে দেখি।" এই বলিয়া ক্ষেত্রনাথ সেখান হইতে "ঝোড়ে"র দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। মনোরমা সেখানে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া গৃহের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথ মুনিষগণের সর্দ্দার লখাইয়ের (লক্ষ্মণের) সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বুঝিলেন যে, সেই ছোট নদী নন্দা জোড়ের মাঝে অনায়াসে একটী বাঁধ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাঁধটি তত সুদৃঢ় হইবে না; বর্ষাকালে জলের স্রোত প্রবল হইলে, তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "বর্ষার সময়ে বাঁধ যদি ভেঙ্গে যায়, তখন তার ব্যবস্থা করা যাবে। এখন সাত আট মাস না ভাঙ্গলেই হল।" লখাই বলিল, "সাত আট মাস ইটো নাই ভাঙ্‌ব্যেক্, গলা; গোটা ধরণটাতে ইটো খাড়া থাক্‌ব্যেক্; পর বার্‌ষ্যাতে নাই টিক্‌ব্যেক্"।* তাহার পর, লখাই কৌতূহলপরবশ হইয়া "গলা"কে জিজ্ঞাসা করিল, জোড়ের মাঝখানে বাঁধ দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? তখন ক্ষেত্রনাথ তাহার নিকট নিজ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিলেন "গোলআলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মটরশুঁটি, শাকসব্‌জি, এই-সমস্ত এই জোড়ের ধারের ক্ষেতে আবাদ করবার ইচ্ছে করেছি। ধরণের সময় জল না পেলে তো

---

* গলা (প্রভু) সাত আট মাস ইহা ভাঙ্গিবে না। সমস্ত ধরণের সময় (অর্থাৎ বৎসরের যে সময়ে বৃষ্টিপাত হয় না সেই সময়ে) ইহা খাড়া থাকিবে; পরন্তু বর্ষার সময় ইহা টিকিবে না।

এই-সমস্ত ফসল হবে না। তাই মনে করেছি, জোড়ের মাঝখানে একটা বাঁধ দিলে জল আট্‌কে যাবে, আর সেই জল ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ফসল বাঁচাবো। কেমন, লখাই, বাঁধ দিলে জল আটকাবে না?”

লখাই বলিল “খুব আট্‌কাব্যেক হে, খুব আট্‌কাব্যেক্। ইটো আচ্ছা বুধের কথা বটে। তোরা পূভ্যা বটুস্, আচ্ছা ঠাঁওরাইচুস্। আর জল পাল্যে আলু, আর উটোর কি নাম বটে?—কবি—হঁ কবিই বটে—ইগুলান্ তো ইঠেনে ভারি তেজ বাঁধব্যেক্। আমি বরষ বরষ রাঁচি যাই রহি কি ন? আলু কবির কাম আমি সেথাতে করেছিলি।” † এই বলিয়া লখাই ক্ষেত্রনাথকে বলিল, এই ভাদ্রমাসেই আলু কপির বীজ বপন করিতে হয়; দেরী করিলে ফসল “নামী” (অর্থাৎ বিলম্বে উৎপন্ন) হইবে। অতএব শীঘ্র বীজসংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। পুরুলিয়াতে আলুর বীজ পাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে কপি ইত্যাদির বীজ আনাইতে হইবে। সে ও অন্যান্য মুনিষগণ কল্য হইতেই বাঁধ বাঁধিতে আরম্ভ করিবে। এদিকে, আলু ও

---

† লখাই বলিল “জল খুব আটকাবে। এটি চমৎকার বুদ্ধির কথা। আপনারা পূর্ব্বদেশীয় লোক, বেশ ঠাওর করেছেন। জল পেলে আলু—আর ওর নাম কি,—কপি, হাঁ কপিই বটে, এগুলি তো এই স্থানে সতেজে উৎপন্ন হ'বে। আমি প্রতি বৎসর রাঁচি যাই কি না, সেখানে আমি আলুকপির পাট করেছি।”

কপির ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া ও তাহা উত্তমরূপে কোপাইয়া, মাটী প্রস্তুতও করিতে হইবে।

নন্দা তটিনীর পার্শ্বে প্রায় চারি বিঘা ভূমি নির্দ্দিষ্ট হইল। পরদিন প্রভাতে দুই জন মুনিষ তাহাতে লাঙ্গল দিতে আরম্ভ করিল। এদিকে অন্যান্য মুনিষদের সহিত লখাই সর্দ্দার "শগড়" (শকট) লইয়া পাহাড়ের ধারে গেল, এবং সেখানে শালের মোটা খুঁটি, বাঁশ ও গাছের শক্ত শক্ত মোটা ডাল কাটিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া আনিল। তটিনীর গর্ভ কেবলমাত্র বার চৌদ্দ হাত প্রশস্ত ছিল। লখাই সর্দ্দার তটিনীর গর্ভে পাঁচ হাত অন্তরে দুইটী সারিতে খুঁটি ও বৃক্ষের মোটা ডাল ঘন-সন্নিবিষ্ট করিয়া দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিল, এবং বাঁশের বাতা বা বাকারী দিয়া সেগুলি উত্তমরূপে বাঁধিল। তাহার পর সেই দুই সারির মধ্যে বাঁশের কঞ্চি, বৃক্ষের ছোট ছোট শাখা এবং বড় বড় প্রস্তর ও কঙ্করময় শক্ত মাটী ফেলিতে লাগিল।

ক্ষেত্রনাথ তাহা দেখিয়া বলিলেন, "লখাই, বাঁশের কঞ্চি আর গাছের ডাল মাঝখানে দিলে ভিতরে ফাঁক থেকে যাবে, আর সেই ফাঁক দিয়ে সমস্ত জল বেরিয়ে যাবে। এ রকম কর্‌ছ কেন?"

তদুত্তরে লখাই নিজের ভাষায় বলিল, জল যাহাতে সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহাই করিতে

হইবে। বৃক্ষের ডাল ও খুঁটি ঘন ঘন করিয়া প্রোথিত হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত জল কখনই বাহির হইতে পারিবে না। কিন্তু খানিকটা জল সর্ব্বদাই বাহির হইয়া যাওয়া আবশ্যক, নতুবা বর্ষা না হইলেও, এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। পাহাড় হইতে ঝরণার জল ঝরিয়া সর্ব্বদাই জোড়ে পড়িতেছে। সুতরাং সমস্ত জল রুদ্ধ করা অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত বাঁধের এক পার্শ্বে একটি কাটান রাখিতে হইবে। সেই কাটান দিয়াও জল প্রবলবেগে সর্ব্বদা বহির্গত হওয়া আবশ্যক, নতুবা বাঁধ টিকিবে না।

ক্ষেত্রনাথ কলেজে বিজ্ঞান পড়িয়াছিলেন। তিনি 'নিরক্ষর লখাইয়ের স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, ও তাহার কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।

চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই বাঁধ প্রস্তুত হইয়া গেল। গ্রামের প্রজারা বাঁধ দেখিয়া চমৎকৃত হইল। বাঁধের এক পার্শ্বে কাটান রাখা হইল। জল সেই কাটান দিয়া জলপ্রপাতের ন্যায় ভীষণ শব্দে অনবরত তটিনী-গর্ভে নিপতিত হইতে লাগিল। সেই শব্দ শুনিতে ও জল-প্রপাত দেখিতে ক্ষেত্রনাথের পুত্রগণের অতিশয় আনন্দ হইত। গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে মনোরমাও কখনও কখনও বাঁধের নিকট উপবিষ্ট হইয়া জলপ্রপাত দেখিতেন

ও তাহার গম্ভীর অথচ ভীষণ শব্দ শুনিয়া মনে এক অব্যক্ত ভাব অনুভব করিতেন।

তটিনীর জল বাঁধের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতে তাহার ঊর্দ্ধদিকে প্রায় অর্দ্ধমাইল পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া তটিনী-গর্ভে জল দাঁড়াইয়া গেল। হঠাৎ বৃষ্টি হইয়া তটিনী বেগবতী হইলে কি জানি বাঁধ সহসা ভাঙ্গিয়া যায়, এই জন্য জলবেগ মন্দীভূত করিবার জন্য লখাই এক উপায় অবলম্বন করিল। সে বাঁশ ও কঞ্চির কতকগুলি শক্ত টাটি প্রস্তুত করিল এবং সেগুলি কিঞ্চিৎ দূরে দূরে তটিনীর তীর হইতে তাহার গর্ভ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ করিয়া মৃত্তিকা-প্রোথিত খুঁটির সহিত দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া দিল। এই টাটিগুলির নাম আড়ালি। আড়ালি বাঁধিবার উদ্দেশ্য, এই যে, তটিনীর স্রোত প্রবল হইলে, তাহা তদ্দ্বারা প্রতিহত হইয়া মন্দীভূত হইবে এবং বাঁধের উপর কিছুতেই তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

বল্লভপুর গ্রামের নিকটে কোনও বৃহৎ জলাশয় ছিল না। গ্রামবাসিগণ পার্ব্বতীয় ঝরণা, জোড় ও দোন (দ্রোণ) হইতে জল আনয়ন করিয়া ব্যবহার করিত। এক্ষণে নন্দা জোড়ের জল আবদ্ধ হওয়ায়, সেই আবদ্ধ জলে স্নানাদি করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক হইল। মধ্যাহ্নে দলে দলে পুরুষ, স্ত্রী, বালকবালিকা

নন্দায় স্নান করিতে যাইত। বৈকালে গ্রামের মহিলারা নন্দার জলে কলস পূর্ণ করিয়া সারি বাঁধিয়া মাঠের আলির উপর দিয়া গল্প করিতে করিতে গৃহাভিমুখে গমন করিতেন। ক্ষেত্রনাথের বাটী গ্রামের বহির্ভাগে অবস্থিত থাকায়, সেদিকে গ্রামবাসিগণের তত গতায়াত হইত না, এবং পাহাড় পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান জনশূন্য বোধ হইত। এক্ষণে, নন্দার কল্যাণে এই জনশূন্য স্থান সজন হইল। মনোরমা দ্বিতলের বারাণ্ডা হইতে গ্রামবাসী ও গ্রামবাসিনীদিগকে দেখিতে পাইয়া আনন্দ অনুভব করিতেন।

নন্দার জল আবদ্ধ হইলে, লথাই সর্দ্দার আলু ও কপি প্রভৃতির জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ড কোদালি দ্বারা কোপাইয়া তাহার মাটী প্রস্তুত করিতে যত্নবান্ হইল। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে কপি মটর প্রভৃতির বীজ আসিল। এদিকে ক্ষেত্রনাথ আলুর বীজ সংগ্রহের নিমিত্ত স্বয়ং পুরুলিয়া গমন করিলেন। কিন্তু পুরুলিয়া অঞ্চলের লোকেরা আলুর চাষ করে না। সেই কারণে সেখানে ভাল বীজ পাওয়া গেল না। কেহ কেহ তাঁহাকে তজ্জন্য রাণীগঞ্জে কিম্বা বর্দ্ধমানে যাইতে পরামর্শ দিলেন। ক্ষেত্রনাথ বীজের জন্য কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে পুরুলিয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ষ্টেশনে গাড়ী আসিতে তখনও বিলম্ব ছিল। এই

কারণে তিনি প্ল্যাটফর্ম্মে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। পাদচারণা করিতে করিতে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রি-গণের বিশ্রামাগার হইতে সাহেবী-পরিচ্ছদ-পরিহিত একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোককে বাহির হইতে দেখিয়া একটু চমকিত হইয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষেত্রনাথের মনে হইল, ইহাঁকে যেন তিনি কোথাও দেখিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ স্মৃতি আলোড়ন করিয়া তিনি ইহাঁকে চিনিতে পারিলেন। ক্ষেত্রনাথের মনে হইল, ইহাঁর নাম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সিটি কলেজের বি, এ, ক্লাসে ক্ষেত্রনাথ সতীশের সঙ্গে একত্র পড়িয়াছিলেন। সতীশ কোনও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হইয়া পুরুলিয়ায় আসিয়া থাকিবেন, এইরূপ মনে করিয়া ক্ষেত্রনাথ তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন "সতীশ বাবু, আমায় চিন্‌তে পারেন?" সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ক্ষেত্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কে, ক্ষেত্তর না কি? আরে, তোমায় আবার চিন্‌তে পার্‌বো না? তুমি এখানে কি মনে ক'রে? কারুর উপরে নালিশ ফ্যাসাদ কিছু করেছ না কি?" ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "না, নালিশ ফ্যাসাদ্ কিছু নয়। আমি কল্‌কাতা ছেড়ে এখন এই অঞ্চলেই বাস কর্‌ছি। একটু কাজের জন্যে এখানে এসেছিলাম। এখানে কাজটা হ'ল না, তাই রাণীগঞ্জে যাচ্ছি।"

সতীশবাবু আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন

"কল্‌কাতা ছেড়ে এ অঞ্চলে এসে বাস কর্‌ছ! কোথায় হে? আর কি কাজের জন্যে রাণীগঞ্জে যাচ্ছ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "সে অনেক কথা। তবে সংক্ষেপে এই বল্‌ছি যে, আমি এখন কল্‌কাতার বাস ছেড়েছি। এই জেলার বল্লভপুরে কিছু জমী জায়গা কিনে এখন সেইখানেই চাষবাস কর্‌ছি।"

সতীশচন্দ্র যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বটে? বটে? ভারি চমৎকার তো! কিসের চাষ আবাদ কর্‌ছ?"

ক্ষেত্রনাথ সংক্ষেপে সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলেন, এবং আলুর বীজসংগ্রহের জন্য যে রাণীগঞ্জে যাইতেছেন, তাহাও খুলিয়া বলিলেন।

সতীশচন্দ্র হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন "ভারি চমৎকার! ভারি চমৎকার! আলুর বীজের জন্যে রাণীগঞ্জে যাচ্ছ? আরে ভাই, তার জন্যে তোমায় আর রাণীগঞ্জে যেতে হ'বে না। চল, চল, যত বীজ চাই, সব তোমাকে আমি দেবো।"

ক্ষেত্রনাথ কিছু বিস্মিত হইয়া সতীশচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। সতীশ ক্ষেত্রনাথের বিস্ময়ের কারণ বুঝিতে পারিয়া আবার হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "আমি কোথায় আলুর বীজ পাব, তাই তুমি ভাব্‌ছ বুঝি? তোমার পরিচয় আমি সব শুন্‌লাম। কিন্তু আমার

রিচয়টা তোমাকে এখনও দিই নাই। তুমি সেই বি-এ পাশ ক'রলে? আমিও বি-এ পাশ্ ক'রে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজের কৃষিশ্রেণীতে ভর্ত্তি হ'য়ে দুই বৎসর কৃষিশাস্ত্র অধ্যয়ন কর্‌লাম। তার পর আরও দুই বৎসর নানা স্থানে গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে কাজ শিখ্‌লাম। শেষে গভর্ণমেণ্ট আমাকে কৃষকদের সর্দ্দার ক'রে ফেল্‌লেন। এখন আমি এই জেলায় কৃষকদের সর্দ্দার হ'য়ে এসেছি। আরে ভাই, এই জেলার চাষা-গুলো এমন হতভাগা যে, তারা না কিছু বোঝে, আর না কিছু কর্‌তে চায়। তারা সেই যে মান্ধাতার আমল থেকে কেবল ধানটির চাষ কর্‌তে শিখেছে, তা ছাড়া আর কিছু জানে না, বা শিখ্‌তে চায় না। কত চেষ্টা কর্‌ছি, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এখন তোমার মতন একটা চাষা পেয়ে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। চল, আমার বাসায় চল। আমি তোমাকে একজন পাকা চাষী ক'রে ফেল্‌বো।"

ক্ষেত্রনাথের মনে অতিশয় আনন্দ হইল। সতীশ একটী বন্ধুর প্রতীক্ষায় ষ্টেশনে বসিয়াছিলেন। ট্রেণ আসিল; কিন্তু বন্ধু আসিলেন না। তাহা দেখিয়া সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে সঙ্গে লইয়া বাসায় প্রত্যাগত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বাসায় আসিয়া দুই বন্ধুতে নানা বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলেন। সতীশ ক্ষেত্রনাথের পারিবারিক দুরবস্থার ইতিহাস শুনিয়া বলিলেন "ক্ষেত্তর, এরূপ অবস্থায় তুমি কল্‌কাতার বাস ছেড়ে আর এই অঞ্চলে এসে খুব বুদ্ধিমানেরই কাজ করেছ। আমি বল্লভপুর কখনও দেখি নাই; কিন্তু তোমার মুখে যেরূপ শুন্‌ছি, তা'তে বুঝতে পার্‌ছি, বল্লভপুরের মাটী খুব ভাল। সেখানে শুধু আলু, কপি, মটর, শালগম কেন, অনেক মূল্যবান্ দ্রব্যও উৎপন্ন কর্‌তে পার্‌বে। তুমি হয়ত জান না যে, এই পুরুলিয়া জেলার অনেক স্থানের মাটী কার্পাস উৎপাদন কর্‌বার পক্ষে একান্ত উপযুক্ত। এই জেলাটি কটন্‌-বেল্ট (cotton belt.) অর্থাৎ কার্পাস উৎপাদনযোগ্য ভূমি-মেখলার অন্তর্গত। এখানে যে কিছু কিছু কার্পাস না জন্মে, তা নয়। কিন্তু এদেশের লোকে যে কার্পাস উৎপন্ন করে, তা তত ভাল নয়। কার্পাসের তন্তুগুলি সূক্ষ্ম ও লম্বা হ'লে, তার মূল্য বেশী হয়। কিন্তু আমাদের দেশের কার্পাসের তন্তু মোটা ও ছোট। তা হ'তে মিহি সূতা হয় না, কেবল মোটা সূতাই হয়। মোটা সূতায় মোটা কাপড় হয়। কিন্তু তার মূল্য বেশী নয়। এই জন্য বিলাতে এই দেশের কার্পাসের কিছুমাত্র আদর নাই। এদেশ থেকে বিলাতে

যে কার্পাস রপ্তানী হয়, তায় কেবল দড়ি, টোয়াইন, গদী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বকালে এদেশে সূক্ষ্ম ও লম্বা তন্তুর কার্পাস উৎপন্ন হ'ত ; কিন্তু কালক্রমে যত্নাভাবে কার্পাসের অবনতি ঘটেছে। মিশর ও মার্কিণ দেশের কার্পাসই খুব উৎকৃষ্ট। তাদের তন্তুগুলি সূক্ষ্ম ও লম্বা। কাজেই বিলাতে তাদের আদর বেশী। বিলাতের ল্যাঙ্কেশায়র ও ম্যাঞ্চেষ্টারে যে স[illegible] কাপড় প্রস্তুত হয়, তাদের সূতা মিশর ও মার্কিণের কার্পাস থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকে। অথচ আমাদের দেশের অনেক স্থলে এমন সুন্দর মাটী আছে যে, চেষ্টা করলে আমরাও তাতে খুব উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপন্ন করতে পারি। এক দিন এই ভারতবর্ষেরই কার্পাস, সূতা ও কাপড় জগৎপ্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকাই মস্‌লিন ভারতের কার্পাসের সূতা হ'তেই প্রস্তুত হ'ত। কৃষিকাজটা আজকাল নেহাৎ চাষাদেরই হাতে পড়েছে। তাদের কোনও বুদ্ধিশুদ্ধি নাই। পূর্ব্বপুরুষেরা যে ভাবে ও যে প্রণালীতে কৃষিকাজ করে গেছে, তারা কেবল তারই অনুসরণ করে। তুমি যদি একটা নূতন প্রণালী তাদের ব'লে দাও, তা তারা কিছুতেই গ্রহণ করবে না। এই কারণে আজকাল শিক্ষিত কৃষকের নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছে ; আর এই জন্যই আমি তোমাকে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে দেখে এত সুখী হয়েছি। তোমরা অল্পেই সব কথা বুঝ্‌তে পারবে, আর কৃষিকার্য্যেরও উন্নতি করতে

পারবে। আরে ভাই, কেবল ওকালতী আর কেরাণীগিরি ক'রে কি হ'বে? মাটীই লক্ষ্মী। যার একটু মাটী আছে, তার ভাবনা কি?"

এই বলিয়া সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন "আমার ইচ্ছা, তুমি মিশর দেশের কার্পাসের কিছু বীজ নিয়ে গিয়ে তোমার বল্লভপুরে কার্পাসের চাষ কর। এখন বেশী নয়, কেবলমাত্র এক বিঘা কি দুই বিঘা জমীতে কার্পাস লাগিয়ে দেখ, কি রকম হয়। আমিও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আস্‌ব, আর যা যা করতে হয়, তা তোমায় বলে দেব। এদেশে যে কার্পাস হয়, তার বীজ প্রায় চৈত্র বৈশাখ মাসে, কিম্বা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে বোনে। স্যাঁৎসেঁতে জমীতে ভাল কার্পাস হয় না। ডাঙ্গা জমীই কার্পাস আবাদের পক্ষে ভাল। বেলে, দোআঁশ, এঁটেল, ও নদীতীরের উচ্চ পলিপড়া জমী অর্থাৎ যাতে এখন আর বন্যার জল উঠতে পারে না, এইরূপ জমীই কার্পাস চাষের পক্ষে উপযুক্ত। ভিজে জমীতে কার্পাস গাছ রুগ্ন ও খর্ব্বাকৃতি হয় ও গাছের পাতা পীতবর্ণ হয়ে কুঁকড়িয়ে যায়। এরূপ গাছে ফুল ধরে না, ধরলেও তা ঝ'রে পড়ে। এই কারণে উর্ব্বর অথচ ডাঙ্গা জমীই কার্পাস চাষের পক্ষে একান্ত উপযুক্ত। যদি ডাঙ্গা জমী স্বভাবতঃ উর্ব্বর না হয়, তা

হ'লে তায় সার দিতে হয়। গোবর, ছাই, পচা পাতা, পচা খড়, পচা কলা-গাছ, নদী ও খালের পলিমাটি, পুকুরের পাঁক, পুরাতন মেটে দেওয়াল-ভাঙ্গা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সার। মাটী এঁটেল হ'লে চূন ও ইটের ভাটার পোড়া-মাটী সাররূপে ব্যবহার করা উচিত। এতে মাটী ফাটে না, আর জমী সরস ও উর্ব্বর হয়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসেই কার্পাসের জমীতে দুই তিন বার লাঙ্গল দিতে পার্‌লে ভাল হয়। তা'তে জমী উর্ব্বর হয়, এমন কি জমীতে আর সার না দিলেও চলে। বীজ বপন কর্‌বার আগে কার্পাসের জমী মহিষের লাঙ্গলে দুই তিন বার ভাল ক'রে চষে' তার পর সাত আট বার গরুর লাঙ্গলে চষ্‌তে হয়। যেন কোথাও একটীও ঢেলা না থাকে। মই দিয়ে ঢেলাগুলি ভেঙ্গে ফেল্‌তে হয়। মাটী যখন ধূলার মত হবে, তখন তাতে বীজ বপন কর্‌তে হয়। তুলার মাটী ধূলার মত হওয়া উচিত, এই কথাটি মনে রাখ্‌বে। আমি তোমাকে যে বিদেশী বীজ দেব, তা আশ্বিন কার্ত্তিক মাসেও বোনা চলে। কিন্তু বীজগুলি জমীতে ছড়িয়ে দিও না; তাতে যেখানে-সেখানে গাছ হ'বে। গাছ ঘন হ'লে কার্পাস তুল্‌বার সময় গাছের ডালগুলি ভেঙ্গে যেতে পারে। এই কারণে কার্পাসের বীজ-বপনের নিয়ম এইরূপ:— জমীর পূর্ব্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে আড়াই ফুট সমান্ত-

রালে নালা কেটে ফেল। যেখানে যেখানে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত নালাগুলি পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত নালাসকলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, সেই সেই সংযোগ স্থলে এক একটী বীজ বপন কর। বিদেশী কার্পাসের গাছে জল-সেচন কর্‌তে হয়; এই কারণে, নালা কেটে বীজপবন কর্‌তে পার্‌লে জলসেচনেরও পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়, আর কার্পাসের ক্ষেত্রগুলিও দেখ্‌তে খুব সুন্দর হয়।

"আমি অন্যান্য শস্য আবাদ কর্‌বার কথা কিছু না ব'লে কেবল কার্পাস চাষের কথাই যে এত বল্‌ছি, তার একটী কারণ আছে। দেখ, ধান, কলাই, গম, যব, এদেশে সকলেই আবাদ ক'রে থাকে, আর তুমিও অবশ্য কর্‌বে। কিন্তু কেবল অন্নের যোগাড় হ'লেই তো চল্‌বে না, বস্ত্রেরও যোগাড় চাই। সেই বস্ত্রের যোগাড় কর্‌বার জন্যে আমি তোমাকে এত কথা বল্‌ছি। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক কেবল হুজুক নিয়েই থাকেন। তাঁরা রাজনীতিক আন্দোলন আর ছাই-ভস্ম কত-কি নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকেন। রাজনীতিক আন্দোলনের যে কোনও প্রয়োজন নাই, তা আমি বল্‌ছি না। কিন্তু কেবল রাজনীতিক আন্দোলনেই দেশের উদ্ধার হ'বে না। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের মঙ্গল কিসে হ'বে, সে বিষয়ে কেহ বড় একটা চিন্তা করেন না। শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোকেদের মধ্যে

অনেকেই চাকরী বা ওকালতীর জন্য লালায়িত। যাঁর যতদিন কিছু টাকা না জমে, তিনি ততদিন স্বদেশ-হিতৈষী! তার পর কিছু টাকা জমে গেলেই, বাবাজীর আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। অন্নবস্ত্রের অভাবমোচন না হ'লে লোকের কিছুতেই সুখ ও শান্তি হ'বে না। সেই অন্নবস্ত্রের যোগাড় সর্ব্বাগ্রে করা আবশ্যক। ভারতবর্ষে কত জমী অকৃষ্ট হ'য়ে প'ড়ে আছে, তা কি জান? কিন্তু জমী কর্ষণ কর্‌তে গেলে, অনেক কষ্ট সহ্য কর্‌তে হয়, 'চাষা' হ'তে হয়; তা'তে শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজী ন'ন। যাক্ ও-সব কথা; এখন তোমাকে আমি বল্‌ছি, তুমি কার্পাসের চাষটা ক'রে দেখ। যদি তোমার জমীতে এ বৎসর ভাল কার্পাস জন্মে, তা হ'লে পরে তুমি বিস্তৃতভাবে কার্পাসের চাষ কর্‌তে পার্‌বে। এতে বিলক্ষণ পয়সাও পাবে। আর তোমার দেখাদেখি অপর চাষারাও কার্পাসের চাষ কর্‌বে। তা হ'লে আমাদের দেশেই প্রচুর পরিমাণে ভাল কার্পাস উৎপন্ন হবে। বোম্বাই অঞ্চলে কত সূতার কল ও কাপড়ের কল রয়েছে। আমাদের এই অঞ্চলে যদি ভাল কার্পাস জন্মে, তা হ'লে আমাদের দেশেও কত সূতার ও কাপড়ের কল হবে। বিদেশ হ'তে বিলাতে কার্পাস আমদানী হয়। সে কার্পাস উচ্চ মূল্যে ক্রয় ক'রে বিলাতের লোকেরা তা হ'তে সূতা প্রস্তুত করেন, আর

সেই সূতায় কাপড় বোনেন। সেই কাপড় আবার এদেশে রপ্তানী হয়, আর আমরা তাই না কিনে আমাদের লজ্জা নিবারণ করি। আমরা এমনই অকর্ম্মণ্য জাতি হ'য়ে গেছি! কিন্তু প্রাচীনকালে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা এমন অকর্ম্মণ্য ছিলেন না।"

এই বলিয়া সতীশচন্দ্র আবার নিস্তব্ধ হইলেন। এই দীর্ঘ বক্তৃতার পর তিনি যেন একটু ক্লান্তও হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া অতিথি-সৎকার করিতে মনোনিবেশ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সতীশচন্দ্র কার্পাস-কৃষি-বিদ্যায় সুদক্ষ ছিলেন। বঙ্গদেশের কৃষকেরা যাহাতে উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপন্ন করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি নানাস্থানে প্রভূত যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কোথাও তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি নানাস্থানের কৃষকদের সহিত মিশিয়া বুঝিয়াছিলেন যে একটু লেখাপড়া না জানিলে, ও একটু স্বদেশহিতৈষী না হইলে, কৃষকেরা উন্নত বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালীর উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে বা সেই প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। এই জন্য তিনি শিক্ষিত বা শিক্ষার্থী যুবকগণকে বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী শিক্ষা করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন। কিন্তু কেহ তাঁহার উপদেশে কর্ণপাত করিতেন না। পরপদলেহন-প্রিয় অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও শিক্ষিত যুবকেরা এবং হাইকোর্টের জজিয়তী পদের আকাঙ্ক্ষী নব্য উকীল-মহাশয়েরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে হাসিতেন। তাঁহারা ভাবিতেন যে, এত ব্যয়ে ও পরিশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া শেষে যদি "চাষা" হইতে হয়, তাহা হইলে বিদ্যাশিক্ষার কি প্রয়োজন ছিল? কোথাও সহানুভূতি বা উৎসাহ না পাইয়া সতীশচন্দ্র সর্ব্বদা অতিশয় ক্ষুব্ধ হৃদয়ে কাল

কাটাইতেন। আজ জনৈক শিক্ষিত বন্ধুকে ভাগ্যদোষে বা ভাগ্যগুণে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। সেই আনন্দের উচ্ছ্বাসে তিনি কার্পাস-কৃষি সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ক্ষেত্রনাথকে তাহার প্রয়োজন ও উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন।

ক্ষেত্রনাথ বন্ধুবরের প্রত্যেক কথা স্থিরচিত্তে শ্রবণ করিলেন ও তাহার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাতের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কেবল আত্মরক্ষার জন্যই প্রথমে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া নানাস্থানে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইয়াছিলেন। পরিশেষে, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কলিকাতার বহুদিনের পৈত্রিক বাটী ও আত্মীয় স্বজনগণের মমতা ত্যাগ করিয়া, এখন সকলের ঘৃণা ও বিদ্রূপব্যঞ্জক দৃষ্টির অন্তরালে সপরিবারে বনবাস স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বের মত দারিদ্র্যের কঠোর পীড়ন না থাকিলেও, ক্ষেত্রনাথ এখনও মনে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। এখনও তাঁহাকে বহু বাধা-বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে। এখনও তিনি সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, কখনও হইবেন কি না, তাহাও তিনি জানেন না। তবে যত্ন ও চেষ্টা করিলে শেষ পর্য্যন্ত যে জয়লাভ হইতে পারে, তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে। আত্মরক্ষা

ও পরিবার প্রতিপালন, এই দুইটী বিষয়ের চিন্তাই এখন ক্ষেত্রনাথের মনোরাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাহাতে স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গল-চিন্তার কিছুমাত্র স্থান নাই। কিন্তু আজ সতীশচন্দ্রের কথা শুনিতে শুনিতে সহসা তাঁহার মনের মধ্যে একটী অভিনব আলোকের ছটা আসিয়া পড়িল! সেই আলোকের ছটায় ক্ষেত্রনাথের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি বহুদূর প্রসারিত হইয়া পড়িল। ক্ষেত্রনাথ অল্পে অল্পে যেন বুঝিতে পারিলেন, কৃষিকার্য্যে কিছুমাত্র হীনতা নাই। কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে সভ্য লোকসমাজের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই, এবং এই কার্য্যে আত্ম-সঙ্কোচ ও আত্মগোপনেরও কোনও কারণ নাই। অধিকন্তু তাঁহার মনে হইতে লাগিল, কৃষিকার্য্যই প্রকৃত গৌরবময় কার্য্য এবং স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গলসাধক। ধরিত্রীই আমাদের জননী; জননীকে আশ্রয়রূপে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিলে, অন্নবস্ত্রাভাবে কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইবে না। ধরিত্রীর অপর নাম বসুন্ধরা। তাঁহার নিকট ধন-রত্ন চাহিলে, ধনরত্নের অভাব হইবে না। কৃষি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়; অন্ন জীবমাত্রেরই প্রাণ; এই কারণে অন্ন ব্রহ্ম। ভূমি হইতে যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, প্রধানতঃ তাহাই বাণিজ্যের মূল। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ"; সুতরাং ভূমি স্বয়ং লক্ষ্মী! কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইলে, সকলের

অন্নাভাব ঘুচিবে; বাণিজ্য, ব্যবসায় ও শিল্পের উন্নতি হইবে; দেশের লোক ধনবান্ হইবে, এবং স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গল সাধিত হইবে। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ক্ষেত্রনাথ যে ভূমিলক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আপনাকে ধন্য ও সৌভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের দুঃখ মুহূর্ত্তমধ্যে তিরোহিত হইল, এবং দুঃখের পরিবর্ত্তে মনোমধ্যে আনন্দ, আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ঐশ্বর্য্যশালিনী, স্নেহময়ী, বিশ্বপালিকা জননী-মূর্ত্তি সহসা তাঁহার হৃদয়মন্দিরে দিব্য শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অমনই তাঁহার নয়নযুগলও বাষ্পজলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং তিনি স্বতঃই অস্পষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলেন "জয় মা করুণাময়ি, জগদ্ধাত্রি, কৃপা কর, মা, কৃপা কর।"

আজ ক্ষেত্রনাথের হৃদয়ে শান্তি আসিয়া বিরাজিত হইল। আজ তাঁহার মনের ক্ষোভ, হৃদয়ের দৈন্য, আত্ম-সঙ্কোচ ও আত্মগ্লানি সমস্তই তিরোহিত হইল। আজ তিনি কৃষিকার্য্যকে পবিত্র, গৌরবময় ও মহৎ কার্য্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন। আজ তিনি বুঝিলেন, তিনি কেবল সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত নহেন, পরন্তু সেই স্বার্থের সহিত স্বদেশের ও স্বজাতির মহান্ স্বার্থও বিজড়িত রহিয়াছে। তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন,

তিনি আদর্শস্থানীয় কৃষক হইতে পারিলে, সামান্য পরিমাণেও স্বদেশের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইবে এবং তাঁহার জীবনধারণও সার্থক হইবে।

সেইদিন সন্ধ্যার পর সতীশচন্দ্রের সহিত ক্ষেত্রনাথ কৃষিসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলেন। সেই আলোচনার ফলে তাঁহার প্রচুর জ্ঞানলাভ হইল। কৃষিকার্য্যে সফলতালাভ করিতে হইলে কত বিষয় যে জানিতে হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন। জাপান, আমেরিকা ও ইতালীর কৃষকেরা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে কৃষিকার্য্য করিয়া কত যে প্রচুর শস্য উৎপন্ন করে ও কিরূপ লাভবান্ হয়, তাহাও তিনি অবগত হইলেন। সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে কৃষি সম্বন্ধীয় দুই তিনটি পুস্তক পাঠ করিতে দিলেন এবং আরও কতিপয় উৎকৃষ্ট পুস্তকের নাম লিখিয়া দিলেন; পরদিন প্রভাতে, ক্ষেত্রনাথ আলু ও কার্পাসের বীজ লইয়া মহোৎসাহে বল্লভপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বল্লভপুরে উপনীত হইয়া ক্ষেত্রনাথ তাঁহার শস্যক্ষেত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তন্মধ্যে যেন এক অভিনব শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলেন। জননী ভূমিলক্ষ্মীর স্নেহময়ী মূর্ত্তি যেন তাঁহার নয়নগোচর হইল; তাঁহার আশ্বাসসূচক অভয়বাণীও যেন তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত

হইতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে করজোড়ে জননী ভূমিলক্ষ্মীকে প্রণাম করিলেন।

যথাসময়ে আলুর মাটী প্রস্তুত হইলে, ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রের উপদেশানুসারে প্রায় তিন বিঘা জমীতে আলুর বীজ বপন করিলেন। অবশিষ্ট এক বিঘা জমীতে তিনি ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, মটর, টমেটো (বিলাতী বেগুন), শীম ও নানাজাতীয় শাকসব্জী লাগাইলেন। এদিকে নন্দাজোড়ের অপর পারে একটী উচ্চ অথচ উর্ব্বর ডাঙ্গাজমী কার্পাস-ক্ষেত্রের জন্য নির্ব্বাচিত হইল। নন্দা অদূরবর্ত্তিনী থাকায়, তাহার জল কার্পাসক্ষেত্রে লইয়া যাইতে কোনও অসুবিধার সম্ভাবনা রহিল না। ক্ষেত্রনাথ স্বয়ং দণ্ডায়মান থাকিয়া সতীশবাবুর উপদেশানুসারে কার্পাসক্ষেত্রে লাঙ্গল দেওয়াইতে লাগিলেন। মাটী প্রস্তুত হইলে, তিনি ক্ষেত্রের পূর্ব্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ দিকে আড়াই ফুট্ সমান্তরালে কতকগুলি নালা কাটাইয়া, নালাসমূহের সংযোগস্থলে এক একটী কার্পাসের বীজ বপন করাইলেন। কার্পাসের চারাগাছগুলিকে গোমহিষাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি ক্ষেত্রের চারিদিকে একটী শক্ত বেড়া দেওয়াইলেন। দুই বিঘা পরিমিত ভূমিতে কার্পাসের বীজ উপ্ত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্বিন মাসে বল্লভপুরের শস্যক্ষেত্রসমূহের মনোহারিণী শোভা হইল। সেই শোভাদর্শনে কৃষকমাত্রেরই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। ক্ষেত্রনাথ জীবনে ইতিপূর্ব্বে কখনও কৃষিকার্য্য করেন নাই বা দেখেন নাই; সুতরাং, তাঁহার হৃদয় বিস্ময়মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে পূর্ণ হইল। দুই তিন মাস পূর্ব্বে যে-সকল ক্ষেত্র মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছিল, আজ তৎসমুদায় হরিৎশস্যে অদ্ভুত শোভাময় হইল। বল্লভপুর গ্রামটি যেন এক ক্ষুদ্র হরিৎ-সাগরে পরিণত হইল; মারুতহিল্লোলে তরঙ্গায়িত শস্য-শীর্ষসমুদায় সেই সাগরের তরঙ্গরাজিরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল; বল্লভপুরের মধ্যে যে-স্থানে লোকের বসতি আছে, সেই স্থানটি এই হরিৎসাগরের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথের গৃহের চতুর্দ্দিকেই হরিৎশস্যপূর্ণ ক্ষেত্ররাজি। তন্মধ্যে ধান্যের ক্ষেত্রই অধিক। কোথাও অড়হর, কোথাও কলাই, কোথাও মুগ প্রভৃতি শস্যেরও ক্ষেত্র রহিয়াছে। ক্ষেত্র-নাথ একদিন মনোরমার সহিত দ্বিতলের বারাণ্ডায় দাঁড়া-ইয়া দাঁড়াইয়া শস্যক্ষেত্রসমূহের এই শোভা দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছিলেন; তিনি জননী বসুন্ধরা দেবীর এই শস্য-শ্যামলা মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তি ও আনন্দরসে আপ্লুত হইতে-

ছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ধনধান্যপূর্ণ নিজ গৃহের চিত্রও কল্পনায় অঙ্কিত করিতেছিলেন। মানসপটে সেই চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে, তিনি উৎফুল্লনয়নে মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মনোরমা, এই-সকল শস্য মাড়াই ঝাড়াই ক'রে যখন ঘরে তুল্‌বো, তখন আমাদের ঘরের কেমন শ্রী হবে, বল দেখি? ঘরে কোনও জিনিষের অভাব থাক্‌বে না। ধান, চা'ল, কলাই, অড়হর, মুগ প্রভৃতিতে তোমার ভাণ্ডার পূর্ণ হ'য়ে যাবে। আলু, তরকারী, শাক-সব্‌জীর কোনও অভাব থাক্‌বে না। আবার দুই দশ দিন পরে ছোলা, গম, যবও বুন্‌বো। এদিকে দুই বিঘা জমীতে ভাল কাপাসের বীজ লাগিয়েছি। কাপাস-গাছে যদি ভাল তুলা হয়, তা হ'লে বেশী মূল্যে তা বিক্রীত হবে; আর সেই টাকাতেই আমাদের সম্বৎসরের কাপড় কেনা চল্‌বে। মা ভগবতী এতদিনে আমাদের মুখপানে চেয়েছেন। কল্‌কাতা থেকে আমরা যখন চ'লে আসি, তখন আমি তোমাকে খুলে বলি নাই যে, আমি নিজে বল্লভপুরে চাষ কর্‌বো। যে চাষ করে, লোকে তাকে 'চাষা' বলে। 'চাষা' শব্দটা আমাদের দেশের মধ্যে একটা গালি। লেখাপড়া শিখে,—অবস্থাপন্ন লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে,—পৈত্রিক ব্যবসাবাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে—শেষে যে আমি 'চাষা' হবার সঙ্কল্প ক'রেছি, তা কেবল বন্ধু বান্ধব কেন,

তোমাকেও বল্‌তে আমি সাহস করি নাই। আমার ভয় হয়েছিল, পাছে তারা বা তুমি আমাকে ঘৃণা বিদ্রূপ কর। অথচ, তখন আমার অবস্থা যেরূপ, তা'তে চাষ করা ভিন্ন সংসার-প্রতিপালনের জন্য আমি অন্য কোনও উপায় দেখ্‌তে পাই নাই। আমি প্রথমে মনে করে-ছিলাম, কিছু দিন চাষ ক'রে আগে তো সকলের প্রাণ বাঁচাই, তারপর সংসার চল্‌বার একটা কিছু উপায় হ'লে, চাষ ছেড়ে দিয়ে আবার ব্যবসা আরম্ভ কর্‌বো। চাষ যে আমার জীবনের একটা প্রধান অবলম্বন হবে, তা আমি কখনও ভাবি নাই। অভাবে পড়্‌লে সব কাজই কর্‌তে হয়, এইরূপ ভেবে আমি চাষ ক'র্‌বার সঙ্কল্প করি। কিন্তু আমি যে চাষী হব, তা একদিনের জন্যও দৃঢ়-নিশ্চয় করি নাই। আমি যে চাষী হয়েছি, তার পরিচয় কা'কেও বড় একটা দিই নাই, আর কখন দেবও না, এইরূপ স্থির ক'রেছিলাম। কিন্তু সেদিন পুরুলিয়ায় গিয়ে, কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক আমার যে বন্ধুটি আমাকে আলু ও কাপাসের বীজ দিয়েছিলেন, তাঁর মুখে চাষের যেরূপ উপকারিতার কথা শুন্‌লাম, তাতে আমার মনের ভাব একেবারেই বদ্‌লে গেছে। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কৃষিই লক্ষ্মী, আর ভূমিই সকল ধনের মূল। দেখ, চাষের দ্বারা কতপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়। আমাদের বেণের দোকানের যত রকম মশলা, তাও চাষ ক'রেই লোকে

উৎপন্ন করে। এই-সকল দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ই ব্যবসা। তা ছাড়া মাটীর মধ্যে কত রত্ন ও খনি রয়েছে। সোণা, রূপা, হীরে, মাণিক, তামা, লোহা, অভ্র, পাথুরেকয়লা, এলা মাটী, ক্লেওলীন্ মাটী, চা খড়ি, এই সমস্তই এই মাটীতে পাওয়া যায়। তাই তোমাকে বল্‌ছিলাম, কৃষিই লক্ষ্মী, আর ভূমিই ধনরত্নের মূল। কৃষিকাজটাকে আমি বাণিজ্যের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এইজন্য বল্‌ছি যে, কৃষি দ্বারা শস্য উৎপাদন না কর্‌লে আমরা জীবনধারণ ক'র্‌তে পারি না। সোণা, রূপা, হীরে, মাণিক আর পাথুরে কয়লা খেয়ে কি কেউ বাঁচ্‌তে পারে? জীবনধারণের জন্য শস্য চাই, অন্ন চাই। তা না হ'লে, একদিনের জন্যও সংসার চলে না। যাতে আমাদের জীবন রক্ষা হয়, আর-দশজনেরও জীবনরক্ষার উপায় হয়, সেই কাজ কি শ্রেষ্ঠ নয়? আমার মনে হয়, সেই কাজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মহৎ ও গৌরবময় কাজ আর কিছুই নাই। এখন আমি আপ-নাকে আর 'চাষা' বল্‌তে কোনও লজ্জা অনুভব করি না, বরং তা'তে আমার গৌরবই বোধ হচ্ছে। কলেজে পড়্‌বার সময় বর্দ্ধমান জেলার একটী সহপাঠীকে আমরা 'চাষা' ও 'চাষার দেশের লোক' ব'লে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ ক'র্‌তাম! আহা, বেচারী আমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপে অনেক সময় বড় অপ্রতিভ হ'য়ে পড়্‌তো। কিন্তু সেও সময়ে সময়ে প্রত্যুত্তর ক'রে বল্‌তো 'তোমরা

কল্‌কাতার লোক—কূয়োর ব্যাঙ্‌; চাষের যে কি গুণ, তা তোমরা কি বুঝ্‌বে? তোমাদের বাড়ীতে একটী লোক বা অতিথি এলে, তোমরা তা'রে একবেলা এক মুঠো ভাত দিতে কাতর হও; আর আমরা চাষা হ'লেও, বাড়ীতে দশ জন লোক এলে, তাদের অন্ন দিতে কখনও কাতর হই না। তোমাদের কল্‌কাতা তো এমনই সভ্য সহর!' এই ব'লে সে কখনও কখনও সগর্ব্বে একটী ছড়া বল্‌তো, তা এখনও আমার মনে আছে। ছড়াটি এই:—

ধন, ধন,—ধান ধন, আর ধন গাই,
কিছু কিছু রূপা সোণা, আর সব ছাই।

এখন বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমার সেই সহপাঠীটীর কথাই ঠিক্। ধানই প্রকৃতপ্রস্তাবে ধন; সোণারূপা ধন নয়। সংস্কৃতেও একটী বচন আছে, 'ধনং ধনং ধান্যধনম্।' গাইও ধনের মধ্যে পরিগণিত। গরুকে প্রাচীনকালে গোধন বল্‌তো। ঘরে যদি ধান অর্থাৎ ভাত থাকে, আর গাভীতে যদি দুগ্ধ দেয়, তা হ'লে জীবনরক্ষার আর ভাবনা কি? লোকে কথায় বলে, 'দুধেভাতে সুখে থাক।' সুতরাং বর্দ্ধমানের আমার সেই বন্ধুটির কথাই ঠিক। আর তার কথাটি অমূল্য। এ বৎসর আমাদের কি রকম ফসল হয়, তা দেখে যদি উৎসাহ পাই, তা হ'লে চাষের উপরেই আমি বেশী

ঝোঁক্ দেব। মনোরমা, তোমার চারিদিকে ভূমিলক্ষ্মীর যে শোভা দেখ্‌তে পাচ্ছ, তা'তে তোমার মনে আনন্দ হচ্ছে না?"

মনোরমা স্বামীর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে হাসিয়া বলিলেন "তা আবার বল্‌তে হয়? তোমরা সব মাঠে মাঠে জলে কাদায় ঘুরে বেড়াও; আমি কিন্তু এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোজই মাঠের যে শোভা দেখি, আর তাতে আমার যে আনন্দ হয়, তা তোমায় বল্‌তে পারি না। আমি নীচে বেশীক্ষণ থাকৃতে পারি না; সংসারের কাজকর্ম্ম করি, আর এক-একবার এই বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চাই। তোমার বর্দ্ধমানের বন্ধুটি ঠিক্ কথাই ব'লেছিলেন। ধানই ধন, আর সব ছাই। ধান যে লক্ষ্মী, তা কি আমরা জানি না? ভাত অপ্‌চো (অপচয়) হ'লে, আমরা বলি 'লক্ষ্মীর অপ্‌চো' হ'চ্ছে। আর ধান না হ'লে কি, কখনও লক্ষ্মীপূজো হয়? কল্‌-কাতায় যিনি যতই বড় লোক হ'ন, কারুর ঘরে এক মুঠো ধান নাই! দোকান থেকে চা'ট্টি ধান কিনে না আন্‌লে, কারুর বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা হয় না! সেই জন্তেই কলকাতার লোক এত লক্ষ্মী-ছাড়া! আজ যদি কারুর কিছু টাকা হয়, সে অমনই ঘর-বাড়ী ফাঁদায়, আর গাড়ীজুড়ী চড়ে। তারপর, কাল আবার সেই বাড়ী বন্ধক দিতে বা বেচ্‌তে পথ পায় না। ওগো, আমি বেশ

বুঝ্‌তে পেরেছি, ধানই লক্ষ্মী। এখন মা লক্ষ্মী আমাদের উপর দয়া করুন, আমরা যেন ছেলেপিলে নিয়ে কোনও রকমে সংসার চালাতে পারি। আমরা যে দিন এখানে আসি, সেই দিন দত্ত মশাইয়ের বাড়ীর লক্ষ্মীশ্রী দেখে আমি অবাক্ হ'য়ে যাই। সেই দিনই আমার মনে হয়েছিল, 'আহা, আমাদেরও যদি কখনও এইরূপ হয়।' তুমি চাষের কাজ কর্‌তে পার্‌বে কি না, সেই বিষয়ে আমার ভয় আর সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু তুমিও যে চাষের মহিমা বুঝেছ, তা'তেই আমার মনে আর আনন্দ ধর্‌ছে না। যার যা খুসী হয় সে আমাদের তাই বলুক। যারা সোণাদানা চায়, তারা তাই নিয়ে থাকুক। আমরা সোণাদানা তত চাই না, যত চাই মরাই মরাই ধান। আমাদের ঘরে ধান থাক্‌লে মা লক্ষ্মীর কখনও অকৃপা হবে না, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি।"

মনোরমার কথা শুনিয়া ক্ষেত্রনাথের হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ হইল। উভয়েরই মনে যে একই ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাতে ক্ষেত্রনাথের কিছু বিস্ময় হইল। ক্ষেত্রনাথ ভক্তিনিমীলিত নেত্রে মনে মনে প্রার্থনা করিলেন "মা ব্রহ্মময়ি জগদম্বে, আমাদের উপর কৃপা-কটাক্ষ কর, মা।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যে-সকল টাঁড়্ বা ডাঙ্গাজমীতে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে কোনও শস্য উৎপন্ন হইত না, নন্দার জল বাঁধের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতে, তৎসমুদায়েও এক্ষণে শস্যোৎপাদনের সম্ভাবনা হইল। নন্দার উভয়তটবর্ত্তিনী অনেক ভূমি এইরূপে শস্যশালিনী হইল। তটিনীর এক দিকে আলু, কপি ও মটরের ক্ষেত্র, অপরদিকে কার্পাসের ক্ষেত্র; আবার অন্যত্র তাহার উভয় পার্শ্বেই গম, যব, ছোলা, সরিষা প্রভৃতি শস্যসমূহের জন্যও নূতন নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। লখাই সর্দ্দার বলিতে লাগিল, আগামী চৈত্রমাসে নন্দার তটে দুই তিন বিঘা ভূমিতে সে ইক্ষুও রোপণ করিবে। গম যব প্রভৃতি শস্য-বপনের জন্য ক্ষেত্রসমূহ প্রস্তুত হইলে, ক্ষেত্রনাথ পাঁচ বিঘা জমীতে গম, দুই বিঘাতে যব, চারি বিঘাতে ছোলা, ও চারি বিঘাতে সরিষা বপন করাইলেন। এতদ্ব্যতীত, প্রায় আট বিঘা টাঁড়-জমীতে গুঞ্জা নামক তৈলোৎপাদক একজাতীয় শস্যও উপ্ত হইল। ক্ষেত্রনাথের ভূমিতে অল্প অল্প পরিমাণে এইরূপে প্রায় সকল প্রকার শস্যেরই চাষ হইল। কিন্তু এখনও বহু জমী অকৃষ্ট পড়িয়া রহিল।

আবাদের কার্য্য এইরূপে সমাপ্ত হইলে, মুনিষেরা এখন "ক্ষেতারা"য় মনোনিবেশ করিল, অর্থাৎ, তাহারা

প্রত্যেক ক্ষেত্রে গিয়া তাহা হইতে ঘাস নিড়াইতে লাগিল এবং কোদালি দ্বারা মাটী উল্টাইয়া ফেলিতে লাগিল। ক্ষেতারার পর শস্যের চারাগুলি সতেজে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

প্রচুর ফসলের আশায় ক্ষেত্রনাথ ও তাঁহার পরিবার-বর্গের মনে অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। আর কিছু দিন পরেই তাঁহাদের গৃহ ধান্য, কলাই, অড়হর, মুগ প্রভৃতিতে, এবং আরও দুই চারি মাস পরে যব, গম, মটর, সরিষা, গুঞ্জা, কার্পাস প্রভৃতিতে পূর্ণ হইবে। যে-গৃহে নিত্য অভাব বিদ্যমান ছিল, সেই গৃহে এখন আর অভাবের লেশমাত্র থাকিবে না, অধিকন্তু সকল বিষয়েই প্রাচুর্য্য থাকিবে, এই চিন্তায় কোন্ গৃহীর মন আনন্দ ও উৎসাহে উৎফুল্ল না হয়?

কিন্তু এই জগতে কেহ কখনও নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা আনন্দ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। আনন্দকোলাহলের মধ্যেও বিষাদের করুণ সুর বাজিয়া উঠে; উজ্জ্বল দিবা-লোকের পশ্চাতে অমানিশার অন্ধকার ছুটিয়া আসে; মিলনসুখের মধ্যেও বিরহের ব্যথা জাগিয়া উঠে; আশার পর নৈরাশ্য আসে, এবং সুখের পর দুঃখ আসে। সংসারের বিচিত্রতাই এইরূপ, এবং এই বিচিত্র দ্বন্দ্বের মধ্যেই সংসারচক্র নিয়ত ভ্রাম্যমান।

আশুধান্যগুলি পাকিয়া উঠিয়াছিল। লখাই সর্দ্দার

দুইচারি দিনের মধ্যেই তাহা কাটিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে একদিন প্রাতে সে বিষণ্ণমুখে ক্ষেত্র হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ক্ষেত্রনাথ লখাইয়ের মুখের ভাব দেখিয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি লখাই, মাঠ থেকে হঠাৎ চ'লে এলে যে ?"

লখাই দুঃখিত কণ্ঠে বলিল "আর নাই আস্যে কি ক'র্‌ছি বল্‌, গলা ? লে, তোর কাম লে ; আমি আর লার্‌ব। আমি এত যে গতর খাটালি, সব মিছাই হ'ল।"*

ক্ষেত্রনাথ লখাইয়ের বাক্য শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইয়া বলিলেন "কি হ'ল লখাই ? খুলে বল না ?"

লখাই বলিল "আর কি হ'বেক্ হে। তুই এথাতে চাষ নাই কর্‌তে পার্‌বি ; তুই এথাতে এক শীষও ধান নাই পাবি। হঁ, আমি মিছা নাই ব'ল্‌ছি।" †

ক্ষেত্রনাথের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। লখাই সর্দ্দারের মন এতই খারাপ হইয়াছিল যে প্রকৃত

* লখাই বলিল "প্রভু, আমি না এসে আর কি কর্‌ছি, বলুন। আপনি আপনার কাজ বুঝে নিন্ ; আমি আর কাজ কর্‌তে পার্‌ব না। আমি যে এত গতর খাটালাম, অর্থাৎ পরিশ্রম কর্‌লাম, সবই মিথ্যা হ'ল।"

† লখাই বলিল "আর্ কি হ'বে ? আপনি এখানে চাষ কর্‌তে পার্‌বেন না, বা একটীও ধানের শীষ পাবেন না। সত্য বল্‌ছি ; আমি মিছে কথা বল্‌ছি না।"

ব্যাপার কি, তাহা বহু প্রশ্ন করিয়াও ক্ষেত্রনাথ অবগত হইতে পারিলেন না। লখাই তাঁহাকে কিছু না বলিয়া কেবল এই মাত্র বলিতে লাগিল "চ আমার সাথে, দেখবি চ।" *

অগত্যা ক্ষেত্রনাথ ও নগেন্দ্র লখাইয়ের সঙ্গে চলিলেন। কি একটা গোলমাল হইয়াছে, তাহা মনোরমাও শুনিলেন। শুনিয়া, তাঁহারও মন চঞ্চল হইল।

ক্ষেত্রনাথ লখাইয়ের সঙ্গে আউশ ধান্যের ক্ষেত্রের নিকট উপনীত হইয়া দেখিলেন, দুই তিন বিঘা জমীতে ধান্য নাই। কেহ যেন তাহা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রনাথ মনে করিলেন, পাকা ধান দেখিয়া হয়ত রাত্রিতে চোরে তাহা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি নিজ মনের আশঙ্কা লখাইকে ব্যক্ত করিয়া বলিলে, লখাই বলিল "ইটো চোরের কাম নাই বটে। এথাতে পায়ের চিন্ ভাল্যে দেখ্।" †

ক্ষেত্রনাথ দেখিলেন, ভিজা মাটীতে ছাগলের ক্ষুর-চিহ্নের মত অসংখ্য ক্ষুরচিহ্ন রহিয়াছে। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "লখাই, ছাগলে কি ধান খেয়ে গেছে?"

---

* "চলুন, আমার সঙ্গে, দেখ্বেন চলুন।"

† লখাই বলিল "এ চোরের কাজ নয়। এখানে পায়ের চিহ্ন চেয়ে দেখুন।"

লখাই বলিল "ছাগল নাই বটে হে, ছাগল নাই বটে। ইগুলান্ হরিণ বটে; রাত্যে পাহাড় লে হরিণের পাল ধানের ক্ষেতে হাব্ড়াইছিল; হরিণগুলান্ তোর ক্ষেতের একটাও ধান নাই রাখ্‌ব্যেক্। তুই চাষ্ ক'র্‌তে লার্‌বি। আমি মিছাই গতর খাটালি।" ‡

এই বলিয়া লখাই-সর্দার একটা আলের উপর মাথায় হাত দিয়া এবং দুঃখ ও চিন্তায় মুখ অবনত করিয়া বসিয়া রহিল।

এতক্ষণে ক্ষেত্রনাথ লখাইয়ের দুঃখ ও নৈরাশ্যের কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি বিপদের গুরুত্বও মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিয়া লইলেন। হরিণের পাল এক রাত্রির মধ্যেই যখন তিন বিঘা জমীর ধান খাইয়া ফেলিল, তখন দশ পনর দিনের মধ্যেই তাহারা পঞ্চাশ বিঘার ধান খাইয়া ফেলিবে! কলাই, অড়হর, গম, যব, বুট প্রভৃতি শস্যের ফসলও এইরূপে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে। ক্ষেত্রনাথ চক্ষে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিলেন্। তাঁহার হৃদয়ে যে আশাপ্রদীপ উজ্জ্বলভাবে প্রজ্বলিত হইতেছিল,

‡ লখাই বলিল "ছাগল নয়, ছাগল নয়। এগুলি হরিণের পদচিহ্ন। রাত্রিতে পাহাড় থেকে হরিণের পাল ধানের ক্ষেতে পড়েছিল। হরিণগুলা আপনার ক্ষেতের একটাও ধান রাখ্‌বে না। আপনি চাষ কর্‌তে পারবেন না। আমি মিছামিছি গতর খাটালাম।"

সহসা তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তিনিও মাথায় হাত দিয়া সহসা আলের উপর বসিয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ কেহ একটাও কথা কহিল না। অবশেষে ক্ষেত্রনাথ লখাইকে নানাপ্রশ্ন করিয়া অবগত হইলেন যে, হরিণ, বন্যবরাহ, বন্যহস্তী, শুকপক্ষী ও ময়ূরের উপদ্রবে এই অঞ্চলে চাষ আবাদ করা সুকঠিন। হরিণ, শূকর, হস্তী ও ময়ূর তাড়াইতে না পারিলে, কেহ এক মুঠা শস্যও গৃহে লইয়া যাইতে পারে না। রাত্রিতেই ইহাদের উপদ্রব অধিক হয়। কিন্তু রাত্রিতে শস্যক্ষেত্রে পাহারা দেওয়া বড় বিপজ্জনক। যেখানে হরিণ, সেইখানেই বাঘ ঘুরিয়া বেড়ায়। রাত্রিতে ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে গেলে প্রাণটি হাতে লইয়া যাইতে হয়। খুব উচ্চ টঙ্ বা মাচা না বাঁধিলে রাত্রিতে মাঠে পাহারা দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু বন্যহস্তী আসিলে, টঙ্গে চাপিয়া থাকিয়াও প্রাণরক্ষা করা যায় না। হস্তিগণ ক্রুদ্ধ হইলে টঙ্ ভাঙ্গিয়া ফেলে।

ভীতি ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "লখাই, যখন চাষ আরম্ভ কর্‌লে, তখন এইসব উপদ্রবের কথা আমাকে বল নাই কেন? এত উপদ্রব আছে, জান্‌তে পার্‌লে হয়ত আমি চাষই কর্‌তাম না; নইলে, ফসল বাঁচাবার কোনও উপায় ক'র্‌তাম।"

লখাই ক্ষেত্রনাথের অনুযোগের যাথার্থ্য বুঝিতে পারিয়া

কিছু দুঃখিত হইল। পরে বলিল "গলা, তোকে ইটো কহ্‌তে আমি পাশুরে গেল্‌ছিলি।" * এই বলিয়া লথাই যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই যে, প্রতিবৎসর হরিণের এরূপ উপদ্রব হয় না। হরিণেরা এক পাহাড়ে বার মাস থাকে না, নানা পাহাড়ে চরিয়া বেড়ায়। এই বৎসর বল্লভপুরের পাহাড়ে আসিয়াছে। যে বৎসর হরিণের পাল আসে, সে বৎসর ফসল রক্ষা করা কঠিন হয়। তবে প্রজারা আপন-আপন ধানের ক্ষেতের পার্শ্বে টঙ্‌ বা মাচা বাঁধে এবং সেই মাচায় উঠিয়া পর্য্যায়ক্রমে রাত্রিতে ফসলের পাহারা দেয়। বন্দুক আওয়াজ্‌ করিয়া ভয় দেখাইলে, হরিণের পাল পলাইয়া যায়; কিম্বা নাগ্‌রা বা ধাম্‌সা বাজাইলেও ভয় পায়। বন্য হস্তীর পালও প্রতিবৎসর আসে না; কোনও কোনও বৎসরে আসে। এই বৎসর, ছয় সাত ক্রোশ দূরে সোনাবুরু পাহাড়ে একপাল বন্যহস্তী আসিয়াছে, এবং সেই অঞ্চলের প্রজাদের শস্য নষ্ট করিতেছে। বল্লভপুর গ্রামে কেবল বেচন মণ্ডলের একটী বন্দুক আছে, আর কার্ত্তিক ভূমিজ প্রসিদ্ধ শিকারী বলিয়া তাহারও একটী বন্দুক আছে। কিন্তু এই দুইটীমাত্র বন্দুকে হরিণের পালকে বিতাড়িত করা অসম্ভব। বন্যবরাহের উপদ্রব এবৎসর হয় নাই; কিন্তু বন্যহস্তীর উপদ্রব হইতে পারে। যদি বন্যহস্তী আসে,

---

* "প্রভু, আপনাকে একথা বল্‌তে আমি ভুলে গেছ্‌লাম।"

তাহা হইলে ফসল রক্ষা করা কঠিন কার্য্য হইবে। কাহারও হস্তী মারিবার যো নাই। সে বৎসর ঝালদ্যার নিকটে বান্দ্‌শার পাহাড়ে একটা হাতী মারিয়া একটী লোক তিনমাস ফাটকে গিয়াছিল। জ্যোৎস্নাময় নিশীথে ময়ূরের পাল পাকাধানের ক্ষেতে নামিয়া শস্য নষ্ট করে। দিনের বেলায় ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখী ধানের ক্ষেতে নামে। এখন ধান পাকিবার সময় হইয়াছে, আর ধানের শত্রুরাও দেখা দিয়াছে। লখাই এত "গতর" খাটাইয়া ধানের আবাদ করিল; কিন্তু হরিণের পাল এক রাত্রিতেই তিন বিঘা জমীর ধান সাবাড় করিয়াছে! ইহা দেখিয়া লখাইয়ের মনে বড় নৈরাশ্য জন্মিয়াছে। এখন গ্রামের প্রজাদের সহিত যুক্তি করা আবশ্যক। সকলে মিলিয়া যদি কোনও সদুপায় অবলম্বন করে, তাহা হইলে, এই বৎসর ফসল বাঁচিবে; নতুবা ফসল রক্ষার কোনও সম্ভাবনা নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

লখাই সর্দ্দারের কথা শুনিয়া, ক্ষেত্রনাথের মুখ বিশুষ্ক হইল। তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্ষেত্রনাথ কত কষ্টে ও কত যত্নে এত শস্য উৎপন্ন করিলেন; তিনি ও মনোরমা তাঁহাদের শস্যপূর্ণ ভাণ্ডারের কল্পনা করিয়া মনে কত আশা ও আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন; সহসা এই অচিন্তিত ও অপ্রত্যাশিত বিপদ উপস্থিত! ক্ষেত্রনাথ বুঝিলেন, এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ না করিলে, তাঁহাদের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইবে, এবং তাঁহারা পুনর্ব্বার ভয়ানক দারিদ্র্যকষ্টে পড়িবেন। মাঠের মাঝে বসিয়া বসিয়া ভাবিলে আর কি হইবে? গ্রামের মণ্ডল ও প্রজাদিগকে ডাকাইয়া উপদ্রব-নিবারণের একটি উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য, ইহা স্থির করিয়া ক্ষেত্রনাথ লখাইকে বলিলেন "লখাই, তুমি গ্রামের মণ্ডল ও মাতব্বর প্রজাদের ডেকে 'কাছারী-বাড়ী' নিয়ে এস। আমরা সেখানে যাচ্ছি।" নগেন্দ্র গৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে পিতাকে বলিল "বাবা, আমাদের গোটাদুই বন্দুক কিনে আনলে হয় না? আর মাচা বেঁধে রাত্রিতে পাহারার বন্দোবস্তও করলে হয় না?" কিন্তু নগেন্দ্রনাথের কোন কথাই ক্ষেত্রনাথের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ধীরপাদক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিতে

লাগিলেন। বাড়ীর নিকটে আসিয়া দেখিলেন, দ্বিতলের বারাণ্ডায় মনোরমা উৎসুকনয়নে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আছেন। ক্ষেত্রনাথের চক্ষুর সহিত মনোরমার চক্ষু মিলিত হইবামাত্র ক্ষেত্রনাথ মস্তক অবনত করিলেন এবং চিন্তা-পূর্ণ ম্লানমুখে বৈঠকখানায় আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যে লখাই সর্দ্দারের সহিত বেচন মণ্ডল, ফেলারাম মণ্ডল, গোবিন্দ সর্দ্দার, হরাই মাহাতো প্রভৃতি প্রায় পঁচিশ জন প্রজা কাছারী বাটীতে উপস্থিত হইল। লখাই সর্দ্দার পথেই তাহাদিগকে সমস্ত ব্যাপার বলিয়াছিল। সুতরাং ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে কেন আহ্বান করিয়াছেন, তাহা আর খুলিয়া বলিতে হইল না। হরিণের উপদ্রবের কথা শুনিয়া তাহাদেরও মনে ভয় ও ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল। অনেক বাদানুবাদ ও আলোচনার পর স্থির হইল যে, হরিণ তাড়াইবার জন্য পাহাড়ের কোলে কোলে চারিদিকে দশটি টঙ্গ্ বা মাচা বাঁধিতে হইবে; তন্মধ্যে ক্ষেত্রনাথ তিনটি মাচা বাঁধিবেন, আর অবশিষ্টগুলি প্রজারা বাঁধিবে। প্রজাগণ প্রতিরাত্রিতে পর্য্যায়ক্রমে এবং ক্ষেত্রনাথের মুনিষেরাও রাত্রিকালে মাচায় থাকিয়া শস্যক্ষেত্রের পাহারা দিবে। রাত্রিতে প্রতিপ্রহরে দুইটী মঞ্চ হইতে যুগপৎ নাগরা বা ধামসা বাদিত হইবে। যদি হস্তী আইসে, তাহা হইলে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়া সকল মঞ্চ হইতে যুগপৎ

নাগ্‌রা বাজাইতে হইবে। সকল মঞ্চ হইতে একেবারে নাগরা বাজিয়া উঠিলে, গ্রামের লোকেরাও বুঝিতে পারিবে যে, হস্তী আসিয়াছে, এবং তাহারাও হস্তী তাড়াইবার উপায় অবলম্বন করিবে। গ্রামের মধ্যে কেবল দুইটি বন্দুক আছে; ক্ষেত্রনাথ আরও দুইতিনটি বন্দুকের পাস লইয়া বন্দুক ক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। উপস্থিত, ক্ষেত্রনাথ ও প্রহ্লাদের যে আউশ ধান্য পাকিয়াছে, তাহা দুইএক দিনের মধ্যেই কাটিয়া গৃহে আনা কর্ত্তব্য।

এইরূপ পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের পর সভা-ভঙ্গ হইলে, ক্ষেত্রনাথ সেইদিনই বন্দুকের পাসের জন্য পুরুলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি লখাই সর্দ্দারকে মাচা বাঁধিতে ও ধান কাটিতে উপদেশ দিলেন। লখাইও তৎক্ষণাৎ সমস্ত কার্য্যের উদ্যোগ করিবার জন্য তৎপর হইল।

সমস্ত বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া, ক্ষেত্রনাথ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মনোরমা নগেন্দ্রের মুখে উপস্থিত বিপদ ও আশঙ্কার কথা ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। অবগত হইয়া অবধি তিনিও চিন্তায় ম্রিয়মাণ হইয়া যেন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি যেন কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে রোদনও করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চক্ষু দেখিয়া বোধ হইল। ক্ষেত্রনাথকে দেখিয়া মনোরমা তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন

না; তাঁহার চক্ষু দুটী অশ্রুভারে ছলছল্ করিয়া উঠিল, এবং তাহা হইতে সহসা টস্‌টস্ করিয়া দুই চারি ফোঁটা জল পড়িবামাত্র, তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অঞ্চল দ্বারা চক্ষু দুটী আবৃত করিলেন।

ক্ষেত্রনাথ মনোরমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সাহস ও আশ্বাস দিয়া বলিলেন "ও কি গো! তুমি যে একেবারে ব'সে পড়েছ? অত ভাব্‌লে কি হবে? বিপদ এলেই তার প্রতীকার কর্‌তে হবে। অল্পেই হাল ছেড়ে এলিয়ে পড়্‌লে চল্‌বে কেন? দুঃখ ব্যতীত কখনও সুখ হয় না। ভগবানের রাজ্যের নিয়মই এইরূপ। গোলাপ ফুলটি তুল্‌তে গেলেই হাতে কাঁটা লাগে; পদ্মফুলের মৃণালেও কাঁটা আছে। তুমি কিছু ভেবো না। হরিণগুলোর উপদ্রব যা'তে নিবারণ কর্‌তে পারি, তারই উপায় করা যাচ্ছে। এখন অন্ততঃ তিনটি বন্দুক কিনে আন্‌তে হবে। তার জন্য আজ আমি পুরুলিয়া যাব। পুরুলিয়া হ'তে সম্ভবতঃ কল্‌কাতাও যাব। কল্‌কাতা না গেলে বন্দুক কোথায় পাব? তোমরা দুই তিন দিন সাবধানে থাক্‌বে।"

মনোরমা স্বামীর বাক্য শুনিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন এবং গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

বল্লভপুর হইতে গো-যানে ষ্টেসনাভিমুখে যাইতে যাইতে ক্ষেত্রনাথ সুখের পথে কণ্টক এবং সিদ্ধির পথে বাধা-

বিঘ্ন ও অন্তরায়ের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরের এরূপ বিধান কেন, তাহাও তিনি ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া বুঝিলেন, প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ-সাধনের জন্যই পরমেশ্বরের এই সুব্যবস্থা। বাধা-বিঘ্ন না পাইলে, মনুষ্যের শক্তি জাগরিত ও স্ফুরিত হয় না। বাধা-বিঘ্ন দেখিয়া ভয় পাওয়া বা নিরাশ হওয়া কাপুরুষতা মাত্র। নৈরাশ্যের মধ্যেও আশা দেখিতে হইবে, বিপদের সময়েও ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে, এবং বাধা-বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য বীরদর্পে তাহাদের সম্মুখীন হইতে হইবে। রণে ভঙ্গ দিলেই মনুষ্যত্ব গেল। বাধা-বিঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে যদি প্রাণও যায়, তাহাও ভাল। কেননা, তাহাতে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয় না; বরং সেইরূপ মরণেই প্রকৃত জীবনলাভ করা যায়।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্ষেত্রনাথের মন হইতে অন্ধকার সরিয়া গেল; তাঁহার হৃদয়ের উপর দুশ্চিন্তার যে গুরু ভার চাপিয়াছিল, তাহাও অপসৃত হইল। সন্ধ্যাসমাগমে পথপার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যসমূহ নানাজাতীয় বিহঙ্গমের সুমধুর কলরবে সহসা ঝঙ্কৃত ও মুখরিত হইয়া উঠিল। ক্ষেত্রনাথ যেন তাঁহার অন্তর্জ্জগতের সহিত এই বহির্জ্জগতেরও সহানুভূতি অনুভব করিলেন।

যথাসময়ে ট্রেনে পুরুলিয়াতে উপস্থিত হইয়া ক্ষেত্রনাথ তাঁহার বন্ধু সতীশবাবুর বাসায় গেলেন। সতীশচন্দ্র

ক্ষেত্রনাথকে দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন, এবং তাঁহার পরিবারবর্গের, বিশেষতঃ কৃষিকার্য্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্ষেত্রনাথ সকল বিষয়ের একপ্রকার কুশল জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার কার্পাসক্ষেত্রের বিবরণ বলিতে লাগিলেন। কার্পাসের চারা গাছগুলি সতেজ হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া সতীশবাবু যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "এ বৎসর সকল ফসলই ভাল হবে, এইরূপ আশা করা যায়। কার্পাসও যে ভাল হবে, তা মনে হচ্ছে। কিন্তু হরিণ ও হাতীর বড় উপদ্রব হয়েছে। গতকল্য একপাল হরিণ ধানের ক্ষেতে প'ড়ে প্রায় তিন বিঘা জমীর ধান খেয়ে ফেলেছে। এখন এই উপদ্রব নিবারণ কর্‌তে না পার্‌লে, কোন ফসলই বাঁচাতে পার্‌বো না। তার উপায় কি করা যায়, বল দেখি ?"

সতীশচন্দ্র এই প্রদেশের অবস্থা সবিশেষ জানিতেন না। সেই কারণে, তিনি কোনও প্রকৃষ্ট উপায়ের কথা বলিতে পারিলেন না। তখন ক্ষেত্রনাথ তাঁহার প্রজাদের সহিত যুক্তি করিয়া যে যে উপায় স্থির করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বলিলেন। সতীশচন্দ্র সেই উপায়সমূহের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। তখন ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "এখন ডেপুটী কমিশনারের কাছে যাতে তিনটি বন্দুকের পাশ পাই, তা ক'রে দিতে হবে।" সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা

করিয়া বলিলেন "কমিশনার সাহেব কা'কেও বন্দুকের নূতন পাশ দিতে একেবারে নারাজ। কিন্তু কাল সকালে তুমি আমার সঙ্গে তাঁর সহিত দেখা ক'রতে চল। আমি কার্পাসের চাষের ক্ষতি হবে ব'লে, তোমাকে পাশ দেওয়াতে পারব, এইরূপ আশা করি।"

পরদিন প্রভাতে উভয়েই ডেপুটী কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। ক্ষেত্রনাথের পরিচয় পাইয়া, বিশেষতঃ তিনি বিদেশীয় কার্পাসের বীজ বপন করিয়া কার্পাস উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অবগত হইয়া, সাহেব অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তখন ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে হরিণ ও বন্য জন্তুর উপদ্রবের কথা বলিলেন এবং ফসল রক্ষার জন্য তিনটি বন্দুকের পাশের প্রার্থনাও জানাইলেন। ডেপুটী কমিশনার বলিলেন "পুলিশে সবিশেষ অনুরোধ না করিলে, আমি কাহাকেও পাশ দিই না। কিন্তু আপনি যখন বিদেশীয় কার্পাসের চাষ করিতেছেন, এবং সতীশ বাবুও আপনাকে পাশ দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, তখন আপনাকে পাশ দিতে আমার কোন আপত্তি নাই। আপনার কার্পাসকৃষি কিরূপ হইতেছে, তাহা আমি মফঃস্বল পরিদর্শনের সময় স্বয়ং দেখিয়া আসিব। যে বন্দুকে হাতী মারা যায়, সে বন্দুকের পাশ আমি আপনাকে দিব না। হাতী আসিলে, কোনও রূপে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিবেন।

আপনাদের ঐ অঞ্চলে বাঘও আছে। যদি বাঘ-শীকার করিবার সুবিধা থাকে, আমাকে সংবাদ দিবেন। আজ প্রথম কাছারীতে আপনি আমার এজলাসে গিয়া পাশের জন্য দরখাস্ত করিবেন। আমি পাশ দিবার জন্য হুকুম দিব।"

ক্ষেত্রনাথ সেই দিনই বন্দুক ক্রয়ের নিমিত্ত পাশ সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে কলিকাতা রওনা হইলেন। এবং সেখানে দেড়শত টাকা মূল্যের তিনটি টোটাদার বন্দুক ও প্রচুর সংখ্যক ফাঁকা ও গুলিভরা টোটা লইয়া চতুর্থদিনের প্রাতঃকালে বল্লভপুরে প্রত্যাগত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে আসিয়া দেখিলেন, লখাই সর্দ্দার তাঁহার জমীর প্রান্তভাগে পাহাড়ের ধারে ধারে তিনটি উচ্চ মঞ্চ বাঁধিয়াছে এবং প্রত্যেক মঞ্চের উপরে দুই তিন জনের শয়ন ও উপবেশনের উপযোগী ঘরও বাঁধিয়াছে। হরিণের পাল দ্বিতীয় দিনের রাত্রিতেও আসিয়া ক্ষেত্রনাথের যৎসামান্য, কিন্তু প্রজাগণের বহু শস্য নষ্ট করিয়াছে। তৃতীয় দিনে লখাই সর্দ্দার মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক মঞ্চে দুই দুই জন মুনিষকে শস্যের পাহারায় নিযুক্ত করিয়াছিল এবং তাহাদের সঙ্গে নিজেও একটী মঞ্চে রাত্রিযাপন করিয়াছিল। প্রায় সমস্ত রাত্রিই নাগ্‌রা বাদিত হইয়াছিল। নাগ্‌রার গম্ভীর রবে সমস্ত গ্রাম, শস্যক্ষেত্র ও পর্ব্বতগাত্র প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সে রাত্রিতে হরিণের পাল ক্ষেত্রনাথের জমীর দিকে না আসিয়া, গ্রামের অপর প্রান্তস্থিত শস্যক্ষেত্রসমূহের শস্য নষ্ট করিয়াছিল। প্রজাগণও কিঞ্চিৎ দূরে দূরে মাচা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। চারিটি মাচা প্রস্তুত হওয়ায়, অদ্য হইতে তাহারাও শস্যের পাহারা দিতে আরম্ভ করিবে।

লখাই সর্দ্দার এই কতিপয় দিবস মাচা বাঁধিতে ব্যস্ত থাকিলেও, পক্ক ধান্যগুলি কাটিতে অবহেলা করে নাই।

কর্ত্তিত ধান্যগুলি যথাসময়ে ক্ষেত্রনাথের খামারে আনীতও হইয়াছে। ক্ষেত্রনাথ লখাইয়ের কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন।

ক্ষেত্রনাথ কলিকাতা হইতে তিনটী বন্দুক আনিয়াছেন, এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র গ্রামের প্রজাগণ বন্দুক দেখিবার জন্য দলে দলে কাছারী বাড়ীতে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই কখনও টোটাদার বন্দুক দেখে নাই। সুতরাং বন্দুক দেখিয়া তাহারা তাহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে লাগিল ও যার পর নাই আনন্দিত হইল। কমিশনার সাহেব ক্ষেত্রনাথকে একেবারে তিনটী বন্দুকের পাশ কিরূপে দিলেন, তাহাও তাহাদের বিস্ময়ের ও আলোচনার বিষয় হইল। সাহেব এই পরগণার কোনও জমীদারকে একেবারে তিনটী বন্দুকের পাশ দেন নাই। আর অনেক জমীদারের ঘরে একটীও টোটাদার বন্দুক নাই। টোটাদার বন্দুক যে কত শীঘ্র শীঘ্র ছোড়া যায়, আর তাহা ছোড়াও যে কত সহজ, তাহা দেখিয়া প্রজাগণের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের আবালবৃদ্ধ সকলেই মৃগয়াপ্রিয়। যাহাদের বন্দুক আছে, তাহারা বন্দুক লইয়া মৃগয়া করিতে যায়, আর যাহাদের বন্দুক নাই, তাহারাও তীরধনু, বল্লম, টাঙ্গি বর্শা প্রভৃতি লইয়া মৃগয়া করিতে বহির্গত হয়। ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বন্যবরাহকে

ইহারা যেন কিছুমাত্র ভয় করে না। রাখাল বালকেরা বনাচ্ছন্ন পর্ব্বতের উপরে গো-মহিষাদি চরাইয়া বেড়ায়; কিন্তু তাহাদের মনে যেন কিছুমাত্র ভয় নাই। প্রত্যেক রাখাল বালকের হস্তে সর্ব্বদা একটী ধনু ও একটী তীর দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহার পৃষ্ঠে শরপূর্ণ একটী তূণীরও লম্বমান থাকে। শিশুরাও তীরধনু লইয়া ক্রীড়া করে। কিন্তু তাহাদের তীরের ফলক লৌহময় নহে। ফলতঃ এই প্রদেশের পুরুষমাত্রেই বীরত্ব ও সাহসিকতার উপাসক। স্ত্রীলোকেরাও অতিশয় নির্ভীক। তাহারা কাষ্ঠ ছেদনের জন্য ক্ষুদ্র একটী কুঠারমাত্র লইয়া পর্ব্বতের উপরে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা নির্ভীক, সে দেশের লোকেরা যে অস্ত্রশস্ত্র-প্রিয় হইবে, এবং একটী নূতন অস্ত্রের কথা শুনিলে যে তাহা দেখিবার জন্য কৌতূহল ও উৎসাহ প্রদর্শন করিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি?

ক্ষেত্রনাথ বন্দুক ক্রয় করিয়া আনিলেন বটে, কিন্তু তিনি জীবনে ইতিপূর্ব্বে কখনও বন্দুক ছোড়েন নাই। ক্ষেত্রনাথ এখন বেশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, এই প্রদেশে থাকিতে হইলে, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে নিপুণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এইজন্য তিনি তাঁহার গৃহের অনতিদূরে একটী নির্জ্জন ও নিভৃত প্রান্তরে বন্দুক ছুড়িতে শিখিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং তজ্জন্য গ্রামের প্রসিদ্ধ শিকারী

কার্ত্তিক ভূমিজকে নিযুক্ত করিলেন। নগেন্দ্রও বন্দুক ছুড়িতে শিখিবে, ইহা স্থির হইল।

লখাই সর্দ্দার ক্ষেত্রনাথের বন্দুক দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইল। সেও মৃগয়াপ্রিয় ছিল এবং বন্দুক ছুড়িতে জানিত। এক্ষণে কার্ত্তিক ভূমিজের নিকট টোটাদার বন্দুক ছুড়িবার কৌশল শিক্ষা করিয়া লইয়া ক্ষেত্রনাথকে বলিল "গলা, একটো বন্দুক আমি রাত্যে টঙ্গকে লিয়ে যাব। শিকার পাল্যে গুলাব।" * ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "লখাই, তোমাকে বন্দুক দিতে আমার কোনও আপত্তি নাই। বিশেষতঃ, বন্দুকের পাশে তোমার, কার্ত্তিক ভূমিজের ও নগিনের নাম লিখিয়ে এনেছি। কিন্তু আমার অনুরোধ এই, অনর্থক কোনও জীবজন্তুকে মেরো না। বনের জন্তুকে তাড়াবার জন্য দু'একটা ফাঁকা আওয়াজ ক'রো মাত্র। তা হ'লেই যথেষ্ট হ'বে।" লখাই ক্ষেত্রনাথের প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া বলিল, "তোর কথা আমি নাই মান্‌বো, গলা। হরিণ আমি পাঁয়েছি, কি গুলাইচি। মর্, আমি এত গতর খাটালি, আর হরিণগুলান্ এক রাত্যেই তিন বিঘার ধান সাবাড় কর্‌ল্যেক্ হে? হরিণ আমি নাই গুলাব, তো কি

* প্রভু, রাত্রিতে আমি একটা বন্দুক মাচায় নিয়ে যাব। কোনও শিকার পেলে, আমি গুলি ক'রে মারবো।"

ক'র্‌ব ?” † লখাইকে অসন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছুক না হইয়া ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “লখাই, তোমার যা ভাল মনে হয়, তাই কর।”

গ্রামের প্রায় চতুর্দ্দিকেই কিঞ্চিৎ দূরে দূরে দশটি মঞ্চ প্রস্তুত হইলে, রাত্রির ভোজন সমাপ্ত করিয়া ক্ষেত্রনাথের মুনিষেরা এবং পর্য্যায়ক্রমে গ্রামের প্রজারা নিজ নিজ মঞ্চে আরোহণ করিত। একই সময়ে নিকটবর্ত্তী দুইটী মঞ্চের উপর দুন্দুভি দণ্ড দ্বারা আহত হইয়া গম্ভীর ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিত। দুই ঘণ্টার পর সেই দুইটী দুন্দুভি নীরব হইত। তখন পরবর্ত্তী আর দুইটী মঞ্চের দুন্দুভি দণ্ড দ্বারা আহত হইত। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে গ্রামের চারিদিকেই প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া দুন্দুভি বাদিত হইতে থাকিত।

বল্লভপুর কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে বন্যজন্তুর উপদ্রব হইতে শস্য রক্ষার নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বে কখনও এইরূপ সমবেত চেষ্টা ও ব্যবস্থা করা হয় নাই। সুতরাং প্রথম প্রথম কতিপয় দিবস গ্রামবাসিগণ সমস্ত

† “প্রভু, আপনার কথা আমি মান্‌বো (শুন্‌বো) না। হরিণ আমি দেখ্‌তে পেলেই গুলি ক'র্‌বো। মর্, আমি এত গতর খাটালাম, আর হরিণগুলো এক রাত্রির মধ্যেই তিন বিঘার ধান সাবাড় ক'রে গেল, মশাই। গুলি ক'রে হরিণ না মার্‌নো না তো আমি কি ক'র্‌বো ?”

রাত্রি ধরিয়া দুন্দুভির শব্দ শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিতে লাগিল। দুন্দুভির ধ্বনি এরূপ গম্ভীর যে, তাহা দুই তিন ক্রোশ হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ বল্লভপুর হইতে প্রতি রাত্রিতে দুন্দুভির শব্দ শুনিতে পাইয়া বিস্মিত হইতে লাগিল। পরে যখন তাহার কারণ অবগত হইল, তখন তাহারা গ্রামবাসিগণের, বিশেষতঃ "পূভ্যা লোকগুলানের" বুদ্ধির প্রশংসা করিল। কিন্তু হরিণের পাল তাহাদেরও ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিতে থাকিলেও, তাহারা বল্লভপুর-বাসিগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল না। কোনও বুদ্ধিমান্ নেতার পরিচালন ব্যতিরেকে, এই প্রদেশের লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না।

যে দিন হইতে বল্লভপুর গ্রামের চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী মঞ্চ হইতে দুন্দুভির ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল, সেই দিন হইতেই সেইগ্রামে হরিণের আর উপদ্রব রহিল না। মৃগপাল দুন্দুভির শব্দে ভীত হইয়া সেই গ্রামের সীমা ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিল। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, লখাই সর্দ্দার হরিণ "গুলাইয়া" তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মৃগপাল বল্লভপুরের সীমা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিলেও, ক্ষেত্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রজাবর্গ পাহারা বা দুন্দুভিবাদন বন্ধ করিল না। অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত সমানভাবে এইরূপ পাহারা রাখিবার জন্য তাহারা স্থিরনিশ্চয় করিল। ধান্য কাটা শেষ হইলে এবং ফসল খামারে উঠিলে পর, পাহারা বন্ধ করা না-করা সম্বন্ধে তাহারা বিবেচনা করিবে। আউশ ধান্যের পর আমন ধান্য পাকিতে আরম্ভ করিবে। তৎপরে অড়হর, কলাই প্রভৃতি ফসলও আছে। তৎসমুদায়ও রক্ষা করিতে হইবে। দুন্দুভি নীরব হইলেই, হরিণের পাল, এমন কি হস্তিযূথও সাহস পাইয়া বল্লভপুরে আসিবে, এবং পুনর্ব্বার শস্য নষ্ট করিতে থাকিবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া প্রজাবর্গ প্রতিরাত্রিতে দুন্দুভি বাজাইয়া শস্যের পাহারা দিতে নিযুক্ত রহিল।

যখন সর্ব্বসাধারণের উপর কোনও আপদ আসিয়া পড়ে, তখন ধনী নির্ধন, উচ্চনীচ, ভদ্রাভদ্র, ছোটবড় সকলেই সমবস্থ হয়, এবং পরস্পরের মধ্যে ভেদজ্ঞানও সহসা তিরোহিত হইয়া যায়। তখন ধনীর অভিমান টুটে, নির্ব্বাকের বাক্য ফুটে, এবং গর্ব্বিত ব্যক্তিও আপনার গর্ব্ব পরিহার করে। তখন সকলেই সাধারণ বিপদের

প্রতীকার সাধনের জন্য ব্যাকুল হয়। সকলেরই হৃদয়মধ্যে সহানুভূতির একটী স্রোত বহিতে থাকে, এবং সকলেই পরস্পরের মুখাপেক্ষী হয়। ক্ষেত্রনাথ কলিকাতাবাসী, সভ্যসমাজের ব্যক্তি, সুশিক্ষিত এবং বল্লভপুরের অধিপতি। বল্লভপুরবাসিগণের মধ্যে অনেকেই অসভ্য প্রদেশের লোক, অশিক্ষিত ও অসভ্য-সমাজভুক্ত। সুতরাং ইহাদের সহিত সমানভাবে মেলামেশা করা ক্ষেত্রনাথের পক্ষে যদি কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়, তাহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। প্রজাদের সহিত ভূস্বামীর যতটুকু সম্পর্ক রাখা কর্ত্তব্য, ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরবাসি-গণের সহিত ততটুকুই সম্পর্ক রাখিয়াছিলেন। বল্লভ-পুরবাসিগণও ক্ষেত্রনাথকে ধনী, "কল্‌কাত্তার লোক" "ইংরাজী-ওয়ালা" (অর্থাৎ ইংরাজী-শিক্ষিত) বিশেষতঃ ভূ-স্বামী মনে করিয়া তাঁহার সহিত মেলামেশা করিবার চিন্তাও করিত না। প্রয়োজন ব্যতীত কেহ কাছারী বাটীতে আসিত না। কিন্তু গ্রামের মধ্যে হরিণের উপদ্রব-রূপ এক সাধারণ বিপদ উপস্থিত হইলে, ক্ষেত্র-নাথ সর্ব্বাগ্রে আপনার স্বতন্ত্রতা ও অভিমানের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রজাদের সহিত মিশিলেন। প্রজাবর্গও উপস্থিত বিপদে তাঁহার নেতৃত্ব ও যুক্ত পরামর্শকে মূল্য-বান্ মনে করিয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর হইল, এবং কার্য্য করিয়া হাতেহাতেই সুফল লাভ করিল। হরিণের

পাল প্রায় প্রতিবৎসরই শস্যক্ষেত্রে আপতিত হইয়া শস্য নষ্ট করে এবং প্রজারাও তজ্জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কিন্তু তাহারা তো কখনও একত্র মিলিয়া মিশিয়া হরিণ তাড়াইবার জন্য কোনও সদুপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় নাই? ক্ষেত্রনাথের পূর্ব্বে যিনি বল্লভপুরের ভূ-স্বামী ছিলেন,তিনি তো এক খাজনা আদায়ের সময় ব্যতীত আর কখনও সেখানে আসিতেন না, এবং প্রজাদের সুখ-দুঃখেরও সমভাগী হইতেন না? ক্ষেত্রনাথকে গ্রামে বাস করিতে দেখিয়া, অত্যাচার-অবিচারের ভয়ে প্রজা-বর্গ প্রথমে কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইলেও, এবং ক্ষেত্রনাথকে কিছু অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিলেও, এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত কারণে তাঁহার সম্বন্ধে মনে আর কোনও শঙ্কা বা অবিশ্বাস পোষণ করিল না। ক্ষেত্রনাথ নন্দা জোড়ের উপর একটী বাঁধ দেওয়াতে, গ্রামের লোকের স্নানীয় ও পানীয় জলের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে; তিনি তিনটি টোটাদার বন্দুক আনয়ন করাতে, গ্রামবাসিগণের মনে অনেকটা নিরা-পদের ভাব জাগরিত হইয়াছে; আর হরিণের উপদ্রব নিবারণের জন্য একটী সহজ অথচ আশুফলপ্রদ উপা-য়ের উদ্ভাবন করাতে, তাহাদের শস্যরক্ষারও সম্ভাবনা হইয়াছে। এই সকল বিষয় প্রজাদের মনে বেশ স্পষ্টী-ভূত না হইলেও, এবং তাহারা স্বতন্ত্রভাবে এক একটীর আলোচনা করিতে সমর্থ না হইলেও, তাহারা স্থূলভাবে

মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিল যে, ক্ষেত্রনাথ বাস্তবিক তাহাদের পরম আত্মীয়, পরম বন্ধু ও পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার স্ত্রীও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী, এবং পুত্রকন্যাগুলিও তাহাদের পরম প্রীতির পাত্র। ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রনাথ প্রজাগণের সহিত অসঙ্কোচে মিলিত এবং ইদানীং বন্দুক ছুড়িতে শিখিয়া তাহাদের সহিত কখনও কখনও মৃগয়াতেও যোগদান করিত, এই কারণে সে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিল। সে গ্রামবাসিগণের সহিত নানা-প্রকার সম্পর্ক পাতাইয়া, কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খুড়া, কাহাকেও ভাই ইত্যাদি বলিত। গ্রামবাসিগণও তাহার সহিত মিলিতে আগ্রহপ্রকাশ করিত ও তাহার নিকট কলিকাতার বিচিত্র বিবরণ শুনিত; শুনিয়া অনেক সময় বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকিত। কখনও কখনও নগেন্দ্র তাহাদের কলিকাতার দোকানের কথাও বলিত। তখন কেহ কেহ তাহাকে বল্লভপুরে একটী দোকান খুলিতে অনুরোধ করিত। বল্লভপুরে দোকান খুলিলে জিনিষপত্রের ভাল কাট্তি হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে নগেন্দ্র সন্দেহ প্রকাশ করিলে, তাহারা বলিত, ভাল দোকান খুলিলে, শুধু বল্লভপুরের নহে, পার্শ্ববর্ত্তী আরও দশ পনর খানা গ্রামের লোকেও তাহার দোকান হইতে প্রত্যহ জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে। একটী সামান্য দ্রব্য কিনিতে হইলে, সকলকেই পুরুলিয়া যাইতে

হয়। যদি পুরুলিয়ার দরে, কিম্বা তাহার অপেক্ষা কিছু চড়া দরেও জিনিষপত্র বিক্রীত হয়, তাহা হইলেও লোকে আহ্লাদের সহিত তাহা ক্রয় করিবে। প্রথমতঃ পুরু-লিয়া যাইতে কত কষ্ট, তাহার উপর যাতায়াতের রেল-ভাড়া আছে। আর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট পুরুলিয়াতে দুই একদিন অবস্থান করা। কোথাও মলমূত্র ত্যাগ করিলে, পুলিশে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া ফাটকে আটক রাখে, তাহার পর হাকিমের কাছে লইয়া গিয়া জরীমানা করে। জরীমানা দিতে পারিলে, সে তখনই মুক্তিলাভ করে; আর দিতে না পারিলে, তাহাকে কয়েদ খাটিতে হয়। এই সমস্ত কারণে, লোকে সহজে পুরুলিয়া যাইতে চায় না। নগেন্দ্র যদি একটী ভাল দোকান খুলে, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণে তাহার দোকান হইতে জিনিষ-পত্র তো ক্রয় করিবেই; অধিকন্তু তাহারা তাহাদের বনজ মালও সুলভ দরে বিক্রয় করিয়া যাইবে। বনজ মালের মধ্যে হরিতকী, আমলা, বহেড়া, ধুনা, লাহা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; মধু, মোম প্রভৃতিও যথেষ্ট মিলে; সোনা কিনিতে চাহিলেও, সোনা পাওয়া যায়। এই সমস্ত দ্রব্য ব্যতীত হরিণের শৃঙ্গ, শিকড়-বাকড়, চাউল, গম, সরিষা, গুঞ্জা, অড়হর, মুগ, বিরি (কলাই), লঙ্কা প্রভৃতি দ্রব্যও বহু পরিমাণে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

নগেন্দ্র গ্রামবাসিগণের নিকট ব্যবসায়ের এইরূপ সুবিধার কথা শুনিত ; শুনিয়া বল্লভপুরে একটী দোকান খুলিবার ইচ্ছা করিত ; কিন্তু সে সাহস করিয়া তাহার পিতাকে কোনও কথা বলিতে পারিত না। মাঝে মাঝে সে জননীর সহিত এই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিত। কিন্তু স্বামী কৃষিকার্য্যে ব্যস্ত এবং তাহারই চিন্তায় সর্ব্বদা বিব্রত থাকায়, মনোরমা ক্ষেত্রনাথের নিকট নগেন্দ্রের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে একদিনও সাহস করেন নাই। এক্ষণে প্রজাদের সহিত ক্ষেত্রনাথের মেলা মেশা আরম্ভ হওয়ায়, গ্রামের মাতব্বর প্রজারা প্রায়ই সন্ধ্যার সময় কাছারী-বাটী যাইত এবং ক্ষেত্রনাথের সহিত নানাবিষয়ে গল্প ও কথাবার্ত্তা কহিত। একদিন বেচনমণ্ডল প্রভৃতি তাঁহাকে বল্লভপুরে একটী কারবার খুলিতে অনুরোধ করিল। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "বেচন, এই অঞ্চলে আমার একটী কারবার খুল্‌বার ইচ্ছা আছে। আগে ফসল সমস্ত খামারে তুলি ; তার পর তোমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ ক'র্‌ব।" বেচন বলিল সে কথা যথার্থ বটে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথের আউশ ধান্য কাটা হইয়া যথাসময়ে খামারে উঠিল। খামারবাড়ীর বিস্তৃত উঠান পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করা হইল। আউশ ধান্যগুলি মাড়াই ঝাড়াই করাইয়া ক্ষেত্রনাথ তৎসমুদায় ভাণ্ডারে রাখাইলেন। গো-মহিষাদির আহার্য্য খড় ও বিচালীর অভাব হইয়াছিল; সে অভাবও আপাততঃ মিটিয়া গেল। এক্ষণে আমন ধান্যগুলির যত্নবিধানে লখাই সর্দ্দার প্রভৃতি মনোনিবেশ করিল। কিন্তু আশ্বিন মাসের মধ্যে সুচারু বৃষ্টিপাত না হওয়ায়, কোথাও কোথাও ধান্য মরিতে ও শুকাইতে লাগিল। প্রজারা বৃষ্টির অভাবে অজন্মার আশঙ্কা করিয়া ভীত হইতে লাগিল, এবং চারিদিকেই হাহাকার ধ্বনি উঠিল।

নন্দাজোড়ের জল বাঁধের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতে, আমন ধান্যগুলি রক্ষা করা ক্ষেত্রনাথের পক্ষে কঠিন কার্য্য হইল না। অল্প আয়াস ও চেষ্টাতেই ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে নন্দার জল পরিচালিত হইল। ক্ষেত্রনাথের একগাছি ধান্যও শুকাইয়া নষ্ট হইবার আশঙ্কা রহিল না। প্রজাবর্গ ক্ষেত্রনাথের বুদ্ধি ও কৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইল, এবং তাহারাও অন্যান্য জোড়ের উপর বাঁধ বাঁধিয়া জল আট্‌কাইবার চেষ্টা করিল। কেহ কেহ তদ্বিষয়ে কৃত-

কার্য্য হইল ; কিন্তু অনেকেই কৃতকার্য্য হইল না। তাহা দেখিয়া, যে যে প্রজার ক্ষেত্রে নন্দার জল পরিচালিত হইতে পারে, ক্ষেত্রনাথ সেই সেই প্রজাকে নন্দায় জল লইতে অনুমতি প্রদান করিলেন!

এই প্রদেশের লোকেরা স্বভাবতঃই অলস, নিশ্চেষ্ট, দূরদর্শনহীন ও অমিতব্যয়ী। ইহারা ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে জানে না। যতক্ষণ গৃহে আহার্য্য থাকে, ততক্ষণ ইহাদের কোনও চিন্তা নাই। আহার্য্যের অভাব হইলে, ইহারা ঘটী বাটী, গহনা, এবং এমন কি, কোদাল কুড়ুল পর্য্যন্ত বন্ধক রাখিয়া যাহা পায়, তদ্দ্বারা কিছু দিন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। যখন আর কোনও উপায় থাকে না, তখন কেহ কেহ চুরী ডাকাতী আরম্ভ করে, কেহ বা বিদেশে চাকরী করিতে যায়, এবং কেহ কেহ বা আড়কাঠির হাতে পড়িয়া আসাম কাছাড়ের চা-বাগানে নীত হয়। ফলতঃ, অজন্মা বা দুর্ভিক্ষ হইলে, এই প্রদেশের লোকের কষ্টের অবধি থাকে না, এবং যাঁহারা ধনধান্যবান্, তাঁহারা সর্ব্বদাই সশঙ্ক ভাবে জীবন যাপন করেন।

মাধব দত্ত মহাশয় এই প্রদেশের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ চাষী। তিনি তাঁহার ধান্যাদি শস্য বাঁচাইবার নিমিত্ত তাঁহার জমীর স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। অনাবৃষ্টির সময়ে, তিনি সেই পুষ্করিণীসমূহ হইতে

জল সেচন করিয়া শস্য রক্ষা করেন। বর্ত্তমান বৎসরেও, তিনি শস্যরক্ষার নিমিত্ত পুষ্করিণীসমূহ হইতে জলসেচন করিলেন। তাঁহার ধান্যগুলির রক্ষার সম্ভাবনা হইলে, ক্ষেত্রবাবু ধান্যরক্ষার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহা দেখিবার ও জানিবার জন্য তিনি একদিন বল্লভপুরে আসিলেন। কৃষিকার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, তিনি ইদানীং বহু দিন বল্লভপুরে আসিতে পারেন নাই। এক্ষণে বল্লভপুরে আসিয়া, ক্ষেত্রনাথ যে উপায়ে নন্দার জল আবদ্ধ করিয়া শস্য রক্ষা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন ও তাঁহার বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরিণের উপদ্রব নিবারণের নিমিত্ত তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এতদ্ব্যতীত আলু, কপি, কার্পাস, গম, যব প্রভৃতি ফসলের ক্ষেত্রসমূহ ভ্রমণ করিয়াও তিনি এরূপ বিস্ময় ও আনন্দ অনুভব করিলেন যে তাহা বর্ণনীয় নহে। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তিনি ক্ষেত্রনাথের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবান্ হইলেন, এবং বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, চাষ কর্‌তে কর্‌তে আমি বুড়ো হলাম; কিন্তু আপনি বোধ হয় এর আগে কখনও চাষ করেন নাই। আপনি অল্প দিনের মধ্যেই কৃষিকার্য্যে যেরূপ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তা দেখে আমি অবাক্ হয়েছি; লেখাপড়া শিখ্‌লে বুদ্ধি যে চারিদিকেই খেলে, আর কোন কাজই

আট্‌কায় না, তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ দেখ্‌লাম। আপনার কাছে সকলকেই সব বিষয় শিখ্‌তে হবে। আপনি কার্পাসের যে সুন্দর চাষ করেছেন, তা দেখে আমি খুব বিস্মিত হয়েছি। আর এদেশের মাটিতে আলু, কপি, মটরও যে এমন সুন্দর জন্মে, তা আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাই হোক, আপনি আমাদের এই অঞ্চলে এসে বাস করায় আমরা ধন্য হয়েছি। আপনার আগমন আমাদের পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে।"

ক্ষেত্রনাথ বাধা দিয়া বলিলেন "আপনি কি বল্‌ছেন, দত্ত মশাই! আমি আপনাদের আশ্রয়েই এই দেশে এসেছি। আমি এসব কাজে একেবারে নূতন; কিছু জানি না। আপনার উপদেশে ও লখাই সর্দ্দারের বুদ্ধিতেই আমি সব কাজ কর্‌ছি। গ্রামের প্রজারাও আমাকে বিলক্ষণ সাহায্য করেছে। আমি আপনাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। এ বৎসর এক নূতন জাতীয় কার্পাস-বীজ এখানে বুনেছি। যদি কার্পাস ভাল হয়, তা হ'লে আপনাদেরকেও বীজ আনিয়ে দেব। এখন এ বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়াতে, প্রজাদের ধান ম'রে যাচ্ছে, আর তাদের মনে বড় ভয় ও ভাবনাও হয়েছে। হবারই কথা। দেবতা কৃপা না কর্‌লে, এবৎসর তাদের অর্দ্ধেক ফসলও হবে না। কিন্তু একটা কথা সর্ব্বদাই

আমার মনে হয়। আমরা যে এত কষ্ট পাই, তা কেবল আমাদেরই দোষে। দেখুন, ভগবান্ এ অঞ্চলে কত ছোট ছোট নদী দিয়েছেন। সেই সমস্ত নদীর মধ্যে সর্ব্বদাই জল ব'য়ে যাচ্ছে। এই জলটিও দেবতার কৃপাধারা। কিন্তু দেবতার এই কৃপাধারা আমরা অবহেলায় হারাচ্ছি। পাহাড়ের ঝরণার জল জোড়ে পড়্ছে, জোড়ের জল নদীতে পড়্ছে, আর নদীর জল সমুদ্রে পড়্ছে ;—অর্থাৎ দেবতার কৃপাধারা সর্ব্বদাই ব'য়ে যাচ্ছে। কই, আমরা তো কখনও সেই কৃপা-লাভের জন্য চেষ্টা করি না ? আমি নন্দাজোড়ের জল আটক্ করেছি ব'লে, আজ দেবতার কৃপায় আমার ধানগুলির রক্ষা হ'ল। কিন্তু প্রজারা তো কেউ তা আটক্ ক'রে রাখ্বার কথা একটীবারও ভাবে নাই ? আমি মনে করেছি, আগামী বৎসর সকল প্রজাকেই সমস্ত জোড়ে বাঁধ দিতে বল্‌ব। তা হ'লে অনাবৃষ্টির সময় দেবতার অকৃপার কথা ভেবে কষ্ট পেতে হবে না। আপনি কি বলেন ?"

দত্ত মহাশয় বলিলেন "প্রজাদেরকে তার জন্য আর কিছু বল্‌তে হবে না। তারা আপনা-আপনিই আপনার দৃষ্টান্ত দেখে কাজ কর্‌বে।"

ক্ষেত্রনাথের অনুরোধে দত্ত মহাশয় সেবেলা তাঁহার বাটীতে মধ্যাহ্নভোজন করিলেন। দত্ত মহাশয় কথায়

কথায় ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "পূজো এ বৎসর কার্ত্তিক মাসে। কিন্তু সময়ও নিকট হ'য়ে এল। আমি প্রতি-বৎসর মার প্রতিমা এনে তাঁকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে থাকি। সেই সময়ে, এই অঞ্চলে আমাদের যে-সকল স্বজাতি ও কুটুম্ব আছেন, তাঁরাও অনুগ্রহ ক'রে আমার বাড়ীতে পদধূলি দেন। এই অসভ্য ও জঙ্গল দেশে বাস ক'রে আমরাও অসভ্য হ'য়ে গেছি। কল্‌কাতায় ও আমাদের দেশে যে রকম জাঁকজমকের সহিত পূজো হয়, এখানে তার কিছুই হয় না। আমরা কেবল ভক্তি ক'রে মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিই মাত্র। আপনাকে আমার বল্‌তে সাহস হচ্ছে না; কিন্তু পূজোর কয় দিন আপনি সপরিবারে আমাদের বাড়ীতে এলে, আমরা সকলেই যারপরনাই আনন্দিত হব। গৃহিণী একদিন এখানে এসে মেয়ে-ছেলেদেরকে নিমন্ত্রণ ক'রে যাবেন। দেখুন, আমরা এক রকম বনবাসীই হয়েছি; এ অঞ্চলে আমাদের দেশের লোক বড় বেশী নাই। যে দুই দশ জন আছেন, তাঁরা নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছেন। সকলের সঙ্গে সব সময়ে দেখাসাক্ষাৎও হয় না। কারুর বাড়ীতে শ্রাদ্ধ বা বিবাহ হ'লে, কখনও কখনও আমরা একত্র হই। এদেশে আমাদের দেশের মতন পুজা-পার্ব্বণ বা উৎসবও কিছু নাই। দেখুন না, আমাদের এত বড় পরগণার মধ্যে কেবল রাজার বাড়ীতে আর দুই তিনটি স্থানে দুর্গা-পূজো

হয়। কিন্তু সে সমস্ত স্থানে এরূপ বীভৎস কাণ্ড হয় যে, আমরা কিছুতেই মনে সোয়াস্তি পাই না। মদ মাংস তো আছেই; তার উপর মহিষ-বলি। পূজোর সময় এক-একটী স্থানে চল্লিশ পঞ্চাশটি মহিষ বলি হয়। সে কি বীভৎস দৃশ্য! যেন রক্তের নদী ব'য়ে যাচ্ছে! আমি সাত্বিক ভাবেই মার পূজো করি। আমাদের বাড়ীতে কেবল কুম্‌ড়ো ও আক বলি হয়। আমাদের বাড়ীতে যে পূজো হয়, তা দেখ্‌বার মতন নয়। তবে বৌমা এখানে একলাটি আছেন; আর ছেলেরাও কারুর সঙ্গে বড় একটা মিশ্‌তে পায় না। বিশেষতঃ পূজোর সময়টি এই উৎসবশূন্য গ্রামে তারা নিরানন্দে কাটাবে। এই জন্যই আমি আপনাকে অনুরোধ কর্‌ছি।"

ক্ষেত্রনাথ মাধবদত্ত মহাশয়ের বিনয়পূর্ণ বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিলেন "দত্ত মশাই, এ দেশে প্রথম পদার্পণ করেই আমরা আপনার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। পূজোর সময় আপনার বাড়ী যাব, তার আর কথা কি? কেবল নিমন্ত্রণ কর্‌বার জন্য গৃহিণী ঠাকুরাণীকে কষ্ট ক'রে এখানে আস্‌তে হবে না। তবে তিনি একদিন এখানে এমনই বেড়াতে এলে আমরা সকলেই সুখী হব। বাড়ীতে সর্ব্বদাই আপনাদের কথা হয়। পূজোর সময় ছেলেমেয়েরা তো আপনার বাড়ী

যাবেই, আমরাও গিয়ে মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আস্‌ব।”

এইরূপ আলাপের পর মাধবদত্ত মহাশয় ক্ষেত্রনাথের নিকট বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বৃষ্টির অভাবে ধান্য মরিতে আরম্ভ হওয়ায় চারিদিকেই হাহাকার উঠিল। মা আনন্দময়ীর আগমনে কোথায় লোকের মনে আনন্দ ও উৎসাহ হইবে, না, তৎপরিবর্ত্তে সকলের চিত্ত ঘোর বিষাদের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইল। একটী পশলা বৃষ্টি হইলেই, বার-আনা রকম ফসল বাঁচিয়া যায়। সেই একটী পশলা বৃষ্টির জন্য কৃষককুল সর্ব্বদা আকাশ পানে চাহিতে লাগিল। অনেক স্থলে ইন্দ্রপূজা হইল। যেসকল ব্যক্তি মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা বৃষ্টিপাত করাইতে পারে বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহারাও মাঠের মাঝে ও পাহাড়ের উপর বসিয়া অনেক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিল। ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সন্ধ্যার পর একটী নগ্না নারীকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রাজপথে গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং দেবতা ও রাজার উদ্দেশে গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, এইরূপ করিলেই দেবতা জলবর্ষণ করিবেন! এইরূপ অনেকবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইল বটে, কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা গেল না।

সহসা মহালয়ার দিনে সন্ধ্যার পর আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল। আকাশপ্রান্তে বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল ও মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। রাত্রি

দ্বিপ্রহরের সময় সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। বারিপাত হইতে দেখিয়া সকলের মনে আনন্দের উদয় হইল। ক্ষেত্রনাথও আনন্দ অনুভব করিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে নন্দার বাঁধ সম্বন্ধে নানাপ্রকার আশঙ্কাও অনুভব করিলেন। তিনি নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, লখাই সর্দ্দার অন্যান্য মুনিষগণের সহিত জাগিয়া বসিয়া আছে, এবং বৃষ্টি থামিলেই নন্দার বাঁধ দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিবামাত্র লখাই সর্দ্দার মুনিষগণকে লইয়া নন্দার বাঁধ দেখিতে গেল। ক্ষেত্রনাথ ও মনোরমা তাঁহাদের শয্যাগৃহ হইতেই নন্দার বন্যা-জলের ভীষণ কল্লোল এবং জলপ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ শুনিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই মনে করিলেন, রাত্রির মধ্যেই বাঁধ ভাঙ্গিবে, কিংবা নন্দাতীরবর্ত্তী শস্য-ক্ষেত্রগুলি জলে প্লাবিত হইয়া যাইবে।

লখাই সর্দ্দার প্রভৃতি নন্দার নিকটে গিয়া দেখিল, পর্ব্বতের গাত্র হইতে হড়্ হড়্ শব্দে জল নামিয়া নন্দা-গর্ভে পড়িতেছে। সেই জলে নন্দা উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। নন্দার জলরাশি সমগ্র বাঁধটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ভীমদর্পে ও প্রচণ্ড শব্দে তটিনীগর্ভে প্রপতিত হইতেছে। নন্দার ঊর্দ্ধদিকে লখাই যে-সকল বাঁশের আড়ালি

পুঁতিয়াছিল, তদ্দ্বারা স্রোতের বেগ প্রতিহত হইয়া অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে বটে ; কিন্তু জলরাশি স্বাধীনভাবে প্রবাহিত হইতে না পারিয়া, নন্দার উভয় তটের বহু দূর পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। লখাই তটের ধারে ধারে গিয়া দেখিল যে আলু, কপি প্রভৃতির ক্ষেত্র এখনও জলে আচ্ছন্ন হয় নাই, কিন্তু যদি আরও বৃষ্টিপাত হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে জল উঠিয়া ফসল একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিবে। লখাই সর্দ্দার মুনিষগণের সহিত প্রায় সমস্ত রাত্রি নন্দার তটে বসিয়া রহিল। আর বৃষ্টিপাত না হওয়ায়, নন্দার জল ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তাহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ক্ষেত্রনাথ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া নন্দার বাঁধের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, বাঁধটি দুই এক স্থলে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে ; দুই এক স্থলের শালের খুঁটি উৎপাটিত হইয়াছে এবং নন্দার বন্যা অনেকটা কমিয়া গেলেও, এখনও বাঁধের উপর দিয়া প্রবলবেগে জল প্রবাহিত হইতেছে। আলু ও কপির ক্ষেত্রে জল না উঠিলেও, অনেকগুলি কপির চারা বৃষ্টির জলে নষ্ট হইয়াছে। জলস্রোত মন্দীভূত হইলে, লখাই সর্দ্দার বাঁধটি সংস্কার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

বৃষ্টিপাতে ক্ষেত্রনাথের যৎসামান্য ক্ষতি হইলেও,

প্রজাসাধারণের প্রভূত মঙ্গল হইল। যে ধান্য একেবারে মরিয়া গিয়াছিল, কেবল তাহাই নষ্ট হইল; অবশিষ্ট ধান্য রক্ষা পাইল। মা আনন্দময়ীর শুভাগমন-সময়ে সকলের মনে বিষাদের ছায়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা তিরোহিত হইয়া গেল।

দেবীপক্ষের দ্বিতীয়ার দিনে মাধবদত্ত মহাশয়ের গৃহিণী সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যাটিকে সঙ্গে লইয়া মনোরমাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য গোযানে চাপিয়া বল্লভপুরে উপনীত হইলেন। মনোরমা তাঁহার যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। অনেক দিনের পর দেখাসাক্ষাৎ হওয়ায় অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাদের মধ্যে বাক্যালাপ হইতে লাগিল।

মাধবদত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যাটির নাম শৈলজা। বয়ঃক্রম নয় বৎসর ও দেখিতে অনিন্দ্যসুন্দরী। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে বল্লভপুরে আসিবার সময় যখন মনোরমা প্রভৃতি দত্ত মহাশয়ের বাটীতে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা শৈলজাকে দেখেন নাই। শৈল তখন বৈদ্যবাটীতে তাহার মাতুলালয়ে গিয়াছিল। তাই আজ সহসা তাহাকে দেখিয়া মনোরমা চমৎকৃত হইলেন। এমন ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে মনোরমা আর কখনও কোথাও দেখিয়াছেন কি না, তাঁহার তাহা মনে হইল না। যেমন তাহার মুখের গঠন, নাক, চোখ ও গায়ের রং, তেমনই

তাহার আনন্দময় মধুর স্বভাব। মনোরমা শৈলজার সঙ্গে তাহার মামাবাড়ী সম্বন্ধে অনেক গল্প করিতে লাগিলেন। মনোরমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শৈল, কোন্ দেশটি তোমার ভাল লাগে,—তোমার মামাবাড়ী, না তোমাদের এই দেশ?"

শৈল বলিল "সে দেশও ভাল, এদেশও ভাল। মামা-বাড়ীতে গঙ্গা আছে। গঙ্গার উপর দিয়ে কত নৌকো কত ইষ্টিমার যায়, সে দেখ্‌তে ভারি চমৎকার। আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোজই কত নৌকো ও ইষ্টি-মার দেখ্‌তাম। মামাবাবুর সঙ্গে আমি একবার ইষ্টিমারে চেপে কল্‌কাতা গেছ্‌লাম। কল্‌কাতা মস্ত সহর। কত বড় বড় বাড়ী, কত লোক, কত দোকান, কত জিনিষ! চিড়িয়াখানায় বাঘ, ভালুক, সিংহী, বাঁদর, সাপ, কত কি আছে। যাদুঘরেও মরাজন্তু আছে। কল্‌কাতায় বিদ্যুতের আলো আছে; সেখানে হাওয়া-গাড়ী আপনিই চলে। গঙ্গার উপরে পুল আছে। সেই পুলের উপর থেকে কত জাহাজ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মামাবাবু বল্‌ছিলেন যে ঐ সব জাহাজ সমুদ্র পার হ'য়ে বিলাত যায়। সমুদ্র গঙ্গার চেয়ে মস্ত বড়; কোনও দিকে ডাঙ্গা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, আর তার ঢেউ এক-একটা ঘরের মত উঁচু। মামাবাবু জাহাজে চেপে যখন রেঙ্গুনে গেছ্‌লেন, তখন সমুদ্রে এমন ঝড় আর ঢেউ উঠেছিল যে,

আর একটু হ'লেই জাহাজ ডুবে যেত!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া শৈলজা সহসা নীরব হইল। সে যেন তাহার মানসচক্ষে উত্তালতরঙ্গময় সমুদ্রের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছিল।

মনোরমা শৈলজার কথা শুনিয়া অতিশয় আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহার সুমধুর বাক্যবিন্যাস এবং বাক্য বলিবার সুমধুর ভঙ্গী দেখিয়া মনোরমার হৃদয় তাহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইল। মনোরমা শৈলজাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, শৈল, কল্‌কাতায় যে-সব জিনিষ দেখে এলে, এখানে তো সে-সব নেই; তা হ'লে এদেশ কেমন ক'রে ভাল হ'ল?"

শৈলজা বিষম সমস্যায় পড়িল। সে অল্পক্ষণ ভাবিয়া বলিল "আমার মামাবাড়ীতে আর কল্‌কাতায় কোথাও পাহাড় নেই, শালের বন নেই, ফাঁকা জায়গা নেই; আর কারুর বাড়ীতে ধানের মরাই নেই, গরু নেই; সেখানে দুধ কিনে খেতে হয়, চাল কিন্‌তে হয়। দুধ যেন জলের মতন, খেলে গা বমি বমি করে। সেখানে সকলে কেবল খাবার খায়, আর কেউ মুড়ি খায় না—"

শৈলজার বাক্য শেষ হইতে না হইতে মনোরমা হাসিয়া উঠিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে শৈলজার জননীও হাসিয়া উঠিলেন। শৈলজা অপ্রতিভ হইয়া জননীর অঞ্চলে মুখ লুকাইল। তাহার জননী মনোরমাকে কি

বলিতে যাইতেছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া শৈল জননীর ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া জননীকে নিবারণ করিবার জন্য তাহার সুকোমল হস্ত দ্বারা তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল। জননী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "থাম্, থাম্, ও কি করিস্ শৈল?" তার পর মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "শৈল মুড়ি খেতে বড্ড ভাল বাসে। মামা-বাড়ীতে মুড়ি খেতে পায় না ব'লে শৈল মামাবাড়ীর কত নিন্দে করে।" শৈল সেখানে আর থাকিতে পারিল না; সে তাড়াতাড়ি জননীর ক্রোড় হইতে উঠিয়া আব্দারের স্বরে "যাও" এই কথাটি বলিয়া জননীর পৃষ্ঠে একটি ছোট কিল বসাইয়া দিল, এবং পরমুহূর্ত্তেই সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। জননী তিরস্কারসূচককণ্ঠে বলিলেন "শৈল, আবার দুষ্টুমি কর্‌ছিস্; এখানে ব'স্; কোথায় ছুটে যাস্?" কিন্তু শৈল দ্রুতপদে তৎপূর্ব্বেই সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

মনোরমা ও দত্তগৃহিণী উভয়েই অনেকক্ষণ হাসিলেন। তার পর দত্তজায়া মনোরমাকে বলিলেন "শৈলর এই নয় বছর যাচ্ছে; এখানে বন-জঙ্গলের দেশে ভাল ছেলে পাওয়া যায় না; কোথায় যে শৈলকে দেব, তাই আমা-দের ভাবনা হয়েছে। ওর মামারা সেইজন্য ওকে বৈদ্য-বাটীতে নিয়ে গেছ্‌ল। এখনও কোথাও কিছু ঠিক হয় নাই।" তার পর তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন "তুমি

শৈলকে তোমার বউ কর না গো!” মনোরমা দত্ত-জায়ার কথা শুনিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন বটে; কিন্তু সহসা এই কথার কোনও একটী সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না; কিন্তু কিছু তো একটা উত্তর দেওয়া চাই, এই ভাবিয়া বলিলেন “সে তো ভাগ্যির কথা; অমন সুন্দর টুক্‌টুকে বউ হ'লে তো আমি খুব খুসীই হই। কিন্তু নগিনের বয়স এই সতর বছর; উনি এত শীগ্‌গির কি তার বে' দেবেন?” তারপর মনোরমা বলিলেন “আচ্ছা, আমি তাঁকে বল্‌ব।”

ইহাঁরা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে গৃহপার্শ্ববর্ত্তী উদ্যান হইতে সুরেন, নরু, শৈল একরাশি গাঁদাফুল ও কয়েকটি গোলাপ ফুল লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। নরু আসিয়াই মাকে বলিল “মা, এই দ্যাখ, কত ফুল এনেছি। বড়দা' আমাদেরকে এই ফুল-গুলি তুলে দিলে। আর এ-কে (শৈলকে দেখাইয়া) কত বড় একটা গোলাপ ফুল তুলে দিয়েছে, দ্যাখ।” এই বলিয়া সে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

মনোরমা একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন “কে, নগিন ফুল তুলে দিয়েছে, না কি? নগিন বুঝি বাগানে রয়েছে?” এই বলিয়া মনোরমা একটু মুচ্‌কে হাসিয়া ফেলিলেন। দত্তজায়াও মনোরমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দত্তজায়া মনোরমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই গ্রামবাসী তাঁহাদের পুরোহিতের বাটীতে গমন করিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গকেও নিমন্ত্রণ করিয়া সন্ধ্যার সময় নিজ বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রদেশ-প্রবাসী পূর্ব্বদেশীয় বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। ইঁহাকে সকলে সাধারণতঃ "ভট্টাচার্য্য মহাশয়" বলিয়াই সম্বোধন করেন; সুতরাং আমরাও তাহাই করিব। নিকটবর্ত্তী চারি পাঁচটি গ্রামে ইঁহার যজমান আছে। শাস্ত্রে ইঁহার প্রভূত পাণ্ডিত্য থাকায়, মানভূম জেলার অনেক জমীদারের বাটীতেও ইঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি আছে, এবং শ্রাদ্ধাদি বৃহৎ ক্রিয়া ও ব্যাপারে সর্ব্বদাই ইঁহার নিমন্ত্রণ হয়। বর্দ্ধমান জেলায় ইঁহার আদি বাস ছিল, পরে দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে তাড়িত হইয়া এই প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার দুই চারি ঘর কুটুম্ব এবং জ্ঞাতিও এই গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে বসবাস করিয়াছেন। ইনি গৃহে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া কতিপয় ছাত্রকে শাস্ত্র অধ্যাপন করেন, এবং তাহাদের ভরণ-পোষণও করিয়া থাকেন। অবস্থাপন্ন যজমানেরা ইঁহাকে কিছু কিছু

নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছেন। সেই ভূমির উপসত্ত্ব, জমীদারগণের নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক বৃত্তি এবং পৌরোহিত্য-লব্ধ উপার্জ্জন দ্বারা ইনি সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইঁহার দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরনাথ, কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শিবনাথ এবং কন্যাটির নাম সৌদামিনী। পুত্রেরাও পিতার নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পৌরোহিত্য-কার্য্যে পিতাকে সাহায্য করেন। বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া ইনি এখন আর কঠোর পরিশ্রম করিতে অসমর্থ। মাধবদত্ত মহাশয়ের বাটীতে যে দুর্গোৎ-সব হয়, তাহাতে ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরনাথ পৌরোহিত্য করেন এবং ইনি তন্ত্রধারকের কার্য্য করিয়া থাকেন। কনিষ্ঠপুত্র শিবনাথ অন্য একটী গ্রামের দুর্গোৎসবে পৌরোহিত্য করেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহিণী, কতিপয় বৎসর হইল, পরলোকগমন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার একটী বিধবা ভগিনী, জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ এবং অনূঢ়া কন্যা সৌদামিনী তাঁহার সংসারের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ ও নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিষ্ঠাবান্ কুলীন ব্রাহ্মণ; এই কারণে সৌদামিনীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষ হইলেও, উপযুক্ত পাত্রাভাবে তিনি তাহার বিবাহ দিতে পারেন নাই। সৌদামিনী পিতার নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়াছে। সে বাল্মীকির মূল রামায়ণ এবং দুই

একটী পুরাণ নিত্য পাঠ করিয়া থাকে, এবং প্রত্যহ শিব-পূজা না করিয়া কখনও জলগ্রহণ করে না।

ক্ষেত্রনাথ সপরিবারে বল্লভপুরে আসিয়া বাস করিলে, সৌদামিনী মনোরমার সহিত পরিচিত হয়। সৌদামিনী এরূপ সুশীলা, সলজ্জা, মধুরস্বভাবা ও সুন্দরী যে, সে অল্পদিনের মধ্যেই মনোরমার প্রিয়পাত্রী হইয়া পড়ে। সৌদামিনী আহারাদির পর প্রায় প্রতিদিন মধ্যাহ্নসময়ে মনোরমাদের বাটীতে আসিয়া কখনও কোনও পুস্তক পাঠ করিত, কখনও গল্প করিত, এবং কখনও বা মনোরমার গৃহকার্য্যে সহায়তা করিত। মনোরমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী দেখিতে ঠিক্ সৌদামিনীর মত। সেই কারণে, মনোরমা তাহাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিত এবং তাহার ছেলেরাও তাহাকে মাসী-মা বলিয়া ডাকিত। এইরূপে সৌদামিনীর সহিত মনোরমার বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য হয়। সৌদামিনীর অনন্যসাধারণ গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া ক্ষেত্রনাথও তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন।

দত্ত-গৃহিণী যেদিন বল্লভপুরে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার পরদিন অপরাহ্নকালে, সৌদামিনী মনোরমাদের বাটী যাইতেছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, "কাছারী-বাড়ী" গ্রামের বহির্ভাগে একটী সুবৃহৎ উচ্চ প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত। "কাছারী-বাড়ী" যাইবার

অন্য একটী কাঁচা রাস্তা গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া ধান্য-ক্ষেত্রসমূহের ভিতর আঁকিয়া বাঁকিয়া উচ্চ-নীচ ভূমির উপর দিয়া গিয়াছে। এই রাস্তাটির সংস্কার কখনও হয় নাই। রাস্তার মধ্যে কোথাও খাল, কোথাও গর্ত্ত। বর্ষাকালে সেই খাল ও গর্ত্ত সমূহে জল দাঁড়াইয়া থাকে, এবং অনেক স্থল গভীর কর্দ্দমেও পূর্ণ হয়। দুই তিন দিন পূর্ব্বে বৃষ্টিপাত হওয়ায়, রাস্তার মধ্যবর্ত্তী খাল ও গর্ত্ত-সমূহে জল দাঁড়াইয়াছে এবং অনেক স্থল কর্দ্দমেও পূর্ণ হইয়াছে। গতকল্য দত্ত-গৃহিণীর মুখে সৌদামিনী শুনিয়াছিল যে, তিনি মনোদিদিকেও (মনোরমাকে সৌদামিনী এই নামেই ডাকিত) নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, এবং মনোদিদি তাঁহার ছেলেদের সহিত পূজার সময় তাঁহাদের বাটী যাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সৌদামিনী আজ দুই তিন বৎসর দুর্গাপূজা দেখে নাই। যদি মনোদিদি মাধব-দত্ত মহাশয়ের বাটী যান, তাহা হইলে, সৌদামিনীও তাঁহার সঙ্গে যাইবে। প্রধানতঃ এই কথা বলিবার জন্যই আজ সৌদামিনী “কাছারী-বাড়ী” যাইতেছে।

মধুর শরৎকাল; সুনীল আকাশ; বৈকালিক সূর্য্যের তেজ অনেকটা ক্ষীণ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কনক-কিরণ-মালা পর্ব্বতগাত্রে, হরিৎ-ক্ষেত্রে ও বৃক্ষচূড়ে নিপতিত হইয়া এক অপার্থিব শোভার বিস্তার করিতেছে। ঝির্ ঝির্ করিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে। পথের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী

ক্ষেত্রসমূহে ধান্যের গাছগুলি বৃষ্টির জল পাইয়া সরস, সতেজ ও প্রফুল্ল হইয়াছে; তাহাদের মনোরম হরিৎ-শোভা নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতেছে। পথের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগভীর জলাশয়গুলির নির্ম্মলজলে সুঁদি শালুক প্রভৃতি ফুল ফুটিয়াছে। কোথাও কুশ ও কাশ কুসুমিত হইয়া তাহাদের শুভ্র-শোভায় পথ আলোকিত করিতেছে। সৌদামিনী শারদ-প্রকৃতির এই মনোহারিণী শোভা দেখিতে দেখিতে প্রফুল্লমনে মনোদিদির গৃহাভিমুখে যাইতেছে। সম্মুখে পথের মাঝে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত জল-ও কর্দ্দমপূর্ণ। সৌদামিনী তাহা উত্তীর্ণ না হইয়া বামপার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র পথ ধরিয়া উচ্চ প্রান্তরের উপর উঠিল। এই প্রান্তরটি পার হইলেই কাছারী-বাটী। ক্ষেত্রনাথ এই প্রান্তরে অড়হর বপন করিয়াছিলেন। অড়হরের গাছগুলি বৃষ্টির জলে সতেজ হইয়া বৈকালিক পবন-হিল্লোলে আনন্দে যেন নৃত্য করিতেছিল।

সৌদামিনী প্রান্তরের উপর উঠিয়া পথের পার্শ্বে কতিপয় স্থলপদ্ম-বৃক্ষের নিকট দাঁড়াইল। সেই বৃক্ষগুলি এই সময়ে প্রস্ফুটিত পুষ্পে সুশোভিত হইয়াছিল। সৌদামিনী মনোদিদির ছেলেদের জন্য কয়েকটি স্থলপদ্ম তুলিতে ইচ্ছা করিয়া একটা বৃক্ষের শাখা আনত করিল, এবং বামহস্তে তাহা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এক একটী পুষ্প চয়ন করিয়া তাহা অঞ্চলে রাখিতে লাগিল।

সেই সময়ে অনতিদূরে রাস্তার উপরে টুং টুং টুং করিয়া সহসা ঘণ্টাধ্বনি হইল। সেই শব্দে চকিত হইয়া সৌদামিনী রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিল, একজন সাহেব একটী সাইকেল-গাড়ীতে চড়িয়া বিদ্যুদ্বেগে সেই দিকে আসিতেছেন। রাস্তার উপর দুই তিনটি গরু বসিয়া ছিল। তাহাদিগকে সরাইবার জন্যই তিনি ঘণ্টার শব্দ করিয়াছিলেন। গরুগুলি সাইকেল্ দেখিয়া ও ঘণ্টাশব্দে চকিত হইয়া ঊর্দ্ধপুচ্ছে ধান্যের ক্ষেত্রের দিকে পলায়ন করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সাহেব পথের মধ্যবর্ত্তী জলকর্দ্দমপূর্ণ সেই গর্ত্তের নিকট আসিয়া সহসা রুদ্ধগতি হইলেন ও সাইকেল হইতে নামিয়া পড়িলেন। সাহেব সুন্দর যুবাপুরুষ, তাঁহার পরিচ্ছদ সুন্দর ও পরিষ্কৃত; কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদের নিম্নভাগে কর্দ্দম ছিটাইয়া লাগিয়াছে। সাহেব বাম হস্তে সাইকেলটি ধরিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলেন, পরে আপনা-আপনিই বলিয়া উঠিলেন "আরে, এই জলকাদাটাই পার হওয়া মুস্কিল দেখ্‌ছি।" সৌদামিনী সাহেবের মুখে বাঙ্গলা কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল; কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে ভালরূপে চাহিয়া বুঝিতে পারিল, আগন্তুক সাহেবী-পরিচ্ছদ-পরিহিত একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক। সৌদামিনীর মনে একটু সাহস হইল, আবার লজ্জাও উপস্থিত হইল। সে বামহস্ত দ্বারা স্থলপদ্মের যে শাখাটি ধরিয়া ছিল, সহসা তাহা ছাড়িয়া দিল।

বৃক্ষশাখা সৌদামিনীর কোমল করপীড়ন হইতে মুক্ত হইয়া যেন উল্লাসের সহিত স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। শাখা-সঞ্চালনের শব্দ হইবা মাত্র আগন্তুক সহসা সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি! প্রথম দৃষ্টিপাতমাত্র আগন্তুক মনে করিলেন, পদ্মবনে যেন স্বয়ং পদ্মালয়া বিরাজিতা! এমন ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশপাশ, এমন মুখের গঠন, এমন চক্ষু, এমন নাসিকা, এমন অধরৌষ্ঠ, এমন শ্রী তিনি ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও দেখেন নাই। আগন্তুক বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ সৌদামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সৌদামিনীর চক্ষুও তাঁহার চক্ষুর সহিত মিলিত হইল; কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য। আগন্তুককে তাহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সৌদামিনী লজ্জিতা হইল এবং চক্ষু আনত করিয়া সেই স্থান হইতে অপসৃত হইবার উপক্রম করিল। এমন সময়ে আগন্তুক তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ও গো, আপনি বল্‌তে পারেন, ক্ষেত্রবাবুর বাড়ী কোন্ পথ দিয়ে যাওয়া যায়?" সৌদামিনীর একটু সাহস হইল। সে প্রথমে আগন্তুকের বাক্যের কোনও উত্তর প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; পরে কি যেন ভাবিয়া একটু অগ্রসর হইয়া বলিল "আপনি ঐ রাস্তা দিয়েই যান।" সৌদামিনীর সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আগন্তুক চমৎকৃত হইলেন; পরে

একটু হাসিয়া বলিলেন "এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, তা তো ঐ গ্রামের লোকের মুখেই শুনেছি। কিন্তু এখন এই জল কাদা ভেঙ্গে যাওয়াই তো মুস্কিল। ক্ষেত্রবাবুর বাড়ী যাবার আর কোনও ভাল রাস্তা নাই কি?" সৌদামিনী আগন্তুকের সঙ্কট বুঝিতে পারিয়া মনে মনে একটু আমোদ অনুভব করিল এবং তাঁহার এই সামান্য সঙ্কট মোচন করাও কর্ত্তব্য মনে করিল। সে একটু হাসিয়া বলিল "আপনি ঐ পথে যদি যেতে না পারেন, তবে এই পথে আসুন।" এই বলিয়া সে স্থলপদ্মবনের পার্শ্বে প্রান্তরমধ্যস্থিত মানুষ চলিবার পথটি অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। আগন্তুক যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি সাইকেল্-সহ কোনও রূপে রাস্তা হইতে উচ্চ প্রান্তরের উপর উঠিলেন। তিনি উপরে উঠিবামাত্র, সৌদামিনী বলিল "আপনি এই সরু পথটি ধ'রে যান। ঐ বাড়ী।" যুবতী কে, তাহা আগন্তুক ঠিক্ বুঝিতে পারিলেন না। আকার-প্রকারে তাঁহাকে উচ্চবংশসম্ভূতা বলিয়াই মনে হইল; কিন্তু তিনি সধবা কি কুমারী, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। মনে একটা ধাঁধা লাগিল। যুবতীর সলজ্জ, সদয়, সাহসপূর্ণ অথচ নির্দ্দোষ ব্যবহারে আগন্তুক এতই চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহার যৎসামান্য পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি যুবতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন

"ক্ষেত্রবাবু কি আপনার কেউ হন?" যুবতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল "আমরা বামুন।" আগন্তুক যেন আনন্দিত হইয়া বলিলেন "বটে, এখানে বামুনও আছে? কয় ঘর?" সৌদামিনী বলিল "চার ঘর।" আগন্তুক সহসা বলিয়া ফেলিলেন "তবে, আপনি বুঝি কুলীনের মেয়ে?" সৌদামিনী এই প্রশ্নে বিরক্তি ও লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া অধোবদন হইল। তাহার চক্ষু দুটী আগন্তুককে তাঁহার ধৃষ্টতার জন্য যেন তিরস্কার করিতে লাগিল। আগন্তুক তাহা যেন বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। এদেশে বাঙ্গালী এত কম যে, আপনাকে সেই কারণে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।" যুবতীকে শেষের প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়া আগন্তুক যে ভাল কাজ করেন নাই, তাহা তিনিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু প্রশ্নটি যেন সহসা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক, সেখানে আর অধিকক্ষণ থাকা অনুচিত মনে করিয়া ও তাঁহার ধৃষ্টতার জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোনও রূপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, তিনি বাম হস্তে সাইকেলটি ধরিয়া যুবতীপ্রদর্শিত পথে গমন করিলেন।

আগন্তুক চলিয়া গেলে সৌদামিনী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিল। এই আগন্তুকটি কে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তিনি

কেন তাহাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন? সৌদামিনীর মনে বড় লজ্জা হইতে লাগিল। সে মনোরমাদের বাড়ী যাইবে কি না, তাহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল; এমন সময়ে গ্রামের এক দল বালক কোলাহল করিতে করিতে ছুটিয়া সেই স্থানে উপনীত হইল। সাইকেলে চড়িয়া সাহেবকে আসিতে দেখিয়া তাহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু সাহেব দ্রুত গতিতে তাহাদিগকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আইসেন। বালকেরা রাস্তার মধ্যবর্ত্তী সেই জলপূর্ণ গর্ত্তের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং স্থলপদ্মবনে সৌদামিনীকে দেখিতে পাইয়া বলিল "বামুনপিসী, সাহেব কুন্ঠে গেল?"* সৌদামিনী হাসিয়া বলিল "সাহেব খাল পার হ'য়ে চ'লে গেছে।" তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল "সাহেব কিস্তরে খালটো পার্হাইল?" † সৌদামিনী হাসিয়া বলিল "সাহেব গাড়ীসুদ্ধ খাল ডিঙ্গিয়ে পার হ'য়ে গেল।" বালকেরা আরও বিস্মিত হইয়া বলিল "বামুনপিসী, তুই দেখ্লি?" সৌদামিনী হাসিয়া বলিল "হাঁ রে, দেখেছি বই কি?" তখন বালকেরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতে লাগিল "কেমন কল দেখ্লি? সাহেবটো কলের

---

* সাহেব কোথায় গেল?

† সাহেব কিরূপে খালটি পার হইল?

গাড়ী লিয়ে হনুমানের মতন লাকাঁয়ে সাগর ডিঙ্গহাইল।"
তাহাদের কথা শুনিয়া সৌদামিনী উচ্চ হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিল না।

বালকদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সৌদামিনীর মনের লজ্জা ও সঙ্কোচ সহসা তিরোহিত হইয়া গেল। সে অকলে ফুলপত্রগুলি লইয়া মনোরমাদের গৃহে উপস্থিত হইল।

---

* সাহেব কলের গাড়ী নিয়ে হনুমানের মতন লাফিয়ে সাগর ডিঙিয়ে পার হ'ল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি ক্ষেত্রনাথের বাটীর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, সুরেন ও নরু তাঁহাকে দেখিয়া বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া গেল ও পিতাকে সংবাদ দিল। একজন সাহেব সাইকেলে চাপিয়া আসিয়াছেন, ইহা শুনিবামাত্র ক্ষেত্রনাথ মনে করিলেন, হয়ত ডেপুটী কমিশনার সাহেব মফঃস্বল পরিদর্শনে বাহির হইয়া বল্লভপুরে আসিয়াছেন। সেই জন্ত তিনি তাড়াতাড়ি একটা কোট গায়ে দিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। আসিয়াই দেখিলেন, বন্ধু সতীশচন্দ্র! ক্ষেত্রনাথের আহ্লাদ ও বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি হাসিয়া বলিলেন "কে, সতীশভায়া না কি? আরে, এস এস। কোন খবর নেই, চিঠিপত্র নেই, হঠাৎ যে!"

সতীশচন্দ্র সাইকেলটি দেওয়ালের গায়ে ঠেসাইয়া রাখিয়া বলিলেন "কেন, তুমি আমার চিঠি পাও নাই? আমি পরশু যে তোমাকে চিঠি লিখেছি!"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "ওঃ, পরশু লিখেছ? সেই চিঠি হয়ত আরও দুই দিন পরে পাব। এখান থেকে পোষ্ট আফিস্ দুই ক্রোশ দূরে। পিয়ন মশাই অবসরমত যখন এই দিকে আস্‌বেন, তখন চিঠিখানা দিয়ে যাবেন। আরে ভাই, সভ্য জগতের সঙ্গে কি আমার

আর কোনও সংযোগ আছে? আমি একদম্ বনবাসী হয়েছি। পথে আস্‌তে তো তোমার কোনও কষ্ট হয় নাই? আমাদের এই অঞ্চলের যে চমৎকার পথ!"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "তা আমার পাণ্টলুন আর সাইকেল্‌টার দশা দেখেই কতকটা বুঝ্‌তে পার্‌ছ। পথে যা কিছু কষ্ট হয়েছিল, তা তোমাদের এখানে এসেই দূর হ'য়ে গেছে।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "যাহি হোক্, এখন তুমি পোষাকটা ছেড়ে ফেল। আমি একখানা কাপড় আনিয়ে দিচ্ছি। (সুরেন্দ্র সেখানে দাঁড়াইয়া আগন্তুককে দেখিতেছিল; ক্ষেত্রনাথ তাহাকে ইঙ্গিত করিবামাত্র সে কাপড় আনিবার জন্য বাড়ীর মধ্যে গেল)। "তার পর? সঙ্গে তোমার কেউ নাই না কি?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "আছে; চাকর আর চাপরাসী। তারা একখানা গরুর গাড়ীতে আমার বিছানা ও ট্রঙ্ক নিয়ে আস্‌ছে। আস্‌তে বোধ হয় সন্ধ্যা হ'বে। যে রাস্তা! তোমার এখানেই পূজার ছুটীর কয়টা দিন কাটানো যাবে, এই মনে ক'রে একেবারে পাকা বন্দোবস্ত ক'রে আস্‌ছি। বুঝ্‌লে ভায়া?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "এ তো ভারি আনন্দের কথা। এখন তুমি পোষাক ছেড়ে ফেল। সুরেন, কাপড়-খানা দে।"

সুরেনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নরু দক্ষিণ হস্তে এক গাড়ু জল, বামস্কন্ধে একটী ধোয়া তোয়ালে, ও বামহস্তের অঙ্গুলির মধ্যে একটী প্রস্ফুটিত স্থলপদ্ম লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল, এবং গাড়ু ও তোয়ালে সতীশবাবুর সম্মুখে রাখিয়া বলিল "আপনি হাতমুখ ধোন।"

নরুর আতিথেয়তা ও সাহস দেখিয়া সতীশচন্দ্র অতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "ক্ষেত্তর, এই দুটী তোমার ছেলে না কি? বাঃ, চমৎকার তো! কি গো, তোমার নাম কি?"

নরু বলিল "আমার নাম? আমার নাম ছিরি নরেন্দ্র নাথ দত্ত।" তার পর হাসিয়া বলিল "সকলে আমাকে নরু বলে।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "সকলে তোমায় নরু বলে? তোমার বেশ নাম তো? 'ছিরি নরেন্দ্র নাথ দত্ত'র চেয়ে তোমার নরু নামটাই ভাল।'

নরু সেই কথা শুনিয়া আহ্লাদে দন্তবিকাশ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নরুর সাহস ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সে স্থলপদ্মটি তাহার দক্ষিণ হস্তে লইয়া বলিল "এই দেখুন, কেমন ফুল!"

সতীশ বলিলেন "বাঃ, চমৎকার ফুল তো? এটির নাম, স্থলপদ্ম?"

নরু বলিল "হাঁ, মাসীমা এটি আমায় দিয়েছে। মাসীমা অনেক ফুল এনেছে। আপনি একটা নেবেন ?"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, তোমার মাসীমার কাছে থেকে আমার জন্য একটা ফুল নিয়ে এস।"

নরু আহ্লাদসহকারে বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া গেল।

নরুর সরলতা ও স্ফূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। সতীশচন্দ্র পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন "তোমাদের এখানে স্থলপদ্মের খুব ছড়াছড়ি দেখ্‌ছি!"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "হাঁ, এই সময়টা স্থলপদ্মেরই সময়। কিন্তু এখানে চমৎকার বনফুলও আছে।"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "কই, বনফুল তো কোথাও নজরে পড়্‌ল না। কিন্তু স্থলপদ্ম দেখ্‌লাম। তোমাদের এখানের স্থলপদ্মের একটা অদ্ভুত গুণ! স্থলপদ্ম কথা কয়, পথ দেখিয়ে দেয়, পথিকের প্রাণ রক্ষা করে!"

ক্ষেত্রনাথ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন "তুমি যে হঠাৎ কবি হ'য়ে প'ড়্‌লে দেখ্‌ছি। ব্যাপার কি ?"

সতীশচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন "কবিত্ব নয়, ভায়া, সত্য কথা। ব্যাপার সব পরে বল্‌ব। আগে একটু ঠাণ্ডা হই।"

নরু অন্তঃপুর হইতে বিষণ্ণবদনে বহির্গত হইয়া সতীশ

বাবুকে বলিল "মাসীমা ফুল দিলে না। আমায় মুখ ক'রে বল্‌লে, ভারি দুষ্টু ছেলে।"

সতীশচন্দ্র নরুর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন "ভারি অন্যায়! তোমার মাসীমা কেন তোমায় দুষ্টু ছেলে বল্‌লেন? তোমার মাসীমাই ভারি দুষ্টু; কেমন নরু?"

সতীশবাবুর কথা শুনিয়া নরুর মুখে আর হাসি ধরিল না। সে সতীশবাবুর কথায় সায় দিয়া বলিল "থামুন তো, আমি মাসীমাকে ব'লে আস্‌ছি।" এই কথা বলিয়া সে অন্তঃপুরে ছুটিয়া গেল।

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ্‌ছি, নরুর মাসীমা এইবার আমার উপর চট্‌বেন। তোমার শ্যালীও বুঝি এখানে আছেন?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "না, আমার শ্যালী নয়। আমার স্ত্রীর পাতানো সম্বন্ধ। ইনি ব্রাহ্মণ-কন্যা,—এখানকার পুরোহিতের মেয়ে।"

সতীশচন্দ্র বিস্ময়ে বলিলেন "ওঃ, ইনিই বুঝি তবে সেই অনূঢ়া কুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যা। তোমাদের এই অঞ্চলের সচল স্থলপদ্ম?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "কি রকম? তুমি এঁকে জান্‌লে কিরূপে?"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "তা পরে ব'লব। এখন

বড় খিদে পেয়েছে। কিছু খাবার যোগাড় কর।”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “গৃহিণী নিশ্চিন্ত নেই। তোমার খাবার প্রস্তুত হ’ল ব’লে। সুরেনকে বাড়ীর ভিতরে পাঠিয়েছি। সে এখনি এসে খবর দেবে। আমিও দেখে আস্‌ছি।” এই বলিয়া ক্ষেত্রনাথ অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

যথাসময়ে আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হইলে, ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের অন্তঃপুরের অদ্ভুত প্রাচীর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং যথেষ্ট আমোদও অনুভব করিলেন। সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “ক্ষেত্তর, সত্যসত্যই অরণ্যবাস কর্‌বার ক্ষমতা তোমার আছে। এই অদ্ভুত প্রাচীর-গঠনই তার প্রমাণ।” ক্ষেত্রনাথ সেই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন “ভায়া, আগামী বৎসর পূজার ছুটীর সময় যখন এখানে আস্‌বে, তখন দস্তুরমত পাকা প্রাচীর দেখ্‌তে পাবে।”

অন্তঃপুরের বারাণ্ডায় সতীশচন্দ্রের জন্য আহার-সামগ্রী সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। গরম গরম লুচি, মোহনভোগ, বেগুনভাজা, ফুলকপির ডাল্‌না, বিলাতী কুম্‌ড়োর ছক্কা, একটী পাত্রে উপাদেয় ক্ষীর ও টাট্‌কা ছানার সন্দেশ—এই সমস্ত আহার্য্য দ্রব্য

দেখিয়া সতীশচন্দ্র বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিলেন "তুমি অসঙ্কোচে খাও; সব জিনিষই বাড়ীতে তৈয়ের হয়েছে। কেবল বেগুন ভাজা ও তরকারী তোমার জন্য সদু ঠাক্‌রুণ তৈয়ের করেছেন।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "তোমার গৃহিণী তরকারী প্রস্তুত ক'রে দিলেও আমার কোনও আপত্তি ছিল না।" তৎপরে ঈষৎ অনুচ্চকণ্ঠে ক্ষেত্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সদু ঠাকুরুণটি কে?"

ক্ষেত্রনাথও অনুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন "শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী; নরুর মাসীমাতা; আমাদের পুরোহিত ঠাকুরের কন্যা।"

সতীশচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন "ওঃ. তোমাদের গ্রামের সেই সচল স্থলপদ্মটি!"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তা আমি কেমন ক'রে বল্‌ব?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "আচ্ছা, আমি তোমায় ব'লে দিচ্ছি।" কিয়ৎক্ষণ পরে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন "ক্ষেত্তর, এই ফুলকপি তোমার বাগানের বুঝি? ওহে, তুমি অরণ্যে বাস ক'রেও সহরের লোকের চেয়ে সুখে আছ, দেখ্‌ছি। পুরুলিয়াতে এখনও ফুলকপি আমদানী হয় নাই। বাঃ, কপির ডাল্‌নাটি চমৎকার হয়েছে তো?"

ক্ষেত্রনাথ অতর্কিত ভাবে থাকায় সতীশচন্দ্রের চাতুর্য্য

বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সরলভাবে বলিলেন "তবে তোমায় আর একটু ডাল্‌না দিয়ে যাক্‌।"

সহসা রন্ধনশালায় ভূষণশিঞ্জন, পদশব্দ ও বস্ত্রের খস্‌খস্‌ শব্দ শ্রুত হইল। সৌদামিনী কপির ডাল্‌না লইয়া সতীশচন্দ্রের সম্মুখে বাহির হইতে সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল, তাহাও বুঝা গেল! পরিশেষে মনোরমার বাক্যেই হউক, আর যে কারণেই হউক, সৌদামিনী সাহসে বুক বাঁধিয়া একটী পাত্রে কপির ডাল্‌না লইয়া বাহির হইল। সেই সময়ে সতীশচন্দ্র ঘাড় তুলিয়া একবার তাহাকে দেখিয়া লইলেন।

সৌদামিনী তরকারী পরিবেষণ করিয়া চলিয়া গেলে, সতীশচন্দ্র গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "ভায়া, ইনিই তোমাদের গ্রামের সেই সচল স্থলপদ্ম।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশের চতুরতা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন "তুমি ভয়ানক দুষ্ট! এত চতুরতা শিখেছ?"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "নরুর মাসী-মা বলেই এতখানি সাহস কর্‌লাম। মাপ কর্‌বে।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র শস্যক্ষেত্র ও পাহাড় দেখিবার জন্য ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। উভয়ে দুইটী বন্দুক ও কিছু টোটা সঙ্গে লইলেন। সঙ্গে লখাই সর্দ্দারও চলিল।

কার্পাসক্ষেত্রে কার্পাসবৃক্ষের অবস্থা দেখিয়া সতীশচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি অড়হর, গম, যব, আলু প্রভৃতিরও আবাদ দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। লখাই সর্দ্দার পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে আসিয়া অবধি একদিনও পর্ব্বতে আরোহণ করেন নাই। পর্ব্বতারোহণ করা অতীব শ্রমসাধ্য হইলেও, গিরিজাত অরণ্যানীর শোভা দেখিয়া উভয়ে অতিশয় পুলকিত হইতে লাগিলেন। সতীশচন্দ্র উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন; এই কারণে, তিনি একটী নূতন বৃক্ষ দেখিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে পর্ব্বতারোহণ করিতে করিতে তাঁহারা একটী গুহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। গুহাটি এরূপ প্রশস্ত যে, তন্মধ্যে দুই শত লোক স্বচ্ছন্দভাবে বসিয়া থাকিতে পারে। একটী অখণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তর সেই গুহার ছাদস্বরূপ হইয়াছে। দাঁড়াইলে, ছাদ মস্তক স্পর্শ করে না। গুহার

দুইদিকে প্রবেশ ও নির্গমের জন্ম স্বাভাবিক দুইটী দ্বার আছে। গুহার তলদেশ অসম ও উন্নতানত। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তররাশি বিকীর্ণ রহিয়াছে। এই গুহার মধ্যে উপবেশন করিলে, পরিদৃশ্যমান জগৎ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয়, এবং এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে চিত্ত পরিপূর্ণ হয়। কোনও বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করিবার নিমিত্ত এরূপ স্থান আর নাই। কিন্তু গুহার অভ্যন্তর হইতে সহসা একটী বিজাতীয় দুর্গন্ধ উত্থিত হওয়ায়, ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র উভয়ে লখাই সর্দ্দারকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, লখাই বলিল যে বাদুড়ের বিষ্ঠা চারিদিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে; সম্ভবতঃ তাহা হইতেই দুর্গন্ধ উত্থিত হইতেছে। কিন্তু এই দুর্গন্ধটি ঠিক্ বাদুড়ের বিষ্ঠারও নহে। সম্ভবতঃ কোন হিংস্র জন্তু এই গুহার মধ্যে বা নিকটে অবস্থান করিতেছে। তাহারই গাত্র বা বিষ্ঠা হইতে এই বিজাতীয় দুর্গন্ধ উত্থিত হইতেছে। লখাই সর্দ্দারের কথা শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র সেইস্থানে অধিকক্ষণ থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না এবং তৎক্ষণাৎ গুহা ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা পার্ব্বত্যপথ অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে পর্ব্বতশৃঙ্গে উপনীত হইলেন।

পর্ব্বতশৃঙ্গে শেফালিকা পুষ্পবৃক্ষের বন। এই সময়ে শেফালিকা পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। বৃক্ষতলে

রাশি রাশি পুষ্প পড়িয়া ছিল এবং তাহাদের সুমধুর গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছিল। ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র সহসা এইস্থানে উপস্থিত হইয়া মনে করিলেন, তাঁহারা যেন কোনও দেবরাজ্যে উপনীত হইয়াছেন। পর্ব্বত-শৃঙ্গে একটী সুবৃহৎ অখণ্ড শৈল ছিল। সেই শৈলের পার্শ্বে একটী বৃহৎ বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা ও পত্রপল্লবে সুশোভিত হইয়া শৈলের উপর স্নিগ্ধ শীতল ছায়া প্রদান করিতেছিল। ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র পর্ব্বতারোহণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়াছিলেন; এইজন্য উভয়ে সেই পরিচ্ছন্ন শৈলমূলে উপবেশন করিয়া শ্রম অপনোদন করিতে লাগিলেন।

এই পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পশ্চিমদিকে বল্লভপুর গ্রামটি শস্যশ্যামল ক্ষেত্রসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া একটী মনোহর চিত্রপটের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। পূর্ব্বদিকে বহুদূর-ব্যাপিনী সশৈলকাননা উপত্যকাভূমি নিজ বিস্তৃত বক্ষের উপর স্তরে স্তরে সৌন্দর্য্যরাশি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন। সেই সুবৃহৎ উপত্যকার মধ্যে কোথাও গ্রাম বা লোকালয় নাই। তন্মধ্যে কোথাও অরণ্য, কোথাও কানন, কোথাও বিসর্পিণী তটিনী, কোথাও সকানন শৈল, কোথাও তৃণাচ্ছন্ন প্রশস্ত ক্ষেত্র, এবং কোথাও স্বভাবখাত কমলশোভিত প্রকাণ্ড সরোবর।

সরোবরের নির্ম্মল জলে রাজহংস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। তৃণাচ্ছন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে মৃগপাল বিচরণ করিতেছে এবং কোথাও বা শিখিদল বিহার করিতেছে। সেই মনোহারিণী উপত্যকাভূমি হইতে নানাবিধ সুকণ্ঠ পক্ষীর সুমধুর রব সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে অস্পষ্টভাবে উপনীত হইতেছে। ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র প্রকৃতিদেবীর এই চমৎকারিণী শোভা দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া রহিলেন, কাহারও মুখ হইতে একটীও বাক্য নিঃসৃত হইল না। অনেকক্ষণ পরে সতীশচন্দ্র বলিলেন "ক্ষেত্তর, স্বর্গের নন্দন-কাননের বৃত্তান্ত পাঠ ক'রেছ; কিন্তু তাও বুঝি সৌন্দর্য্যে এই উপত্যকার তুল্য হ'বে না। আমি ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করেছি; কিন্তু এমন সুন্দর স্থান কোথাও দেখেছি ব'লে মনে হ'চ্ছে না। সংসারের অসার কোলাহল ত্যাগ ক'রে, এই স্থানেই জীবনযাপন কর্‌তে ইচ্ছা হয়। কি আশ্চর্য্য, এত বড় উপত্যকা, আর এই উপত্যকা এমন উর্ব্বরা, কিন্তু এর মধ্যে কোথাও জনমানুষের বাস বা সঞ্চার নাই! ভারতবর্ষের কত স্থানে যে কত উর্ব্বরা ভূমি প'ড়ে আছে, তার ইয়ত্তা নাই। এই উপত্যকাটি আবাদ কর্‌তে পার্‌লে, লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হ'তে পারে। কিন্তু কৃষিকার্য্যের প্রতি কেহ মনোনিবেশ

কর্‌তে চায় না। সকলেই চাকরীর জন্য লালায়িত। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, চাকরী বাকরী ছেড়ে এই রকম স্থানে এসে বাস করি, আর কৃষিকার্য্য করি। এদেশের জমীদারগুলিকেও নিতান্ত নির্ব্বোধ ব'লে মনে হচ্ছে। বৈষয়িক উন্নতিসাধনের জন্য তাঁদের কোনও চেষ্টা নাই। আর তাঁদেরই বা দোষ কি? প্রকৃত শিক্ষার অভাবই তাঁদের অবনতির কারণ। এই যে উপত্যকার সৌন্দর্য্য দেখে তুমি আমি মুগ্ধ হচ্ছি, তাও আমাদের যৎসামান্য শিক্ষার গুণে। তুমি কি মনে কর, এদেশের আদিম অধিবাসীরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে তোমার আমার মতন মুগ্ধ হয়?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "সেরূপ মুগ্ধ হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব কথা। তবে প্রকৃতিদেবীর ক্রোড়ে লালিত পালিত হ'য়ে, তা'দের মনেও যে একটী সামান্য ভাবতরঙ্গ না উঠে, তা নয়। আমি সেদিন মুণ্ডারীদের একটী গান শুনে ভারি চমৎকৃত হয়েছিলাম। গানটি এই :—

এসা সাকাম্ জিলিপ্ জিলিপ্।
বড় সাকান্ জুলুপ্ জুলুপ্,
থারি লিকাম্ পাতরি হে,—
থারি লিকাম্ পাতরি।

এর অর্থ এইরূপ :—অশ্বত্থ গাছের পাতাগুলি চিক্ চিক্ কর্‌ছে; বটগাছের পাতাগুলি চক্ চক্ কর্‌ছে।

বটগাছের পাতাগুলি থালার মত চৌড়া। ইত্যাদি। সুতরাং অসভ্য লোকেও যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হয়, তা নয়। তবে কথা এই যে, তাদের মন মার্জ্জিত নয় ব'লে, তাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্যক্‌রূপে প্রতিভাত হয় না। যেমন সূর্য্যের আলোক। সূর্য্যের আলোক সকল বস্তুতেই অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হয়; কিন্তু স্বচ্ছ জল বা স্বচ্ছ কাচের উপর তা যেমন প্রতিফলিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। সুশিক্ষা না পেলে, চিত্ত মার্জ্জিত হয় না, সুতরাং শিক্ষাটা যে জীবনের সকল কার্য্যে ও বিভাগেই নিতান্ত আবশ্যক, তার আর কোনও সন্দেহ নাই।"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক্ কথাই বলেছ! আমিও ঐ কথাই বল্‌ছিলাম। এই কৃষিকার্য্যের জন্যও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। আমি বিশেষভাবে কৃষি-কার্য্যটি শিখেছি ব'লে, এই উপত্যকাটি দেখে এর অদ্ভুত লোকপালিকা শক্তির কথা বুঝ্‌তে পারছি। কিন্তু জমীদার মশাই তা না বুঝ্‌তে পেরে এটি ফেলে রেখে দিয়েছেন। আমি পাহাড়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে কত স্থানে যে কত প্রকার সুন্দর মৃত্তিকা দেখেছি, তা তোমাকে বলি নাই। সেই মৃত্তিকার মধ্যে সুন্দর ক্লেওলীন্ দেখলাম, লালরংয়ের আর হলদেরংয়ের এলামাটী (red and yellow ochre) দেখ্‌লাম। এই সব মাটী এক এক

স্থানে কোটী কোটী মণ পাওয়া যেতে পারে। এইগুলি কল্‌কাতায় রপ্তানী কর্‌লে বহু অর্থলাভ হ'বে। এই সামান্ত স্থানটুকু ভ্রমণ করেই আমি এদেশে প্রকৃতি দেবীর সঞ্চিত যে প্রভূত ধনরত্ন দেখ্‌তে পাচ্ছি, তা'তে বিস্মিত হ'য়ে পড়েছি। না জানি, এই সমস্ত প্রদেশে কতই ধনরত্ন সঞ্চিত আছে! ক্ষেত্তর, তুমি এদেশে বাস ক'রে খুব ভাল কাজই করেছ। তুমি এ অঞ্চলে যত ভূমিসম্পত্তি পাও, কিনে ফেল। আর একটী কাজ কর। তোমার তিনটি ছেলের মধ্যে একটীকে বৈজ্ঞানিক কৃষি ও ইঞ্জিনীয়ারীং শিক্ষা দাও। তোমার বড় ছেলে নগেন্দ্র তোমার দক্ষিণ হস্ত; তা'কে তুমি ছেড়ে দিতে পার্‌বে না। তোমার ছোট ছেলে নরু ভারি চমৎকার লোক হ'বে, কিন্তু সে নিতান্ত শিশু। তোমার মেজ ছেলে সুরেন্দ্রটির প্রকৃতি কিছু গম্ভীর। লেখাপড়া শিখ্‌তেও তার যথেষ্ট যত্ন আছে। তুমি ঐ ছেলেটিকে ভাল ক'রে লেখাপড়া শেখাও। এখানে স্কুলকলেজ কিছু নাই। তুমি তোমার সুরেন্দ্রকে আমার সঙ্গে পুরুলিয়ায় পাঠিয়ে দাও। আমি তা'কে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেব, আর নিজে তা'কে লেখা-পড়া শেখাব। যদি কিছুদিন বেঁচে থাকি, তা হ'লে, তোমার ঐ ছেলেকে আমি পাকা এগ্রিকাল্‌চারিষ্ট ও ইঞ্জিনীয়ার কর্‌ব। তুমি কিছু টাকা কড়ি জমিয়ে ফেল। সুরেন্দ্র বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী, ও ইঞ্জিনীয়ারীং সম্বন্ধে

উত্তম শিক্ষা পেলে, সে তোমাকে ক্রোড়পতি ক'রে ফেল্‌বে, তা আমি তোমায় নিশ্চয় বল্‌ছি। কিন্তু তুমি এই অঞ্চলে নিকটে নিকটে উর্ব্বর মৌজা পেলেই তা খরিদ ক'র্‌বে। আমি এই প্রদেশের যে রত্নৈশ্বর্য্য দেখ্‌তে পাচ্ছি, তা তুমি পাচ্ছ না। যদি পার, এই উপত্যকাটি সর্ব্বাগ্রে জমীদারের কাছে পাকা বন্দোবস্ত ক'রে নিয়ে হাত কর। আর এর নাম 'নন্দন-কানন' রেখো। নন্দন-কাননই বটে! কি চমৎকার! কি চমৎকার!"

ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে আসিয়া অবধি কখনও এই পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেন নাই বা এই উপত্যকাটি দেখেন নাই। সুতরাং ইহা কোন্ জমীদারের সম্পত্তি, তাহা তিনি জানিতেন না। শৈলের অদূরে এক বৃক্ষতলে লখাই সর্দ্দার বসিয়া বিড়ি খাইতেছিল। ক্ষেত্রনাথ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "লখাই, এই মৌজাটি কার?"

লখাই সর্দ্দার প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথা বলিল। তার মর্ম্ম এইরূপঃ—পূর্ব্বে ইহা গৌরসিংহ জমীদারের সম্পত্তি ছিল। কিন্তু সাঁওতালী হাঙ্গামার সময় উক্ত জমীদার সাঁওতালগণের সঙ্গে যোগ দিয়া পুরুলিয়া লুণ্ঠন করিতে যাওয়ায়, সরকার বাহাদুর তাঁহাকে ধরিয়া ফাঁসী দেন ও তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া খাস্ করিয়া লয়েন। সেই অবধি ইহা সরকার বাহাদুরের

খাস্ সম্পত্তি। এখানে কাহারও গাছ কাটিবার বা এক কোদালি মাটী উঠাইবার হুকুম নাই। এখানে কেহ কোনও জন্তুকে শীকার করিতে পায় না। সরকার বাহাদুরের তহশীলদার কখনও কখনও এই মৌজায় জঙ্গল বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করেন মাত্র।

ক্ষেত্রনাথ লখাইকে মৌজার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, লখাই বলিল "ইটোর নাম নন্দনপুর বটে।"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন এবং ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ক্ষেত্তর, তোমার কথা নিতান্ত মিথ্যা নয়। এই জঙ্গলদেশেও কবি আছে। এই মৌজার নাম আর 'নন্দনকানন' রাখ্‌তে হ'বে না। 'নন্দনপুর' নাম-টিই বেশ। তোমার কোনও চিন্তা নাই। যখন এটি গভর্ণমেণ্টের খাস্ মহাল, তখন আমি এটি তোমার হাতে এনে দিচ্ছি। তুমি কার্পাসের চাষটায় বেশ সফলতা দেখাও। একবার ডেপুটী কমিশনার সাহেবকে খুশী কর্‌তে পার্‌লেই হ'ল।"

সেই সময়ে পর্ব্বতশৃঙ্গের অপর পার্শ্বে এক পাল হরিণকে বিচরণ করিতে দেখিয়া, লখাই সর্দ্দার বন্দুক লইয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ তাহাকে বলিলেন "লখাই, ওদিকে আর কেন যাচ্ছ?"

লখাই হাত নাড়িয়া বলিল, "তুই অত নাই চেঁচাস্,

গলা। হরিণগুলান্ মানুষের সাড়া পাল্যে পালাব্যেক্।'
এই বলিয়া লখাই সর্দ্দার মুহূর্ত্তমধ্যে দৃষ্টিপথের অতীত হইল।

---

* প্রভু, আপনি অত উচ্চস্বরে কথা বলিবেন না। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলে হরিণগুলি পলাইবে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

লখাই সর্দ্দারের কথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র হাসিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "লখাইয়ের কথাবার্ত্তা ঐরূপ বটে; কিন্তু তার হৃদয়টি ভাল। আমি তার মত বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত লোক অতি অল্পই দেখেছি। হরিণের পাল যেদিন থেকে আমার ধান নষ্ট করেছে, সেই দিন থেকে তাদের উপর তার ভয়ানক রাগ। সে বন্দুক নিয়ে মাঝে মাঝে হরিণ শীকার কর্‌তে যায়; কিন্তু একদিনও হরিণ মার্‌তে পারে নাই। আজও, দেখ না, হরিণ দেখেই বন্দুক নিয়ে ছুটে গেল।" এই বলিয়া ক্ষেত্রনাথ হাসিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে তাঁহাদের মস্তকের উপরিভাগে বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া একটী পক্ষী তাহার সুমধুর কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল "বউ, কথা কও!" সতীশচন্দ্র ও ক্ষেত্রনাথ উভয়েই পক্ষীর সেই সুমধুর স্বর শুনিয়া চমকিত ও আনন্দিত হইলেন। সতীশচন্দ্র বলিলেন "ক্ষেত্তর, তোমার এখানে চিরবসন্ত বিদ্যমান দেখ্‌ছি। আজ ভোরের সময় কোকিলের কুহুরব শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুম থেকে উঠেছি। ঐ উপত্যকাভূমি হ'তে মাঝে মাঝে পাপিয়ারও ডাক শুন্‌তে পেয়েছি। আবার

মাথার উপর এই বউ-কথা-কও পাখী মধুর অথচ করুণ স্বরে প্রণয়িনীর মান ভাঙ্গাচ্ছে। ব্যাপার কি হে? এ দেশ যে সত্যসত্যই নন্দন-কানন!"

পাখী আবার ডাকিল "বউ, কথা কও।" সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "ওহে পক্ষিবর, আমায় কেন আর ওকথা শোনাও? ক্ষেত্তর ভায়াও, বোধ করি, মানভঞ্জনেব পালা এতদিন শেষ করেছেন। আর আমায় তো ইহজীবনে সে পালার অভিনয় কখনও করতেই হ'ল না। সুতরাং তুমি এখান থেকে সরে পড়।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "আমি মানভঞ্জনের পালা প্রায় এক রকম শেষ করেছি বটে; কিন্তু তোমায় যে সে পালার অভিনয় করতে হবে না, তা কে বললে?··· আচ্ছা সতীশ, তুমি বিয়ে ক'রলে না কেন? বিয়ে ক'বে ঘর-সংসার কাঁদতে কি ইচ্ছা হয় না?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। বিয়ে আমি করি নি কেন, তা অনেক সময় আমি নিজেও ভালরূপে বুঝতে পারি না। বিয়ে করবার ইচ্ছা যে কখনও হয় নি, তাও নয়। তবে সে ক্ষণিক ইচ্ছা। এ আমি এক রকম বেশই আছি। দেখ, কারুর জন্য কোনও ভাবনা চিন্তা নাই। যা পাই, তা নিজের জন্য ও ইচ্ছামত খরচ করি। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন বিয়ে করবার জন্য তিনি আমাকে

মাঝে মাঝে জেদ্ কর্‌তেন বটে; কিন্তু এখন জেদ্ কর্‌বার আর কেউ নাই, আর আমিও বেঁচেছি।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তা বুঝ্‌লাম; কিন্তু তোমার ভাইভগ্নী তো আর কেউ নাই। সংসারে তুমি একাকী। এদিকে তুমি মোটা বেতনও পাও। আর তোমার কিছু অভাবও নাই। এরূপ স্থলে, বিয়ে কর্‌লে কি কোনও দোষ হ'ত?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "তবে তোমায় বলি, শোন। আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে; তার উপর কুলীন ব্রাহ্মণ। লেখাপড়াও কিছু শিখেছি। বিয়ে কর্‌ব মনে কর্‌লে আমি কত বিয়ে কর্‌তে পার্‌তাম। কিন্তু বিয়ে কর্‌তে আমার আদৌ মন উঠে না তো আমি কি কর্‌ব, বল? যখন কলেজে পড়ি, তখন একটী ক'নে দেখ্‌তে গিয়েই বিয়ের উপর আমার বিতৃষ্ণা হয়। সেই অবধি বিবাহে আর রুচি নাই।"

ক্ষেত্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন "কি রকম?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বল্‌ছি; শোন। তখন আমরা চাঁপাতলার মেশে থাকি। এক ঘট্‌কী সর্ব্বদা আমাদের মেশে যাওয়া আসা কর্‌ত। আমি কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান, এইটি অবগত হ'য়ে সে আমাদের মেশে এক কুলীন কন্যার সন্ধান এনে রোজই আমার কাছে আর বন্ধুবান্ধবদের কাছে সেই মেয়ের

রূপগুণের বর্ণনা করত। মেয়ের বাপ বীডন্ স্ট্রীটে থাকৃতেন, আর ছোট লাটের দপ্তরে কি একটী বড় কাজ করতেন। তিনি একদিন আমার অজ্ঞাতসারে আমাদের মেশে এসে আমাকে দেখে যান, আর বোধ করি আমাকে পছন্দও করেন। কেননা, ঘটকী তার পর আমাদের মেশে ঘন ঘন যাওয়া আসা করতে লাগ্‌ল, আর নগদ টাকা ও গহনা ইত্যাদির লোভ দেখাতে লাগ্‌ল। বন্ধুবান্ধবেরা একদিন আমাকে বললে 'চল, মেয়ে দেখে আসি।' আমিও কতকটা তাদের অনুরোধে প'ড়ে, আর কতকটা কৌতূহলপরবশ হ'য়ে তাদের সঙ্গে একদিন রবিবারে মেয়ে দেখ্‌তে গেলাম। মেয়ের বাপ আগে থেকেই আমাদের যাওয়ার কথা জানতেন। আমরা তাঁর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় ব'স্‌লাম। মেয়েটি প্রায় পনর বছরের; দেখ্‌তেও নেহাৎ মন্দ নয়। তার বাপ তাকে হালফ্যাশানে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বৈঠক-খানায় নিয়ে এলেন। মেয়েটির কথাবার্ত্তায় কেমন একটী নিকৃষ্ট ধরণের ফিরিঙ্গীয়ানা ভাব লক্ষিত হ'ল। সে ভাবটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজ বালিকারও ভাব নয়, আর আমাদের দেশের উন্নতিশীল বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মার্জ্জিত-রুচি বালিকাদেরও ভাব নয়। সেই কারণে, প্রথমেই তোমাকে ব'লে রাখি যে, মেয়েটিকে দেখে আমার মনে কোনও অনুরাগ বা উন্মাদের উদয় হয় নাই। আমি

যেন একজন নিরপেক্ষ বা তৃতীয় পক্ষের মত তার কথা-বার্ত্তা শুনতে লাগ্‌লাম। আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল, এই মেয়েটি যেন আমাদের সংসারে ও আমার জীবনে বেশ মানানসই হ'বে না—যেন খাপ-ছাড়া হ'বে। মেয়েটি তখন কোন্ একটা ইংরাজী বালিকা স্কুলের থার্ড ক্লাশে পড়ছিল। আমার বন্ধুরা তার নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে, সে 'জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী', না কি একটা নাম বল্‌লে। কিন্তু তার কথাবার্ত্তায় কোনও সঙ্কোচ বা লজ্জার ভাব দেখা গেল না। একজন ঐ বয়সের ছেলেকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, সে যেমন কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হ'য়ে উত্তর দেয়, মেয়েটিও সেই ভাবে উত্তর দিতে লাগ্‌ল। মেয়ের বাপ মেয়ের গুণের পরিচয় দিতে লাগ্‌লেন। বন্ধুরা তা'কে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইতিহাস থেকে ইংরাজীতে অনেক প্রশ্ন কর্‌লেন। মেয়েও বেশ উত্তর দিয়ে যেতে লাগ্‌ল। তারপর ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজীতে কথোপকথন, সংস্কৃত আবৃত্তি, রবি বাবুর কবিতার আবৃত্তি, ইত্যাদি বিষয়েও মেয়ের পরীক্ষা হ'ল। মেয়েও সকল পরীক্ষায় বেশ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। আমি কিন্তু এই সব দেখে শুনে কিছুমাত্র আনন্দ বা উল্লাস অনুভব কর্‌লাম না। কেমন এক রকম আড়ষ্ট ও নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে রইলাম। এই-সকল পরীক্ষার পর সঙ্গীত-বিদ্যায় মেয়ের পরীক্ষা হ'ল। মেয়ে গান গাইলে;

পিয়ানো বাজালে ; বেহালায় সুর দিলে। আমার সে সব ভাল লাগ্‌ল না। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর গৃহে জন্মেছিলাম ব'লেই হোক্, কিম্বা আমার কুসংস্কার বশতঃই হোক্, মেয়ের শিক্ষা দীক্ষা ও গুণপণা আমার ভাল লাগ্‌ল না। আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল, আমি তাদের বাড়ী থেকে শীঘ্র বেরিয়ে যেতে পার্‌লেই যেন বাঁচি। বাস্তবিক, যখন মেয়ে দেখা শেষ হ'ল, আর আমরা হেদোর ধারে বেড়াতে লাগ্‌লাম, তখন আমি যেন হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম! মেয়ের সেই বিজাতীয়,—ও তোমায় বল্‌তে কি—সেই কেমন-এক-রকম অদ্ভুত ভাব দেখে আমার মন বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি মনে কর্‌লাম, স্ত্রীর নমুনা যদি এই রকম হয়, তা হ'লে আমি জীবনে কখনও বিয়ে কর্‌ব না। সেই কারণে, আমি আর কখন কোথাও মেয়ে দেখি নাই, আর বিবাহ কর্‌তেও সম্মত হই নাই।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আমি তোমার মনের ভাব বুঝ্‌লাম। হিন্দু পরিবারের একটী হিন্দুয়ানী ভাব আছে, তাহাই হিন্দুর বিশিষ্টতা বা জাতীয়ত্ব। সেই জাতীয়ত্বের সঙ্গে যা মিশ্ খায় না, সেইটি আমাদের ভাল লাগে না, বা তা কখনও আমাদের নিজস্ব হ'তে পারে না। যেমন হিন্দুর গৃহপ্রাঙ্গণে ক্রোটন্ অপেক্ষা তুলসী গাছের অধিকতর

শোভা, আর বিলাতী পুষ্পবৃক্ষ অপেক্ষা একটা যুঁইঝাড়ের অধিকতর সার্থকতা! এ সব কথা সত্য বটে; কিন্তু তোমার গৃহপ্রাঙ্গণে তুমি যদি ক্রোটন্ রোপণ করতে না চাও, তা হ'লে একটা তুলসী গাছ তো অনায়াসে রোপণ করতে পার? তুলসী গাছের তো অভাব নাই; সন্ধান করলেই পাবে।"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "সন্ধান করলে তুলসী গাছ যে পাওয়া যেত না, বা এখনও পাওয়া যায় না, তা নয়। তবে আমি সবিশেষ কোনও চেষ্টা করি নাই, আর চেষ্টা করবার তেমন কোনও প্রয়োজন দেখি না।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আচ্ছা, তুমি বল্লভপুরে যে 'সচল স্থলপদ্ম'টি দেখেছ, সেটিকে তোমার গৃহপ্রাঙ্গণে রোপণ করলে কি রকম হয়? তুমি যেমনটি চাও, ইনি ঠিক্ তেমনিটি। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মেয়ে; কুলীনকন্যা; প্রকৃতি দেবীর ক্রোড়ে লালিতা পালিতা; স্বভাবচরিত্রে কোনও কৃত্রিমতা নাই; ঠিক্ সচল স্থলপদ্মই বটে। ইংরাজী না জানলেও, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে; প্রায়ই আমাদের বাড়ী এসে গৃহিণীকে বাল্মীকির মূল রামায়ণ পাঠ ক'রে শোনায়। আর শুনেছি, প্রত্যহ শিবপূজো না ক'রে জলগ্রহণও করে না। আজ ছয় মাস আমরা তাকে দেখ্‌ছি; এমন মধুরস্বভাবা, মধুর-ভাষিণী আর সলজ্জা মেয়ে আমি আর দুটি দেখি নাই।

শুভ্র পুষ্পের ন্যায় ইনি নির্ম্মল ও পবিত্র। আমি তোমাদের মেলটেলের কথা জানি না। কিন্তু তুমি ও ভট্টাচার্য্য মশাই যখন এক গোত্রের নও, তখন আদান-প্রদানে কোনও আপত্তি হ'বে না ব'লেই আমার বিশ্বাস।"

ক্ষেত্রনাথের কথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "তুমি যে চমৎকার ঘট্‌কালী কর্‌তে পার, দেখ্‌ছি! আচ্ছা, এখন ওসব কথা থাক্‌। তোমাদের 'সচল স্থলপদ্ম' সম্বন্ধে, আর তাঁদের বংশ-সম্বন্ধে আরও পরিচয় জানা আবশ্যক। আমাদেরও পরিচয় ভট্টাচার্য্য মশাইকে জান্‌তে হ'বে। আমাদের হিন্দুসমাজটি অষ্টবন্ধনে বাঁধা; এ সমাজের মধ্যে অবাধ প্রেমের স্থান নাই। সংযমের উপরেই হিন্দুসমাজের স্থিতি, গতি ও উন্নতি। সংযমের অভাব হ'লেই হিন্দুর হিন্দুত্ব থাক্‌বে না।"

পাখী আবার ডাকিয়া উঠিল, "বউ, কথা কও।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "ক্ষেত্তর, তোমার এই পাখীটা বড় জালাতন কর্‌লে, দেখ্‌ছি। চল, এখান থেকে স'রে পড়া যাক্‌।"

সেই সময়ে লখাই সর্দ্দার মৃগয়ায় ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

আবার একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল, "চোখ্‌ গেল, চোখ্‌ গেল।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "এ যে আবার পাপিয়াও এসে পড়্‌ল, দেখ্‌তে পাচ্ছি। সত্যসত্যই এরা আমাদের এখান থেকে তাড়ালে। অসময়ে বসন্তের আবির্ভাব! লক্ষণ বড় ভাল নয়।"

লখাই সর্দ্দার বলিল, "ইটোর নাম পাপিয়া নাই বটে! ইটো দেওরা।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "দেওরা? দেওরা নাম কেমন ক'রে হ'ল?"

লখাই বলিল "পাখ্‌টো কি রাকাড়্‌ছে, তুই নাই শুন্‌তে পাচ্ছুস্‌? ঐ যে পাখ্‌টো ব'ল্‌ছে 'শ্বশুর হে—শ্বশুর হে—দেওর কে হয়? দেওর কে হয়?'"

সতীশ ও ক্ষেত্রনাথ উভয়েই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "এইজন্যই বুঝি পাখীর নাম দেওরা হয়েছে? আচ্ছা, লখাই, আর একটা পাখী ঐ যে ডাক্‌ছে, ওর নাম কি?"

লখাই বলিল, "উটোর নাম আকু-পাকু হে। ঐ পাখ্‌টো জোড় হার'য়ে আকু-পাকু কর্‌ছে কি ন?"

আবার উভয়ে হাসিয়া উঠিলেন। সতীশচন্দ্র বলিলেন, "ক্ষেত্তর, কে বলে এদেশে কবি নাই? এই পাখীটির আকু-পাকু নামই ঠিক্। আর আমার যখন কোনও ভাই নাই, আর তুমিও ভাসুর হ'বার দাবী রাখ, তখন দেওর কে হ'বে, তার মীমাংসার ভার তোমার উপরেই রইল।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইয়া স্নানাহার ও কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর বৈঠকখানায় বসিয়া নানাবিষয়ে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন, এবং সতীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ইনিই আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়,—যাঁর কথা তোমাকে বলছিলাম।"

সতীশচন্দ্র তাঁহার পরিচয় পাইয়া উঠিয়া নমস্কার করিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ইনি আমার বন্ধু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; এক্ষণে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে পুরুলিয়া জেলার কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় সতীশবাবুর পরিচয় শুনিয়া আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবাজীবনের নিবাস কোথায়?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "বালী,—উত্তরপাড়া।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন "বালী উত্তরপাড়া! ওঃ, উত্তরপাড়ায় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় যে আমার ভগ্নীপতি ছিলেন।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "বটে? কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়

আমাদের দূর জ্ঞাতি। তাঁকে আমরা ছেলেবেলায় দেখে-ছিলাম। তাঁর তো অনেক দিন স্বর্গলাভ হয়েছে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "হাঁ, প্রায় পঁচিশবৎসর হ'ল, তাঁর স্বর্গলাভ হয়েছে! আমার বিধবা ভগ্নীটি এখনও জীবিত আছেন। তাঁর কোনও সন্তানাদি নাই। আপনার পিতার নাম?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "৺ কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন "হাঁ, তাঁর নাম শুনেছি, বটে; কিন্তু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ছিল না। আমি পেটের জ্বালায় এই দূরদেশে প'ড়ে আছি, বাবা। ভগ্নীটি বিধবা হওয়ার পর থেকে আর আপনাদের দেশে যাওয়া আসা নাই। এই কুস্থানেই প'ড়ে আছি। যা হো'ক্, আজ বাবাজীবনকে এখানে দেখে আমি বড় আনন্দিত হলাম। বাবাজীবন কোথায় বিবাহ করেছেন?"

সতীশচন্দ্র একটু মুস্কিলে পড়িলেন। কিছুক্ষণ ইত-স্ততঃ করিয়া বলিলেন "আমি বিবাহ করি নাই।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন "বিবাহ করেন নাই? সে কি কথা? আপনি কুলীন-সন্তান— আপনার আবার বিবাহের অন্তরায়? বিবাহ না কর্‌বার কারণ কি?"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "কারণ বিশেষ কিছুই

নাই। বাল্যকালে পিতৃহীন হই; তার পর কলেজে লেখা পড়া শিখ্‌ছিলাম; তারপর জননীদেবীরও অভাব হ'ল। এই সব কারণে বিবাহ করি নাই।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন "সে কি কথা? সংসারে থাক্‌তে গেলে, গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনার অন্য সহোদর-সহোদরা কয়টি?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "একটীও নাই; আমিই পিতা মাতার একমাত্র সন্তান।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন "বটে? তবে তো আপনার বিবাহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই তো আপনার অল্প বয়স। আপনি বিবাহ না কর্‌লে আপনার বংশলোপ হবে যে! আপনার মত যোগ্যপাত্রে কন্যাদান কর্‌তে কত শত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি প্রস্তুত আছেন। আহা, কত স্থানে কত কুলীন কন্যা অনূঢ়া রয়েছে! আপনি অবশ্যই বিবাহ কর্‌বেন। অন্যমত কর্‌বেন না।"

সতীশচন্দ্র তাঁহার কথা শুনিয়া নিস্তব্ধ রহিলেন। সেই সময়ে কেহ সতীশচন্দ্রের অন্তর-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে দেখিতে পাইত, তাঁহার সযত্ন-রক্ষিত বহুকালের প্রেমের বাঁধটি সহসা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং বন্যার জলে সমস্তই হাবুডুবু খাইতেছে।

সতীশচন্দ্রকে নিস্তব্ধ দেখিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয় ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, মশিন

আমাদের বাড়ী গিয়ে আমায় বল্‌লে যে, আপনার বাড়ীতে আপনার একটী বন্ধু ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ এসেছেন। তাই না শুনে, আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়ে আস্‌ছি। এসে দেখি, বাবাজীবন আমাদেরই নিকট কুটুম্ব! আহা, আমার কি পরম সৌভাগ্য! আজ আমার কি সুপ্রভাত!” তার পর সতীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন “বাবাজীবন আমি তোমার সমুচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা কর্‌তে পারি, সে ক্ষমতা আমার নাই। আমি অতিশয় দরিদ্র। তবে পরিচয়ে জান্‌লাম, তুমি আমাদেরই ঘরের ছেলে। তোমাকে শাকান্ন খাওয়াতে আমার কোনও সঙ্কোচ নাই। এখানে যে কয়দিন থাক, আমার বাড়ীতেই শাকান্ন ভোজন কর্‌তে হবে।”

সতীশচন্দ্র বলিলেন “আপনি কি বল্‌ছেন? আপনার বাড়ীর শাকান্ন আমার পক্ষে রাজভোগের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তবে এখানে আমার কোনও অসুবিধা নাই। সঙ্গে পাচক-ব্রাহ্মণ আছে। ক্ষেত্রবাবু আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী। ক্ষেত্রবাবুর যত্নের কোনও ত্রুটি নাই। তবে একদিন আপনার বাড়ীতে আমি যাব ও খেয়ে আস্‌ব। আপনি তজ্জন্য ব্যস্ত হবেন না। যদি পারি, আগামী কল্য আপনার বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজন কর্‌ব।”

ভট্টাচার্য্যমহাশয় আহ্লাদে গদ্‌গদ-কণ্ঠ হইয়া বলিলেন “বাবাজীবন, এ তোমার যথেষ্ট ঔদার্য্যের পরি-

হয়। তোমাকে আমার বাড়ীর আতিথ্যগ্রহণ করাতে পারি, এ দুরাশা আমি করি না। তোমার সহৃদয়তা দেখে আমি বড় আনন্দিত হলাম। আগামী কল্য মধ্যাহ্নে বাবাজীবন আমি অবশ্য আমার বাড়ী আস্‌বে। আর, ক্ষেত্রবাবু, আপনিও আপনার ছেলেদের সহিত আমাদের বাড়ী এসে মধ্যাহ্নভোজন কর্‌বেন। আপনি এতদিন এখানে এসেছেন, একদিনও আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতে পারি নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আপনার বাড়ী প্রসাদ পাব, সে তো সৌভাগ্যের কথা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন— কাল মধ্যাহ্নে আমি সতীশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আপনার বাড়ী যাব।"

সেই সময়ে ভট্টাচার্য্যমহাশয়কে সুরেন্দ্র বলিল "ভট্টা-চার্য্যি মশাই, মা একবার আপনাকে বাড়ীতে ডাকৃছেন।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় অন্তঃপুরে গমন করিলে, ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "সতীশ, এখন কি বল্‌ছ ভায়া? আমি ঘট্‌কালী কর্‌তে জানি কি না, তা দেখলে? আমি গোড়া থেকেই বুঝেছি, 'সচল কুলপঞ্জী' এবার আমা-দের গ্রাম থেকে উৎপাটিত হবে।"

সতীশচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন "আরে, চুপ্ কর, চুপ্ কর। তোমার যে একটুও সবুর নাই।

তোমার কাছে আমার এখন বসা হচ্ছে না। আমি ঐ মাঠের দিকে একটু বেড়িয়ে আসি।"

এই বলিয়া সতীশচন্দ্র আপনার বিশৃঙ্খল মনোরাজ্যের শৃঙ্খলা-সাধনের জন্ত এবং আপনার মনের সহিত ভাল-রূপে বুঝাপড়া করিবার জন্ত একাকী নিভৃত-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সতীশচন্দ্র মাঠ পার হইয়া নন্দাজোড়ের ধারে ধারে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, তাঁহার মনোমধ্যে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা, আর তাঁহার মনেরও কোনও সন্ধান নাই; হয়ত, প্রেমবন্যার সম্মুখে পড়িয়া সে তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! যখন মনের কোনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, তখন বুঝাপড়া আর কাহার সঙ্গে হইবে? সতীশচন্দ্র তখন সে আশা ত্যাগ করিয়া প্রেমবন্যার রঙ্গভঙ্গী দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, বর্ষাসমাগমে উভয়কূলপ্লাবী গঙ্গাপ্রবাহের মত প্রেমবন্যা তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বস্থল প্লাবিত করিয়াছে। চারিদিকে কেবল কলকল, ছলছল শব্দ! কোথাও জল উছলিয়া পড়িতেছে; কোথাও ঘূর্ণাবর্ত্তসমূহে জলরাশি প্রচণ্ড শব্দে আলোড়িত হইতেছে; কোথাও উল্লাসময় তরঙ্গের পশ্চাতে উল্লাসময় তরঙ্গ ছুটিতেছে; আর কোথাও তরঙ্গাভিঘাতে কূল খসিয়া পড়িতেছে! বন্যার যেমন বেগ, তেমনই উল্লাস; যেমন কল্লোল, তেমনই প্রচণ্ডতা। জলরাশি হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, কলকল শব্দে যেন চারিদিকেই ছুটিতেছে।

হৃদয়ের এইরূপ অবস্থায় মনের উপর আধিপত্য থাকে না, এবং কোনও বিষয়ে গম্ভীরভাবে চিন্তাও করা যায় না।

সতীশচন্দ্র উদ্দেশ্যহীন পাদক্ষেপে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি কোথায় যাইতেছেন, কি করিতেছেন, বা কি দেখিতেছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কখনও একটী বৃক্ষতলে বসিলেন; কখনও দ্রুতপদে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কখনও মন্থরগমনে চলিতে লাগিলেন; কখনও স্থিরভাবে কোথাও দাঁড়াইয়া রহিলেন; আর কখনও বা শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যার প্রগাঢ় ছায়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইলে, সতীশের যেন চৈতন্য হইল। তিনি ধীর পদক্ষেপে কাছারীবাটীতে উপনীত হইলেন। সেখানে উপনীত হইয়া অবগত হইলেন, ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়াছেন। তিনি সেখানে কি উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

আবেগের পর অবসাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। সতীশচন্দ্র অবসন্নমনে ও ক্লান্তদেহে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, ক্ষেত্রনাথ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি সতীশচন্দ্রকে বলিলেন "সতীশ, আমি ভট্টাচার্য্যমশাইয়ের বাড়ী গিয়েছিলাম; তোমার পরিচয় অবগত হ'য়ে অবধি, তাঁর মনে একটী দুরাশার উদয় হয়েছে। অনূঢ়া কন্যাদের পিতা মাত্রেরই মনে এইরূপ দুরাশার উদয় হয়, তা'তে বিস্ময়ের কোনও

কারণ নাই। ভট্টাচার্য্যমশাইয়ের ইচ্ছা, তিনি তোমার হাতে সৌদামিনীকে অর্পণ করেন, এবিষয়ে তোমার মত কি ?"

কোথা হইতে সতীশচন্দ্রের মনটি সহসা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বুকে এক ধাক্কা দিয়া তাঁহাকে চুপি চুপি বলিতে লাগিল "সতীশবাবু, চমৎকার প্রস্তাব! সুন্দরী সৌদামিনী—মধুরহাসিনী, মধুরভাষিণী, লক্ষ রমণীর শিরোমণি সৌদামিনী—তোমার হ'বে। আর কি চাও? সৌদামিনী তোমার হৃদয়ের অভাব পূর্ণ করবে; তার নিশ্বাসে সৌরভ ছুটবে; তার বাক্যে অমৃত বর্ষণ হবে; তার মধুর হাস্যে তোমার গৃহ ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌বে; তার সৌন্দর্য্যে তোমার গৃহ আলোকিত হবে। এই প্রস্তাবে এখনই সম্মত হও। এমন মাহেন্দ্রযোগ ত্যাগ ক'রো না।" সতীশচন্দ্র মনকে বলিলেন "আমি ইহজীবনে বিয়ে করব না বলেছিলাম, তার কি ?" মন বলিল "ওরূপ কথা কেন বলেছিলে, তা তুমিই জান। আমার তো কিছু জান্‌তে বাকী নাই! বিয়ে করবার ইচ্ছাটি তো বরাবরই ছিল; কেবল ভাল মেয়ে পাও নাই ব'লেই বিয়ে কর নাই। এখন তো পেয়েছ ? তবে আর ইতস্ততঃ করা কেন ? ঝাঁ ক'রে মত দিয়ে ফেল।"

সতীশচন্দ্রকে নিস্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "কি সতীশ, আমার কথা শুনে তুমি যে চুপ্ ক'রে রইলে ?"

ক্ষেত্রনাথের প্রশ্নে সতীশের যেন চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন "চুপ্ না ক'রে থেকে আর কি কর্‌ছি, বল? আমি বিষম সমস্যায় পড়েছি। কিছু স্থির কর্‌তে পার্‌ছি না।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "সমস্যা আর কি? ভাল মেয়ে পাও নাই ব'লে তুমি এতদিন বিয়ে কর নাই। এখন সৌদামিনীকে তুমি যদি পছন্দ করে থাক, তাহ'লে বিয়ে কর্‌তে বাধা কি? আর তাকে পছন্দ না কর্‌বারই বা কারণ কি? রূপে গুণে, স্বভাব চরিত্রে, শিক্ষা দীক্ষায়, কুলে মানে তুমি যেমন মেয়েটি চাও, সৌদামিনী ঠিক্ তেমনিটি।...... ভট্টাচার্য্য মশাই বল্‌ছিলেন, তোমার যখন মেয়ে পছন্দ হয়েছে—(আমি সে কথাটা তাঁকে প্রকারান্তরে বলেছি), তখন অন্য কোনও আপত্তি না থাক্‌লে, এই যাত্রায় তুমি মেয়েকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও। কাল বেশ ভাল দিন আছে। আর কাল যখন তোমার মধ্যাহ্নভোজনেরও নিমন্ত্রণ হয়েছে, তখন তুমি আশীর্ব্বাদের ব্যাপারটি সেরে গেলেই ভাল হয়।"

সতীশচন্দ্রের মন তাঁহার বুকে আর এক ধাক্কা মারিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল "বাঃ বেশ কথা। শুভস্য শীঘ্রম্। সতীশ বাবু তুমি এ প্রস্তাবে অমত ক'রো না; এমন স্ত্রী পাবে না। এমন অযাচিত দান ত্যাগ ক'রো না। যখন মেয়ে পছন্দ হয়েছে, তখন আর দেরী করা কেন? আশীর্ব্বাদ,—বিবাহ সব শীঘ্র সেরে ফেল!" সতীশ

মনকে ধমক দিয়া বলিলেন "তুমি তো বড় উতলা হ'য়ে পড়েছ, দেখ্‌তে পাচ্ছি। তোমার যে একটুও সবুর নাই! তোমার যেমন সঙ্কল্প, তেমনই কি কাজ হওয়া চাই? আমি কিন্তু তা কর্‌তে পারি না। আমি বিয়ে কর্‌ব না ব'লে জীবনের যে একটা পথ নির্দ্দিষ্ট করেছিলাম, সে পথটি হঠাৎ ছেড়ে দেব নাকি? আমি যদি বিবাহ না করি, তো কি হয়? এতদিন যে আমি বিবাহ করি নাই, তাতে আমি অমানুষ হ'য়ে গেছি নাকি? আমি যে-পথে যাব, সে পথে কি তুমি যাবে না?" মন আবার অবরুদ্ধ হইবার ভয়ে বলিল "যাব না কেন? আমায় যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাব। কোন্‌দিন আমি তোমার অবাধ্য হয়েছি! কিন্তু একটা কথা বলি, রাগ ক'রো না। তুমি যদি তোমার নির্দ্দিষ্ট পথেই যাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলে, তাহ'লে সৌদামিনী যে অনূঢ়া কুলীন-ব্রাহ্মণের কন্যা, এই কথাটি কেবল অনুমান ক'রেই তুমি একটু চঞ্চল হ'লে কেন? তাকে 'সচল স্থলপদ্ম' বলে তোমার বন্ধুর সঙ্গে এত রসিকতা কর্‌লে কেন? তার পর যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুন্‌লে যে, তাঁরা তোমাদেরই পাল্টি ঘর, তখন আমার ঘরের কপাট একেবারে খুলে দিলে কেন? আমি তোমার ভাব বুঝ্‌তে পার্‌লাম। বুঝ্‌তে পেরেই আমি বন্ধনমুক্ত হ'য়ে একেবারে সৌদামিনীর কাছে

হাজির! তুমি নর্ম্মদার ধারে ধারে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে, আমায় খুঁজে বেড়ালে পাবে কোথায়? তুমি যাই বল, আমি তোমার হৃদয়ের ভাব জানি। তুমি যা চাও, আমি তাই খুঁজে পেয়েছি। আমায় তুমি আর আটক্ করে রাখ্‌তে পার্‌বে না। আমি সৌদামিনীর কাছেই থাক্‌ব। তা যদি থাকি, তাহ'লে তুমি কাজ কর্ম্ম কর্‌বে কিরূপে? সেই জন্য বল্‌ছি, কূট তর্ক ছেড়ে দিয়ে, নির্দ্দিষ্ট পথে চল্‌বার বৃথা লোক-দেখানী প্রতিজ্ঞাটি ত্যাগ ক'রে সৌদামিনীকে আপনার কাছে নিয়ে এস; তাকে বিয়ে কর; আর বিয়ে কর্‌বার সূচনা স্বরূপ কাল তা'কে আশীর্ব্বাদ করে ফেল। তাহ'লে তুমিও নিশ্চিন্ত; আমিও নিশ্চিন্ত। সকলে মিলে মিশে বেশ সুখে ও শান্তিতে কাল কাটান যাবে।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রকে বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "কি সতীশ? অনেকক্ষণ ধ'রে ভাব্‌ছ আর মাঝে মাঝে একটু একটু হাস্‌ছ যে? আমার কথার তো কোনও উত্তর দিলে না? কাল আশীর্ব্বাদ করা সম্বন্ধে তোমার মত কি?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "আমার আর মত কি? আমি আশীর্ব্বাদ টাশীর্ব্বাদ কর্‌তে পার্‌ব না। সে কাজটা তুমিই সেরে ফেল।"

ক্ষেত্রনাথ দন্তে দন্তে জিহ্বা পেষণ করিয়া বলিলেন

"আরে ছি, ছি, তুমি বল্‌ছ কি? তোমরা হ'লে ব্রাহ্মণ, আর আমরা হলাম বৈশ্য। তুমি পাগল হ'লে না কি?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "পাগলই হয়েছি। যখন মনের উপর কোনও আধিপত্য রাখ্‌তে পারছি না, তখন পাগল হ'তে আর বাকী কি?" পরে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "মাহেন্দ্র ক্ষণেই আমি তোমাদের বল্লভপুরে পদার্পণ করেছিলাম, দেখ্‌তে পাচ্ছি। পূজোর ছুটিটা কোথায় এই অরণ্যের মধ্যে শান্তিতে কাটাব মনে করেছিলাম, না, এখানে আস্‌তে না-আস্‌তেই এক মস্ত ফ্যাসাদ। তোমার বহুঠাকুরুণটি বুঝি স্থলপদ্ম-বনে দাঁড়িয়ে থাক্‌বার আর সময় পেলেন না! এর আগে কত স্থানে কত সুন্দরী মেয়ে চোখে পড়েছে; কিন্তু কখনও তো চোখ তুলে তাদের দেখ্‌বার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হয় নাই। এ কি সংযোগ? ভাগ্যবিধাতার একি লীলা? যে মন সহজে কখনও চঞ্চল হয় নাই, যাকে আজীবন কঠোর শাসনে দমন ক'রে রেখেছিলাম, সে আমাকে একটু অসাবধান ও অতর্কিত দেখে একেবারে মনের কপাট ভেঙ্গে অদৃশ্য। এমন মনকে আর বিশ্বাস করা যায় কিরূপে? এতদিনের সংযম, এতদিনের অভ্যাস —সব এক মুহূর্ত্তে বিফল হ'য়ে গেল? হতভাগা মন এখানে আমাকে একেবারে মাটী ক'রে ফেলেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে সে আমাকে ত্যাগ ক'রে পরের গোলাম হ'য়ে

গেছে! এমন বিশ্বাসঘাতক,—এমন নেমকহারাম —আর দেখেছ কি?"

ক্ষেত্রনাথ সতীশের কথা শুনিয়া তাহার মানসিক অবস্থাটি হৃদয়ঙ্গম করিলেন। পরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "দেখ, এখন আর আপশোষ করা বৃথা। মন যদি সদু-ঠাকরুণের গোলাম হ'য়ে থাকে, তা হ'লে আমার পরামর্শ হ'চ্ছে যে, তাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে আবার ফাটকে আটক্ কর। তা হ'লেই তার সমুচিত দণ্ড হ'বে।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "চমৎকার পরমর্শ দিয়েছ! আমি সে চেষ্টা কম করেছি নাকি? বরং ব্যাঘ্রীর মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে লওয়া সহজ, কিন্তু তোমাদের সদুঠাক-রুণের কাছ থেকে আমার মনটিকে ছিনিয়ে লওয়া সহজ নয়। আমি আর ছেনাছিনি কর্‌তে পার্‌ব না, তা'তে মন আমার বশে থাক্ আর নাই থাক্। মনের উপর আধিপত্যের আশা আমি এখন ছেড়ে দিয়েছি।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "চল, চল, সায়ংসন্ধ্যা ক'রে এখন কিছু জলযোগ কর্‌বে চল।"

সতীশচন্দ্র আপনার উপর যেন বিরক্ত হইয়া বলি-লেন "জলযোগ তো হ'বে। কিন্তু, ক্ষেত্তর, আমি এমন একটা কাট্-খোট্টা, নীরস আর শুষ্ক লোক! আমি কাজের কথা ভিন্ন কখনও অন্য কথা কই না, আর আমার

মেজাজটাও কিছু কড়া। সেই আমি কিনা একটী দিন তোমার এখানে এসে একেবারে বেহাল হ'য়ে পড়্‌লাম! লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কি ক'রে? না, না, না, না, তোমার এখানে আমার আর থাকা হ'বে না। আমি কালই চ'লে যাব।" এই বলিয়া সতীশচন্দ্র হস্তমুখ প্রক্ষালনের জন্য স্নানাগারে প্রবিষ্ট হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে ক্ষেত্রনাথ শয্যাত্যাগ করিয়াই গৃহসংলগ্ন উদ্যানে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং কপি, লাউ, শাক, বেগুন, কুম্‌ড়ো, প্রভৃতি বহুবিধ আনাজ ও শাকসব্‌জী তুলিয়া একজন ভৃত্য দ্বারা তৎসমুদায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। বেলা দশটার পর এগারটার মধ্যে কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রকে প্রস্তুত হইবার জন্য ত্বরা প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের কথায় কেবল বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন "ক্ষেত্তর, তুমি যে বড় জ্বালাতন করলে! আমি দেখ্‌ছি, তোমার এখানে এসে আমি ভারি অন্যায় করেছি। ওসব আশীর্ব্বাদ টাশীর্ব্বাদে আমি নাই। আমি তোমার ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের বাড়ী যাব না। তুমি যা হয়, করগে।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আচ্ছা, তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌তে হ'বে না। তুমি সেখানে খেতে যাবে তো? কাল যে বড় সর্‌ফরাজী ক'রে ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর্‌লে? আজ পেছ্‌-পা হ'লে চল্‌বে কেন? ওঠ, ওঠ, স্নান কর্‌বে চল।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের বাড়ীতে

খেতে যাবার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু আশীর্ব্বাদের কথা আমায় ব'লো না। মেয়ে আমি দেখেছি। আশীর্ব্বাদের কাজটা অপরকে দিয়ে সেরে নাও। বুঝ্‌লে ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "বুঝ্‌লাম। আচ্ছা, তাই হ'বে। তুমি তো এখন স্নান ক'রে নাও ; বেলা হ'য়ে এল যে!"

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের কথা ঠেলিতে না পারিয়া স্নান করিলেন। স্নানান্তে বাহিরে আসিয়া দেখেন, ক্ষেত্রনাথ লখাই সর্দ্দারকে দিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ভাল সন্দেশ ও মিষ্টান্ন, মাধব দত্ত মহাশয়ের পুষ্করিণী হইতে দুইটা বড় রোহিত মৎস্য এবং নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম হইতে চমৎকার দধি আনাইয়াছেন। সতীশ এই সমস্ত দেখিয়া বলিলেন "ক্ষেত্তর, এসব কি হে ? তুমি তো ভয়ানক লোক দেখ্‌ছি। তুমি ও তোমার গৃহিণীটি একদিনের মধ্যেই ভালমানুষকেও পাগল ক'রে তুল্‌তে পার, দেখ্‌ছি!"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তুমি আর এ-সমস্ত দেখ্‌ছ কেন ? চোখ বুজে থাক। শুভকার্য্যের জন্য অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু করা যেতে পারে, তা করা উচিত। শুধু হাতে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে যেতে নাই।" এই বলিয়া ক্ষেত্রনাথ সেই-সমস্ত দ্রব্য সহ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। মনোরমা অল্পক্ষণ মধ্যেই তৎসমুদায়

সাজাইয়া গোছাইয়া দাসীদের দ্বারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সঙ্গে মনোরমা তাঁহার নিজের একখানি নূতন রেশমী সাড়ীও পাঠাইয়া দিলেন।

বেলা সাড়ে নয়টার সময় ক্ষেত্রনাথ অনিচ্ছুক সতীশ-চন্দ্রকে কষ্টে গৃহ হইতে বাহির করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথে সতীশচন্দ্র বলিলেন "ক্ষেত্তর, গত পরশ্ব আমি তোমার এখানে না এলে খুব ভালই হ'ত। এ যে কি হচ্ছে, আর আমি কি যে কর্‌ছি, তা ঠিক্ যেন বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আমার মনে হচ্ছে, ভাগ্যবিধাতার হাতে আমি যেন একটা ক্রীড়ার পুতুলের মত হয়েছি। কেন, ভাই, তোমরা আমাকে ফ্যাসাদে ফেল্‌ছ। আমি বেশ আছি। আচ্ছা, আমি যদি ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের বাড়ী না যাই, তো কি হয়?" এই বলিয়া সতীশচন্দ্র পথের মাঝে স্থাণুবৎ সহসা অচল হইলেন।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আবার তুমি পাগ্‌লামী আরম্ভ কর্‌লে? ভদ্রলোক তোমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করেছেন। তুমি তাঁর বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছ। তাঁর একটী অনূঢ়া কন্যা আছে! কন্যাটি বয়ঃস্থা ও পরম-সুন্দরী, তা তুমি স্বচক্ষেই দেখেছ। তুমি অবিবাহিত এবং কন্যাটিও সর্ব্বাংশে তোমার যোগ্যা। কিন্তু সে দরিদ্র-কন্যা। সে যে তোমার সহধর্ম্মিণী হবে, এ দুরাশা তার বা তার

পিতার নাই। তুমি যদি দয়া ক'রে তা'কে পত্নীত্বে গ্রহণ কর, তা হ'লে, তার ও তার পিতার পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হ'বে। কিন্তু তোমার যদি আপত্তি থাকে, তা হ'লে জোর ক'রে কি কেউ তোমার বিয়ে দিতে পারে?"

ক্ষেত্রনাথের কণ্ঠস্বর কিছু গম্ভীর দেখিয়া সতীশচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন "চল, চল, আর অত বক্তৃতায় কাজ নাই। 'দরিদ্র-কন্যা' আর 'দয়া'র অত ছড়াছড়িতে প্রয়োজন নাই। কিন্তু তুমি আমার অবস্থাটা ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌ছ না। যে কখনও ঘাড়ে জোয়াল নেয় নাই, তার ঘাড়ে প্রথম জোয়াল চাপাবার সময় সে যদি একটু অসহিষ্ণু হয়, তা'তে কি তার দোষ দাও?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আমি যে তোমার অবস্থা না বুঝেছি, তা নয়। কিন্তু সকলেরই ঐ দশা। কালক্রমে সকলেরই ঘাড়ে জোয়াল স'য়ে যায়।"

উভয় বন্ধুর মধ্যে আর অধিক কথা হইল না। সতীশচন্দ্র কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া মনের পূর্ব্ব স্বাভাবিক অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মন হইতে সঙ্কোচ ও লজ্জার ভাব অনেকটা তিরোহিত হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহারা গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রজারা উভয়কে দেখিয়া ঘাড় নোয়াইয়া করজোড়ে প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ কেহ ক্ষেত্রনাথের নিকটে আসিয়া অনুচ্চকণ্ঠে সতীশচন্দ্রের পরিচয়

জিজ্ঞাসা করিলে, ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "ইনি আমার বন্ধু; পুরুলিয়ার ডেপুটী বাবু; এখানে বেড়াতে এসেছেন। এখন ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের বাড়ী যাচ্ছি।" "ডেপুটী বাবু"র নাম শুনিয়াই সকলে তফাৎ হইতে লাগিল।

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "ক্ষেত্তর, দেখ, ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করায় কোনও বাধা হ'বে না, তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি;—বিশেষতঃ যখন তাঁদের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে আমাদের আদান-প্রদান হ'য়ে গেছে। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে; আমাদের জ্ঞাতিরা আছেন, আর পিশ্‌তুতো ভাইও কল্‌কাতায় আছেন। তাঁদের একটা কথা না জানিয়ে হঠাৎ আশীর্ব্বাদ করাটা কি ভাল হচ্ছে? এত তাড়াতাড়ি না ক'রে, দু'দিন পরে এই কাজটি কর্‌লে ভাল হ'ত না কি? তুমি কি বল? আমার মনে যা হচ্ছে, তাই তোমায় বল্‌ছি।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তুমি যা বল্‌ছ, তা ঠিক্। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ। তোমার জ্ঞাতিরা বা তোমার পিশ্‌তুতো ভাই কি এত দূরে তোমার জন্য মেয়ে দেখ্‌তে আস্‌বেন? সকলেই আপনার আপনার কাজে ব্যস্ত। নিকট হ'লেও, না হয়, এক দিনের জন্য তাঁরা সময় ক'রে আস্‌তেন। কিন্তু এত দূরে আসা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। তার পর, তাঁরা সকলেই জানেন যে, তুমি মোটে বিয়েই

কর্‌বে না। এখন তোমার বিয়ে কর্‌বার ইচ্ছা হয়েছে, এই কথা তাঁরা যদি শোনেন, তাহ'লে এখনই বল্‌বেন 'যদি বিয়ে কর্‌বে, তো দেশে কর; কত ভাল ঘরের ভাল মেয়ে পাবে। সাঁওতাল-কুড়্‌মীর দেশে বিয়ে কর্‌বে কেন?' এইরূপ নানা আপত্তি তুলে একটা গোল বাঁধাবেন। আমার কথা হচ্ছে এই যে, ভটাচার্য্য মশাই-য়ের ঘর যদি তোমাদের করণীয় ঘর হয়, আর সৌদামিনীকে দেখে যদি তোমার মনে হয়ে থাকে যে, তাকে তোমার সহধর্ম্মিণী ক'রে তুমি সুখী হবে, তা হ'লে, এখন তোমার জ্ঞাতি-বন্ধুদিগকে কোনও কথা না জানানোই বুদ্ধিমানের কাজ। তুমি আজ আশীর্ব্বাদ করে যাও, তার পর, ভট্টাচার্য্য মশাইদের পরিচয় জানিয়ে সকল কথা তাঁদের বল। তা হ'লে, আর কেউ কোনও আপত্তি কর্‌বেন না। বিবাহের সময় তাঁদের যে এখানে আস্‌তে হ'বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন আর কোনও কথা জানাবার প্রয়োজন দেখি না। আমার বুদ্ধিতে যা আস্‌ছে, তা তোমাকে বল্‌লাম। এখন তুমি যেমন বুঝ, তেমনই কর।"

সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "তোমার কথাই ঠিক্। আজ আশীর্ব্বাদটা হ'য়ে যাক্, পরে সব কথা তাঁদের জানাব। তবে আমি নিজে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো না। অপরকে দিয়ে সে কাজটা সেরে ফেল।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা, তার ব্যবস্থা আমি কর্‌ছি।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে উপনীত হইলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্রদ্বয় অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং স্বয়ং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আনন্দাশ্রুনয়নে ও বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে তাঁহাদের যথোচিত সমাদর করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বৈঠকখানায় গ্রামবাসী আরও কতিপয় বয়স্ক ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। সকলের সহিত সতীশচন্দ্র পরিচিত হইলেন। উপস্থিত সকলেই সতীশচন্দ্রের রূপ, গুণ, বিদ্যা ও উচ্চপদের কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সতীশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের মুখে বাবাজীবনের পরিচয় পেয়ে আমরা যে কি পর্য্যন্ত সুখী ও আনন্দিত হয়েছি, তা আমি মুখে প্রকাশ ক'রে বল্‌তে অক্ষম। আমরা দেশ ছেড়ে এই কুস্থানে প'ড়ে আছি। এখানে আপনাদের মতন মহৎ লোকের দর্শন পাওয়া দুর্ঘট। আজ বাবাজীবনের দর্শন লাভ ক'রে আমরা আপনাদিগকে যথার্থই সৌভাগ্যবান্ মনে কর্‌ছি। তার পর,

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বাবাজীবনের সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মশাই-য়ের সম্বন্ধ যদি স্থাপিত হয়, তা হ'লে, শুধু ভট্টাচার্য্য মশাই কেন, আমাদের সকলেরই যে পরম সৌভাগ্য হ'বে, তার আর সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের কন্যাটি যেমন সুন্দরী, সুশীলা ও গুণবতী, আপনিও তেমনই তা'র যোগ্য পাত্র। তার সৌভাগ্যের কথা আমি একমুখে আর কি বল্‌ব? বিধাতার সমস্ত বিধানই অপূর্ব্ব, এবং মানুষের স্বপ্নেরও অগোচর।" এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটিকে ক্ষেত্রনাথ একান্তে লইয়া গিয়া সতীশচন্দ্রের মনোগত ভাব জ্ঞাপন করিলেন। তাহা অবগত হইয়া তাঁহারা বলিলেন "আমরা সকলেই আশীর্ব্বাদ কর্‌বো; সতীশ বাবুও সৌদামিনীকে ধান্য-দূর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন। তা'তে তাঁর আপত্তি কি হ'তে পারে?"

সৌদামিনী অন্তঃপুরে তাহাদের মাট্‌-কোঠার "পিঁড়া" বা বারাণ্ডায় শুদ্ধস্নাতা হইয়া এবং নববস্ত্র পরিধান ও নবমাল্য ধারণ করিয়া একটী মাদুরের উপর সসঙ্কোচে বসিয়া ছিল। পার্শ্বে প্রতিবেশিনী কতিপয় ব্রাহ্মণ-কন্যা এবং মহিলা দণ্ডায়মান ছিলেন। এমন সময়ে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য বহির্ব্বাটী হইতে সকলে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। সতীশচন্দ্র এবং ক্ষেত্রনাথও

তথায় উপস্থিত হইলেন। সতীশকে দেখিয়া মহিলারা ও বালিকারা বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দের সহিত তাঁহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সর্ব্বাগ্রে বৃদ্ধ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কন্যার মস্তকে ধান্যদূর্ব্বা দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; তৎপরে, অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার পুত্রদ্বয় তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সর্ব্বশেষে সকলের অনুরোধে সতীশচন্দ্রকেও অগ্রসর হইতে হইল। সেই সময়ে ক্ষেত্রনাথ সকলের অলক্ষিতে তাঁহার হস্তে দুইটী গিনি দিয়া তাহা সৌদামিনীর হস্তে প্রদান করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। সতীশচন্দ্র লজ্জাবনতমুখী সৌদামিনীর মস্তকে ধান্যদূর্ব্বা দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সৌদামিনী যেরূপ অন্যান্য গুরুজনকে, সেইরূপ তাঁহাকেও প্রণাম করিল। তৎপরে সতীশচন্দ্র তাহার হস্তে দুইটী গিনি প্রদান করিলেন। ইহার পর, ব্রাহ্মণ মহিলারা একে একে আসিয়া ধান্যদূর্ব্বা দ্বারা সৌদামিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এইরূপে আশীর্ব্বাদ-কার্য্য সমাপ্ত হইলে, পুরুষেরা বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত একত্র বসিয়া সতীশচন্দ্র আহার করিলেন। ক্ষেত্রনাথ এবং তাঁহার পুত্রেরাও মধ্যাহ্নভোজন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম

করিয়া সকলে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ যাইবার সময় একবার সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "সদু, তোমার বর আমাদের বাড়ীতে আছেন ব'লে যেন আমাদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ ক'র না। তা' হ'লে তোমার দিদি ভয়ানক রাগ কর্‌বেন, তা যেন মনে থাকে।"

সৌদামিনী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া কেবল ঈষৎ হাস্য করিল।

সৌদামিনীর পিসীমাতা একবার সতীশচন্দ্রকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। যখন তিনি উত্তরপাড়া হইতে চলিয়া আসেন, তখন সতীশ বালক ছিলেন। সতীশ তাঁহাকে চিনিতে না পারিলেও, তিনি সকলের কথা সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতৃহীনা সৌদামিনীর কথা পাড়িয়া, তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাহার রক্ষা ও পালনের ভার সতীশকে অর্পণ করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

"কাছারী-বাড়ী"-অভিমুখে যাইতে যাইতে সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ, ক্ষেত্তর, আশীর্ব্বাদটা আমি কি ক'রে করব, এই চিন্তায় প্রথমে সত্য সত্যই বড় বিব্রত হয়েছিলাম। কিন্তু যা হোক্, কাজটা কোনও রকমে সেরে ফেলা গেল। আমি মনে করেছিলাম, এসব অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু, এখন দেখ্‌ছি, হিন্দুর সকল অনুষ্ঠানেরই একটা সার্থকতা আছে। আশীর্ব্বাদের পূর্ব্বে সৌদামিনীকে আমি যতটা আপনার মনে করি নাই, এখন তা'র চেয়ে ঢের বেশী আপনার মনে হ'চ্ছে।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তিনি বলিলেন "তুমি যে আশীর্ব্বাদ করার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করেছ, তা'তে আমি সুখী হলাম। আজ সকালে তোমায় নিয়ে আমিও কি কম ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলাম? আশীর্ব্বাদ-তত্ত্বটি আমি যে রকম বুঝেছি, তোমায় তার একটু আভাস দিচ্ছি। তুমিই কাল বল্‌ছিলে, আমাদের দেশে পূর্ব্বরাগের স্থান নাই; তোমার কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। যুবক যুবতীর পূর্ব্বরাগ আমাদের বিবাহের মূল ভিত্তি নয়। দাম্পত্যজীবনের সুখ ও সফলতা যে প্রেমেরই উপর নির্ভর করে, তা সত্য বটে;

কিন্তু এই প্রেমটিকে সংযম ও ধর্ম্মভাবের ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তবে তাহা পবিত্র হয়। আমাদের বিবাহ, আমাদের প্রেম, আমাদের সকল কর্ম্মই ধর্ম্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বাগ্দান, বিবাহ, দ্বিরাগমন, ইত্যাদি কোন ব্যাপারেই ধর্ম্মকে বর্জ্জন করা চলে না। আমাদের ভালবাসায় সংযম, আমাদের আহারে ও বিহারে সংযম। সংযম ছাড়া আমাদের কোনও ধর্ম্ম বা কর্ম্ম নাই। আমাদের সমাজে পূর্ব্বরাগের অবসর নাই বটে; কিন্তু কতকগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে মানবের স্বাভাবিক প্রেমকে স্ফুরিত, প্রবাহিত, মার্জ্জিত ও সংযত করা হয়। আশীর্ব্বাদের ব্যাপারে বরকন্যার পরস্পরে মিলিত হবার প্রথা নাই। তার কারণ এই যে, যে পরিবারের সহিত যার সম্বন্ধ হ'চ্ছে, এই অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বাগ্রে সেই পরিবারের প্রতি তার একটা অনুরাগের সঞ্চার করা হয়। আগে পারিবারিক মিলন, তার পর ব্যক্তিত্বের—অর্থাৎ বরকন্যার মিলন; কেননা বরকন্যা স্ব স্ব পরিবারের অঙ্গীভূত, এবং পারিবারিক অস্তিত্ব ব্যতীত তখন তা'দের স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব নাই। আশীর্ব্বাদ বা বাগ্দানের পর বরকন্যার পরস্পরের প্রতি যে একটা অনুরাগ হয়, সে অনুরাগে কোনও বস্তুতন্ত্রতা থাকে না; সেটা অনেকটা তাদের কল্পনার খেলা। বিবাহের সময় বরকন্যা যখন মিলিত হয়, তখন তা'দের অনুরাগে

বস্তুতন্ত্রতা আসে। সেই সময়ে, যে-সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তদ্দ্বারা সেই বস্তুতন্ত্রতা আরও পুষ্ট হয়। দ্বিরাগমন, প্রভৃতি ব্যাপারে সেই বস্তুতন্ত্রতা আরও পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠে, এবং দাম্পত্য প্রেমও সংযত ও পবিত্র হয়। আজ সৌদামিনীর আশীর্ব্বাদ-ব্যাপারে তোমার উপস্থিত থাক্‌বার কথা নয়; তোমাদের পারিবারিক কর্ত্তারই উপস্থিত থাক্‌বার কথা। তুমি যে তাঁর অনুপস্থিতির ওজর ক'রে আজ আশীর্ব্বাদ বন্ধ রাখ্‌বার প্রস্তাব করেছিলে, সে প্রস্তাব উচিতই হয়েছিল। কিন্তু বিশিষ্ট অবস্থায় বিশিষ্ট বিধি অবলম্বনীয়। আজ তুমি সৌদামিনীর বররূপে তাকে দেখা দাও নাই; তোমাদের বংশের প্রতিনিধিরূপে তুমি আজ তার সমক্ষে উপস্থিত হয়েছিলে। কিন্তু তা হ'লেও, তোমাতেই বরত্ব ও তোমাদের বংশের প্রতিনিধিত্ব একাধারে বিদ্যমান থাকায়, সৌদামিনীর আশীর্ব্বাদের পর তুমি তা'কে আপনার লোক ব'লে মনে কর্‌তে সমর্থ হয়েছ। আশীর্ব্বাদ বিবাহের একটী অঙ্গ। বিবাহের দিনে যখন তোমাদের দুই হাত এক হ'য়ে যাবে, তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে, সৌদামিনী তোমার কত আপনার লোক!"

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের এই দীর্ঘ বক্তৃতা নীরবে শুনিতেছিলেন ও তাহা শুনিতে শুনিতে অতিশয় আমোদ অনুভব করিতেছিলেন। ক্ষেত্রনাথের বক্তব্য

শেষ হইলে, সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "জীবনের এই কঠোর সংগ্রামের মধ্যেও, দেখ্‌তে পাচ্ছি, তুমি তোমার পাঠ্যাবস্থার সেই দার্শনিক ভাব ও চিন্তা ত্যাগ কর নাই। জীবনসংগ্রামের মধ্যেও দার্শনিক ভাব ও চিন্তা বজায় রাখা হিন্দুর বিশিষ্টতা বটে। আমি তোমার মতন অত বিশ্লেষণ কর্‌বার অবসর না পেলেও, মোটা-মুটী ভাবে সব কথাই বুঝ্‌তে পারি। আমি তোমার সহিত প্রায় একমত। ··· হাঁ, একটা কথা ভাল মনে হ'ল। দেখ্‌ছি, তুমি আমাদের শাস্ত্র টাস্ত্রেরও আলোচনা কর। আচ্ছা, তুমি আমায় বল্‌তে পার, মনু পরাশর প্রভৃতি সংহিতায় বার বছরের আগেই মেয়েদের বিবাহ দেবার বিধি আছে; না দিলে পাপ হয়, আর পিতৃপুরুষেরা নরকস্থ হ'ন, একথাও শুন্‌তে পাওয়া যায়; কিন্তু আমাদের কুলীনের ঘরে যে যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা কুমারীদেরও বিবাহ হয়, এটা কি অশাস্ত্রীয় নয়? আর এইরূপ বিবাহে কি পাপ হয় না? অবশ্য তুমি একথা মনে করো না যে, কন্যার যৌবন-বিবাহে আমার কোনও আপত্তি আছে। আমি কুলীনের ছেলে—আমাদের কুলীন কন্যাদের প্রায়ই কন্যাবস্থায় বিবাহ হয় না। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধির সহিত কি এইরূপ বিবাহবিধি অসঙ্গত নয়?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আপাতদৃষ্টিতে তা অসঙ্গত বোধ

হয় বটে; কিন্তু বেদ যদি হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি হয়, তা হ'লে কন্যার যৌবন-বিবাহে কোনও দোষ হয় না; বরং যৌবন-বিবাহই ধর্ম্মসম্মত। বেদপাঠ কর্‌বার বিদ্যা, অধিকার বা সামর্থ্য আমার নাই; কিন্তু আমাদের দেশের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ (দ্রাবিড়ে এই রকম পণ্ডিত অনেক আছেন)—যাঁরা বেদ পড়েছেন, তাঁদের রচিত পুস্তক প'ড়ে বুঝেছি যে, পূর্ব্বকালে প্রাপ্তযৌবনা না হ'লে কন্যাদের বিবাহ হ'ত না। এখনও বিবাহে যে-সমস্ত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তা'তেও যৌবন-বিবাহেরই আভাস পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে যৌবনবিবাহের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সবিতৃকন্যা সূর্য্যা যৌবন প্রাপ্তির পর বিবাহ করেছিলেন। ঋগ্বেদের একটী সূক্তের ঋষি ঘোষা নাম্নী জনৈক মহিলা। তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্তা হয়েছিলেন; কাজেই তাঁর বিয়ে হয় নাই। পরে ভগবান্ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কৃপায় নীরোগ হ'য়ে অনেক বয়সে বিবাহ করেছিলেন। প্রাচীনকালে বিবাহ করা বা না করা স্ত্রীলোকের ইচ্ছাধীন ছিল। অনেকে আজীবন অবিবাহিত থেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্‌তেন ও তপস্যা কর্‌তেন। "বৃদ্ধ-কন্যা", এই কথাটি মূল সংস্কৃতে আছে। সুভ্রূ আজীবন তপস্যা ক'রে মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিবাহ করেছিলেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। পুরাণাদিতেও স্ত্রীলোকের যৌবন-বিবাহের অনেক

প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কালক্রমে নানা কারণে শাস্ত্রকার ঋষিগণ ক্রমে ক্রমে যৌবন-বিবাহের বিধি তুলে দিয়ে তার পরিবর্ত্তে বালিকাদের বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত কর্‌লেন। ঋষিগণ বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত কর্‌লেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহের পর কন্যার দ্বিরাগমন. প্রভৃতি সম্বন্ধে বিধিও প্রবর্ত্তিত কর্‌লেন। এ সব নিয়ম এখন এক বাঙ্গালা দেশ ছাড়া ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র হিন্দুমাত্রেই মেনে চলেন। মানেন না কেবল শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী! যৌবন-প্রাপ্তির পূর্ব্বে বালিকাদের যে বিবাহ, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাহই নয়,—বাগ্দানমাত্র। যদি অপ্রাপ্ত-যৌবনা বালিকার বিবাহ হয়, এবং দ্বিরাগমনাদি সম্বন্ধে নিয়ম প্রতিপালিত হয়, তা হ'লে বালিকাদের বাল্য-বিবাহের দোষ অনেকটা নিবারিত হ'তে পারে। সমাজসংস্কারকগণ এই দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ কর্‌লে প্রভূত উপকার হ'তে পারে। মোসলমানগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের পর থেকেই বালিকাদের বাল্য-বিবাহটি এদেশে প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত হ'য়ে পড়ে। তার একটী কারণ আছে। বিজয়ী মোসলমান সৈন্যেরা স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার কর্‌ত। কিন্তু সধবা নারীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা মোসলমান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ; সেই কারণে, সেই সময়ে কুমারী ও বিধবা রমণীগণই অতিশয় বিপন্না হতেন। কুমারীদের রক্ষার

জন্য পিতামাতারা অতি অল্প বয়সেই তাদের বিবাহ দিতে আরম্ভ করেন, এবং বিধবারা প্রায়ই সহমরণ দ্বারা দেহত্যাগ কর্‌তেন। কিন্তু যারা বৈদিক ধর্ম্ম মেনে চল্‌তেন, তাঁরা যৌবন-প্রাপ্তির পূর্ব্বে কন্যাদের বিবাহ দেওয়া অশাস্ত্রীয় মনে কর্‌লেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ধর্ম্মে অতিশয় আস্থাবান্ ছিলেন; এই জন্য তাঁরা যৌবন-প্রাপ্তির পূর্ব্বে কন্যাদের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হলেন না; পরন্তু যুবতী অবিবাহিত কন্যাদের রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করাও ন্যায়সঙ্গত মনে কর্‌লেন। সেই অবধি কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণেরা সমরকুশল, এবং এখনও ইহাঁরা সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হ'য়ে থাকেন। তার পর, দক্ষিণাপথে নম্বুদিরি ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অপ্রাপ্তযৌবনা কন্যাদের বিবাহ হয় না। তাঁদের দেশে মোসলমানদের আধিপত্য হয় নাই, সেই কারণে, কন্যাদের রক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদের ন্যায় অস্ত্র ধারণ কর্‌তে হয় নাই। ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও অপ্রাপ্তযৌবনা কন্যাদের বিবাহ হয় না। তাঁরা বীরের জাতি, অনায়াসেই কন্যাদের রক্ষণে সমর্থ হতেন। একে পূর্ব্ব থেকেই গোভিলপ্রমুখ সামবেদী মহর্ষিগণ কন্যাদের যৌবন-বিবাহের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন, এবং তাঁদের অনুসরণ করে পরবর্ত্তী স্মৃতিকারেরাও কন্যাদের বাল্যবিবাহ সমর্থন ও প্রচলন

ক'রেছিলেন, তা'র উপর মোসলমানগণের অত্যাচার-ভয়ে কালক্রমে সেই প্রথা সমাজ-মধ্যে দৃঢ়ীভূত হ'য়ে গেল। বর্ত্তমান সময়ে মোসলমানগণের অত্যাচারের আশঙ্কা নাই বটে, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন রয়েছে। সেই অনুশাসন লঙ্ঘন করা অনেকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। কালক্রমে লোকশিক্ষার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কন্যাদের বাল্যবিবাহ-প্রথাও তিরোহিত হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু এদেশে লোকশিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থায়, বাল্য-বিবাহ-প্রথার তিরোধানের সময় উপস্থিত হয় নাই। যখন আমাদের দেশের অধিকাংশ বালকই নিরক্ষর, তখন বালিকাদের শিক্ষার কথা না তুল্‌লেও চলে। যুবকেরা ব্রহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত না হ'লে, আর কুমারীরা প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা না পেলে, তারা সৎপথে ও ধর্ম্মপথে থাক্‌তে পার্‌বে কি না, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। যাই হোক, কন্যাদের যৌবন-বিবাহটা যে অশাস্ত্রীয় নয়, এবং তুমিও একটী যুবতীকে বিবাহ কর্‌তে উদ্যত হ'য়ে যে শাস্ত্রের সীমা লঙ্ঘন কর্‌ছ না, তা আমি মনে করি। সেই কথাটি বল্‌তে গিয়ে তোমাকে আজ অনেক কথা ব'লে ফেল্‌লাম।"

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন "ক্ষেত্তর, তুমি শাস্ত্র টাস্ত্র পড়বার এত সময় পাও কখন? আমি ব্রাহ্মণ-

পণ্ডিতের ছেলে, শাস্ত্রে আমারই অধিকার হবার কথা; আর তুমি বৈশ্য, কৃষিকার্য্যে তোমারই দক্ষতা হবার কথা। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আজকাল সবই উল্টো হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি হলাম কৃষকের সর্দ্দার; আর তুমি আমাকে শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়ে দিচ্ছ! কলিযুগে সবই উল্টো হ'য়ে পড়্‌ল, দেখ্‌তে পাচ্ছি।" সতীশের স্বরে বিদ্রূপ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "ওটা তোমার ভ্রান্ত ধারণা। কৃষিশাস্ত্র বল, বাণিজ্যনীতি বল, শিল্পশাস্ত্র বল, সমস্তই ঋষিরা প্রণয়ন ক'রে গেছেন। মহর্ষি পরাশর কৃষিশাস্ত্র প্রণয়ন করে গেছেন। পাকা কৃষক না হ'লে কেউ ওরূপ শাস্ত্র লিখ্‌তে পারেন না। মহর্ষি মনুর সংহিতায় সুন্দর বাণিজ্যনীতি দেখতে পাবে। মহর্ষি ভরত নাট্যকলা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা ক'রে গেছেন। বিদুর শূদ্র হ'লেও, ধর্ম্মতত্ত্বে ও শাস্ত্রের মর্ম্মব্যাখ্যায় অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। মহাবীর ভীষ্ম ক্ষত্রিয় হয়েও মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসন পর্ব্বে যে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান ক'রে গেছেন, তা কয়জন ব্রাহ্মণে পারেন? আজকাল লোকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে যেমন আবদ্ধ করে, পূর্ব্বকালে লোকে তেমন কর্‌ত না। তাই সেকালে হিন্দুরা উন্নতির উচ্চ মঞ্চে আরোহণ কর্‌তে পেরেছিলেন। যে বিষয়ে যাঁর অধিকার জন্মে,

তিনি সেই বিষয়ের আলোচনা কর্‌তেন এবং আপনার উন্নতি-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও উন্নতি সাধন কর্‌তেন। এইরূপ করাই বাঞ্ছনীয়।"

ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহারা কথা কহিতে কহিতে কাছারী-বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত। ক্ষেত্রনাথ কথা বন্ধ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন বৈকালে ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র ভ্রমণে বহির্গত হইলে, মনোরমা সৌদামিনীকে তাঁহাদের বাড়ীতে আনিবার জন্য যমুনাকে পাঠাইলেন। সৌদামিনী কিছুতেই "কাছারী-বাড়ী" যাইবে না; কিন্তু যমুনা তাহাকে বলিল যে, বাবুরা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছেন, এখন কেহ বাড়ীতে নাই, সেই কারণে গৃহিণী তাহাকে যাইতে বলিয়াছেন।

তথাপি কাছারী-বাড়ী যাইতে সৌদামিনীর লজ্জা হইতে লাগিল। গ্রামের কেহ কেহ গতকল্য তাহার আশীর্ব্বাদের কথা শুনিলেও, অধিকাংশ লোকেই তাহা শুনে নাই। কিন্তু সৌদামিনীর মনে হইতে লাগিল, সকলেই যেন তাহা শুনিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সে সকলের সম্মুখ দিয়া কিরূপে কাছারী-বাড়ী যাইবে—বিশেষতঃ যখন একটী নূতন লোক সেখানে রহিয়াছেন? লোকে কি মনে করিবে? বাবা কি মনে করিবেন? পিসীমা কি মনে করিবেন? বৌদিদি কি মনে করিবেন? না,—সৌদামিনী এখন কাছারী-বাড়ী যাইবে না। সে স্পষ্টই যমুনাকে বলিল "যমুনি, তুই যা; আমি যাব না।"

যমুনা গালে হাত দিয়া বলিল "ওমা, তুমি নাই যাবে, কি বল্‌ছ গো? গিন্নী রাগ করবেক্ যে! গিন্নী তুমাকে

লিয়ে যাত্যে এথাতে আমাকে পাঠাল্যেক্, আর তুমি সেথাতে নাই যাবে, বল্‌ছ ? ঘরে এখন কেউ নাই আছে—আমাদের বাবু আর তুমার বাবুটোও পাহাড়ে বুল্‌তে গেল্‌ছে” *—

যমুনার বাক্য শেষ না হইতে হইতেই সৌদামিনী রাগিয়া বলিল “যম্‌নি, পোড়ারমুখি, চুপ্ কর্ বল্‌ছি। আ মর্, কথা বল্‌বার ধরণ দেখ ?”

যমুনা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল “লয়া বাবুটো কি তুমার বাবু নাই আছে ? তুমার বাবু লয় তো উটো কার বাবু বটে ? বাবুটো তুমাকে বিহা কর্‌ব্যেক। তুমি অমন বাবু কুথায় পাবে গো, সৌদাদিদি ? আচ্ছা, আগে বিহা তো হোক্, তার পর উটো তুমার বাবু বটে, ন কার বাবু বটে, তা দেখা যাব্যেক্।”

সৌদামিনী যমুনার কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিল। বৌদিদি রন্ধনশালা হইতে তাহাদের কথোপকথন শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন “কি, যমুনা, তোমাদের লয়া বাবুটা কি আমার ঠাকুরঝিকে দেখ্‌বার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে ? বেশ তো ; নিয়ে যাও না।”

যমুনা হাসিয়া বলিল “তুমি অমন কইলে তো সৌদা-দিদি ওথাতে আর নাই যাব্যেক্। আমাদের বাবু আর লয়া বাবুটো পাহাড়ে এখন বুল্‌তে গেল্‌ছে। গিন্নী

* বুল্‌তে গেল্‌ছে—বেড়াতে গেছে।

আমাকে কহে দিল্যেক্, সৌদাকে ডেকে নিয়ে আয়, তার সঙ্গে আমার ঢের কথা আছে।”

বৌদিদি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন“ যাও না, ঠাকুরঝি ; তোমার বর ওখানে আছে তো কি হ’বে ? একবার যদি দেখাও হ’য়ে যায়, তাতেই বা দোষ কি ? যমুনা বল্‌ছে, তারা এখন বাড়ীতে নেই। যাও না, নগিনের মা কি বলে, শুনে এস। না গেলে সে রাগ কর্‌বে, বুঝ্‌লে ?”

পিসীমা সেই সময়ে সেখানে আসিয়া সকল কথা শুনিলেন। তিনিও সৌদামিনীকে যাইতে বলিলেন। সৌদামিনী কি করে, সকলের কথায় যাইতে সম্মত হইল। সেই সময়ে গাঙ্গুলীদের দশবর্ষবয়স্কা নীরদা সেখানে উপস্থিত হওয়ায়, সৌদামিনী তাহাকে বলিল “নীরু, আমার সঙ্গে কাছারী-বাড়ী যাবি তো আয়।” এই বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইল।

কাছারী-বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র, মনোরমা হাসিয়া তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন “এস, এস, সদু, এস। তুমি খুব কপির ডাল্‌না রাঁধ্‌তে শিখেছিলে, যা হোক্! একজনকে কেবল কপির ডাল্‌না খাইয়েই বশ ক’রে ফেল্‌লে। তোমার খুব বাহাদুরী বটে !”

সৌদামিনী লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। পরে বলিল “তুমি কি জন্যে আমায় ডেকে পাঠিয়েছ ?”

"কি জন্যে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি ? তোমার বরের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে ! এটাও কি আর বুঝ্‌তে পার নি ?" সদুকে লজ্জায় অধোবদন দেখিয়া মনোরমা বলিল "না, না, অত ভয় কর্‌ছ কেন ? তোমার বরের সঙ্গে এখন দেখা হ'বে না। তাঁরা পাহাড়ে বেড়াতে গেছেন। তুমি বস। সেই যে সেদিন তুমি গেছ, তার পর থেকে তোমার আর দেখাটি নাই। তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য আমি ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছিলাম।"

এমন সময়ে নরু আসিয়া মাসীমার ক্রোড়ে আরোহণ করিল। নরু বলিল "মাসীমা, কাল আমরা তোমাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি। আচ্ছা, মাসীমা, কাকাবাবু তোমার হাতে দুটো সোনার টাকা দিলে কেন ? বল না ?"

সৌদামিনী তিরস্কারসূচক অনুচ্চকণ্ঠে নরুকে বলিল "চুপ্‌ কর্‌, দুষ্ট ছেলে।"

নরু বলিল "আমি দুষ্ট হ'ব কেন ? কাকাবাবু সেদিন বলেছে, তুমিই দুষ্টু। হ্যাঁ,—তুমি শোন নাই বুঝি ?"

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন "ওরে নরু, তোর কাকাবাবু এখন তোর মেশোমশাই হয়েছে। তাঁকে এখন মেশোমশাই বলে ডাকিস্‌।"

সৌদামিনী নরুকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়া লজ্জা ও অভিমানসূচক স্বরে মনোরমাকে বলিল "তুমি কি যে

বল, দিদি, তার ঠিক্ নাই। নরু এখনি কি বল্‌তে কি বলে বস্‌বে। নরু, তুই যদি ঐ কথা বলিস্, তা হ'লে তোকে আর কোলে নেবো না, ফুল এনে দেবো না, আর গল্প বল্‌বো না। বুঝেছিস্ ?"

নরু মাসীমার শাসনে ভীত হইয়া বলিল "না, মাসীমা, আমি বল্‌বো না। তুমি আমায় গল্প শোনাবে ?"

সৌদামিনী হাসিয়া বলিল "শোনাব ; তুমি আমার লক্ষ্মী ছেলে, তোমায় আবার গল্প শোনাবো না ?" এই বলিয়া তাহাকে আবার ক্রোড়ে লইল।

মাসীমার কথা শুনিয়া নরুর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

মনোরমা সৌদামিনীকে বলিলেন "কাল যে সপ্তমী ; দত্তদের বাড়ীতে পূজো ; আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ী আস্‌বে। তুমি যাবে না ?"

সৌদামিনী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল "তুমি যাবে তো ? তুমি যদি যাও, তা হ'লে আমিও যাব।"

মনোরমা বলিলেন "আমরা যাব, ঠিক করেছি। বাবু বল্‌ছিলেন, দত্তগিন্নী নিজে নিমন্ত্রণ কর্‌তে এসেছিলেন ; না গেলে, ভাল দেখাবে না। সতীশ বাবুর বামুন রয়েছে। সেই এখন রেঁধে তাঁদের খাওয়াবে। কাল আর পরশু, দুটী দিন ওদের বাড়ীতে থেকে নবমীর দিন সকাল বেলায় আমরা চ'লে আসবো, কেমন ?"

সৌদামিনী বলিল "তা বেশ। আমি পিসীমাকে বল্‌ছি। বাবা আর দাদা আজ সকালেই দত্তদের বাড়ী গেছেন।"

মনোরমা প্রভৃতি যখন কলিকাতা হইতে চলিয়া আসেন, তখন ক্ষেত্রনাথ তাঁহার বন্ধকী গহনাগুলিও মহাজনের নিকট হইতে ছাড়াইয়া আনিয়াছিলেন। মনোরমা এক্ষণে সৌদামিনীকে উপরের ঘরে লইয়া গিয়া গহনার বাক্স বাহির করিলেন, এবং সোনার চুড়ী প্রভৃতি বাহির করিয়া সৌদামিনীকে পরিতে বলিলেন।

সৌদামিনী বিস্মিত হইয়া বলিল "কেন, চুড়ী পর্‌ব কেন?"

মনোরমা বলিলেন "কেন, তা পরে বুঝ্‌তে পার্‌বে। বলি, এই সোজা কথাটাও বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? সতীশ বাবু তোমার জন্য যে গহনা গড়াবেন, তা তোমার হাতের মাপ না পেলে কি ক'রে গড়াবেন? বুঝ্‌লে এতক্ষণে?"

সৌদামিনীর মুখ লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। সে মনোরমার সোনার চুড়ী পরিতে চাহিল না। মনোরমা অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু চেষ্টা সফল হইল না। তখন মনোরমা নিরুপায় হইয়া সৌদামিনীর হাত হইতে একটী কাচের চুড়ী খুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন "বেশ, তোমার বরকে এই কাচের চুড়ীখানাই দেব। কে বলে, তোমার বুদ্ধি নাই? তুমি কাচের বদলে

কাঞ্চন পাবে, আর তিনি হীরের বদলে কেবল জীরে পাবেন। দেখ্‌ছি, তোমারই জিত।”

মনোরমার সঙ্গে কথায় আঁটিয়া উঠা শক্ত ভাবিয়া সৌদামিনী ঈষৎ হাসিয়া নীরব রহিল। সৌদামিনী সর্ব্বক্ষণই ক্ষেত্রবাবু ও সতীশবাবুর প্রত্যাগমনের আশঙ্কা করিতেছিল। এইজন্য সে বলিল “দিদি, তুমি বস; আমি আর বেশীক্ষণ থাক্‌ব না, বাড়ী যাই। বৌদিদি একলা আছে। কাল কখন যাবে?”

মনোরমা বলিলেন “খাওয়া দাওয়ার পর।”

সৌদামিনী বলিল “বেশ, আমিও যাব।” এই বলিয়া নীরদা ও যমুনার সহিত গৃহে প্রত্যাগত হইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর মনোরমা তাঁহার সন্তানগণকে এবং সৌদামিনী ও যমুনাকে সঙ্গে লইয়া মাধবদত্ত মহাশয়ের বাটীতে গেলেন। ক্ষেত্রনাথ ও সতীশ-চন্দ্র বৈকালে পর্ব্বতে ও প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সতীশচন্দ্র নানাস্থানে অভ্র, লৌহগর্ভ প্রস্তর ও নানাবিধ মুল্যবান্ খনিজ পদার্থ দেখিতে পাইয়া ক্ষেত্রনাথকে তাহাদের ব্যবহারাদির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সমস্ত পদার্থ উত্তোলন ও সংগ্রহ করিতে যে বিশিষ্ট জ্ঞান এবং প্রভূত অর্থেরও প্রয়োজন, তাহাও তাঁহাকে বলিলেন। বল্লভপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রকৃতি দেবী সযত্নে যে অতুল ধনরত্ন সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া সতীশ-চন্দ্রের আনন্দ ও বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

মহাষ্টমীর প্রভাতেও দুই বন্ধুতে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন, মাধবদত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র হরিধন দুইটী গোযান লইয়া উপস্থিত। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিবামাত্র হরিধন বিনীত বচনে বলিলেন "বাবা আমাকে আপনাদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আপনাকে ও আপনার বন্ধু সতীশবাবুকে আমাদের বাড়ীতে আজ

পায়ের ধূলা দিতে হ'বে। আমি আপনাদের নিতে এসেছি। আমি সাহস ক'রে সতীশ বাবুকে অনুরোধ করতে পার্‌ছি না। আপনি আমার হয়ে তাঁকে অনুরোধ করুন।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রকে যাইবার জন্য অনুরোধ করায়, তিনি বলিলেন "বেশ তো; বিকেল বেলায় যাওয়া যাবে। যখন এ অঞ্চলে বেড়াতে এসেছি, তখন এঁদের গ্রামটিও দেখে আসা যাক্।" এই বলিয়া তিনি হরিধনকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাদের গ্রাম এখান থেকে কত দূর? সন্ধ্যার সময় তো ফিরে আস্‌তে পার্‌ব?"

হরিধন বলিলেন "বেশী দূর নয়; এক ক্রোশ হবে। আর আজ আপনারা ফিরে নাই বা এলেন? সেখানে আজ আপনারা অবস্থিতি কর্‌বেন। বেলা পাঁচটার সময় সন্ধিপূজা শেষ হবে। তার পর ছৈ-নাচ আর যাত্রা হবে, তা দেখ্‌বেন।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "না ভাই, রাত্রি জেগে যাত্রা শুন্‌তে পার্‌ব না।"

হরিধন বলিলেন "আচ্ছা, আপনাদের যেরূপ অভিরুচি হয়, তাই কর্‌বেন।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র স্নান করিয়া হরিধনকে তাঁহাদের সহিত আহার করিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু হরিধন বলিলেন

যে, তিনি মহাষ্টমীর উপবাস করিয়াছেন ; সন্ধিপূজা শেষ না হইলে, জলগ্রহণ করিবেন না।

অগত্যা উভয়ে আহারাদি শেষ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর হরিধনের সহিত গোযানে আরোহণ করিয়া মাধবপুর গ্রামে উপনীত হইলেন।

মাধবপুরের মধ্যে মাধব দত্তই সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁহারই নামানুসারে এই গ্রামের নাম হইয়াছে। তাঁহার বৈঠকখানা বাটীর সম্মুখে গাড়ী উপস্থিত হইবামাত্র, মাধব দত্ত মহাশয় অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং সতীশবাবুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "আজ আমার কি পরম সৌভাগ্য। আপনার ন্যায় মহাত্মার পদার্পণে আজ আমার বাটী পবিত্র হ'ল, আর আমরাও ধন্য হলাম। আপনাকে আমার বাটীতে আনবার দুরাশা আমি কখনও করতে পার্‌তাম না, যদি আপনি ক্ষেত্রবাবুর বন্ধু না হতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে আপনার পরিচয় অবগত হয়েছি। আমার কি পরম সৌভাগ্য যে আপনার দর্শনলাভ কর্‌লাম। আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।" এই বলিয়া মাধব দত্ত মহাশয় তাঁহাদিগকে লইয়া বৈঠকখানা বাটীতে বসাইলেন।

সন্ধিপূজায় বসিতে তখনও প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। এই জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং অনেক অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোক বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প

করিতেছিলেন। তাঁহারাও সতীশবাবু ও ক্ষেত্রবাবুর বিলক্ষণ সমাদর করিলেন। তাঁহাদের সহিত সকলের আলাপ পরিচয় হইল। আলাপ-পরিচয়ের পর তাঁহারা উভয়ে উঠিয়া চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমাদর্শন করিতে গেলেন। সুগঠিত প্রতিমা ও প্রতিমার সাজসজ্জা দেখিয়া উভয়ে বিস্মিত হইলেন। দেবীকে প্রণাম করিয়া সতীশবাবু মাধবদত্ত মহাশয়কে বলিলেন "আপনাদের এখানে প্রতিমার চমৎকার গড়ন হয় তো! বাঃ! এ দেশেও এমন কারিগর আছে?"

মাধবদত্ত হাসিয়া বলিলেন "এখানকার কারিগরে এ প্রতিমা গড়ে নাই। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর গ্রাম থেকে কারিগর এসে এই প্রতিমা গড়ে যায়।"

চণ্ডীমণ্ডপের বৃহৎ উঠানটি হরিদ্বর্ণ শালপত্রাচ্ছাদিত একটী উচ্চ ছান্‌লার দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। তাহাই চন্দ্রাতপের কার্য্য করিতেছিল। তাহা দেখিয়া সতীশচন্দ্র ও ক্ষেত্রনাথ উভয়েই অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিলেন। মাধবদত্ত মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন "এ অঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ ছান্‌লা চাঁদোয়ার কার্য্য করে। এরই নীচে ব্রাহ্মণ-ভোজন, কাঙ্গালীভোজন, যাত্রা নাচ প্রভৃতি হয়। আমরা মোটামুটী ধরণের লোক; আর আমাদের চালচলনও মোটামুটী রকমের।"

সতীশবাবু হাসিয়া বলিলেন "মোটামুটী হোক্; কিন্তু এটি ভারি চমৎকার হয়েছে। কাঁচা শালপল্লবের আচ্ছাদন হওয়ায়, আপনার উঠানের চমৎকার শোভা হয়েছে। এর নিম্নভাগটি ছায়াযুক্ত ও শীতল হয়েছে, আর এই ছান্‌লার জন্যই আপনার দেবীমন্দিরটিও সুন্দর ঘোরালো দেখাচ্ছে।"

সন্ধিপূজায় বসিতে আর অধিক বিলম্ব ছিল না। অগত্যা সকলেই তাহার জন্য ব্যস্ত হইলেন। সেই সময়ে ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র গ্রামটি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য পূজাবাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রাকৃতিক বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। মাধবদত্ত মহাশয়ের জনৈক নিমন্ত্রিত কুটুম্বও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া জানিলেন যে, তিনি তিনক্রোশ দূরে একটী গ্রামে বাস করেন। এই প্রদেশের প্রায় সকল গ্রামেই পূর্ব্বদেশীয় গন্ধবণিকেরা আসিয়া বাস করিয়াছেন। পূর্ব্বদেশীয় বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি জাতি এই অঞ্চলে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। গন্ধবণিকের সংখ্যাই অধিক, আর অনেক গন্ধবণিক্ পূর্ব্বদেশ হইতে দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণও আনাইয়া এই প্রদেশে বাস করাইয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন "ক্ষেত্তর, যেখানে

অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা ও অন্নবস্ত্রের সুখ, সেইখানেই বৈশ্যেরা উপস্থিত হ'য়ে বাস করেন। প্রাচীনকালেও তাঁরা এইরূপ কর্‌তেন ব'লে, তাঁদের নাম "বিশঃ" অর্থাৎ Pioneers হয়েছিল। এই ছোটনাগপুরটি একটী অনার্য্যপ্রধান দেশ; কিন্তু এই ভদ্রলোকের মুখে শুন্‌তে পাচ্ছি, এ অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই গন্ধবণিকেরা এসে বাস করেছেন। তাই আমার মনে হচ্ছে, তোমরা এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে Pioneers বা বৈশ্যই আছ। তোমাদের সেই পুরাকালের রীতি ও ব্যবহার এখনও তোমাদের ত্যাগ করে নাই। তোমাদের সঙ্গে বা পশ্চাতে ব্রাহ্মণেরাও এ দেশে এসেছেন; কেন না, ব্রাহ্মণ না হ'লে তোমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয় না। তার পর, তোমাদের দেখাদেখি অপর জাতীয় লোকেরাও এ দেশে আস্‌বেন। তোমরা এ দেশে এসে বাস করাতে তোমাদের আচার ব্যবহার দেখে এ দেশ-বাসীদেরও আচার ব্যবহার ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। তোমাদের দ্বারাই বোধ হয় প্রাচীনকালেও হিন্দুসভ্যতা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়েছিল।"

সতীশচন্দ্রের কথা শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ ও সেই ভদ্রলোকটি উভয়েই হাসিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তোমার অনুমান নিতান্ত মিথ্যা না হ'তে পারে। বোর্ণিও (অর্থাৎ সুবর্ণদ্বীপ), যবদ্বীপ, সুমাত্রা, শ্যাম,

ক্যাম্বোদিয়া প্রভৃতি দেশে ও দ্বীপে আর্য্য বৈশ্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তার বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। গন্ধবণিকেরা সাংযাত্রিক অর্থাৎ সমুদ্রযাত্রী বণিক্ ছিলেন। গন্ধবণিক্‌জাতীয় ধনপতি সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগর, চন্দ্রবণিক্ বা চাঁদবেণে সদাগর—এঁরা সকলেই সমুদ্রযাত্রা কর্‌তেন, তার বিবরণ প্রাচীন পুঁথিতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। গন্ধবণিকেরা যে পূর্ব্বোক্ত দেশে ও দ্বীপসমূহেও বাস করেন নাই, তা কে বল্‌তে পারে?"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে মাধবদত্ত মহাশয়ের বাটী হইতে ঢাক ঢোলের শব্দ শ্রুত হওয়ায়, তাঁহারা বুঝিলেন যে, সন্ধিপূজা সমাপ্ত হইয়া গেল। সন্ধ্যাও হইয়া আসিতেছিল। এই কারণে তাঁহারা ভ্রমণ পরিত্যাগ করিয়া মাধবদত্ত মহাশয়ের বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

তখন দেবীর আরত্রিক হইতেছিল। আরত্রিক দেখিবার জন্য পূজার দালানের সম্মুখে সেই বৃহৎ উঠানটি লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। আরত্রিকের পর লোকসংখ্যা কমিয়া গেলে, সতীশবাবু ও ক্ষেত্রবাবু মাধবদত্ত মহাশয়ের অনুরোধক্রমে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন এবং তৎপরেই বল্লভপুরে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সকলের অনুরোধে পড়িয়া তাঁহারা ছৈ-নাচ দেখিয়া যাইবেন, স্থির হইল।

তখনই ছৈ-নাচের উদ্যোগ হইল। স্থানীয় ভূমি-

জেরা এই নাচ দেখাইয়া থাকে। তাহারা দুই তিনটী দুন্দুভি বা নাগ্‌রা লইয়া আসিল। ছানলা তলার চারিদিকে উজ্জ্বল মশাল প্রজ্বলিত হইল। দণ্ড দ্বারা দুন্দুভি আহত হইবামাত্র গম্ভীর শব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইল। আবার দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। বৈঠকখানা-গৃহের ভিতর দিকের বারাণ্ডায় সতীশবাবু প্রভৃতির বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। নাচ দেখিবার জন্য অন্তঃপুর হইতে সুরেন, নরু প্রভৃতিও আসিয়া তাঁহাদের নিকট বসিল। পার্শ্বস্থ এক সজ্জাগৃহ হইতে মুখোশ পরিয়া ও বিচিত্র বেশ করিয়া দুইটী লোক বাহির হইল; তন্মধ্যে এক ব্যক্তি রাম, ও অপর ব্যক্তি রাবণ। রাম-রাবণের যুদ্ধারম্ভ হইল। উভয়েরই হস্তে ধনুর্ব্বাণ। দুন্দুভির তালে তালে তাহারা পাদবিক্ষেপ ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া পরস্পরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ধনুষ্টঙ্কার করিয়া বাণনিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া রাবণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তার পর, বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ, রাক্ষস-বানরের যুদ্ধ, ভীম-দুর্য্যোধনের গদা-যুদ্ধ, কিরাতার্জ্জুনের যুদ্ধ, এইরূপ নানা যুদ্ধ প্রদর্শিত হইল। তার পর, সামাজিক নক্সা প্রদর্শিত হইল। কলিকাতার বাবু, পল্লীগ্রামের জমীদার, সাহেব হাকিম, ডিপ্‌টি বাবু প্রভৃতির নক্সা দেখিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সর্ব্বশেষে দৈত্য, দানব, ভূত,

প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির বীভৎস নৃত্য প্রদর্শিত হইল। ছৈ-নাচ শেষ হইলে, সতীশচন্দ্র ও ক্ষেত্রনাথ, মাধবদত্ত ও উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গো-যানে "কাছারী-বাড়ী"তে প্রত্যাগত হইলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া দশমীর রাত্রিতে সতীশচন্দ্র বল্লভপুর ত্যাগ করিয়া পুরুলিয়ায় গমন করিলেন। ক্ষেত্রনাথ সতীশবাবুকে পূজার ছুটীর অবশিষ্ট কয়েকটি দিন বল্লভপুরেই থাকিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু সতীশচন্দ্র বলিলেন যে, তাঁহাকে একবার কলিকাতায় গিয়া তাঁহার পিস্‌তুতো ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সুতরাং ক্ষেত্রনাথ আর কোনও আপত্তি করিলেন না।

কোনও কোনও ক্ষেত্রের ধান্য পাকিয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ তাহা কাটাইতে আরম্ভ করিলেন। খামারবাড়ীর ঘাস ইত্যাদি কোদালি দ্বারা চুলাইয়া, ক্ষেত্রনাথ তাহা মৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা লেপিত করাইলেন। সেই পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন খামারবাড়ীতে কর্ত্তিত ধান্যসমূহ রক্ষিত হইতে লাগিল। ধান্যের "পালুই"গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এই সময়ে লখাই সর্দ্দার প্রভৃতি মুনিষগণের বিশ্রামের কিছুমাত্র অবসর ছিল না। ক্ষেত্রে ধান্য কাটা, কাটা ধান্যের গোছাগুলিকে আঁটি আঁটি করিয়া বাঁধা, আঁটিগুলিকে আবার বোঝা করিয়া বাঁধা, তৎপরে সেগুলিকে গাড়ীতে করিয়া খামারবাটীতে বহন করিয়া আনা, আবার তৎসমুদায় পালা দিয়া স্তূপীকৃত করা—এই সমস্ত কার্য্যে তাহারা প্রত্যূষ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাকিত। ধান্যসমূহ কর্ত্তিত ও খামারে

আনীত হইলে, তাহারা একএকটী আঁটী আছাড়িয়া তাহা হইতে ধান্য ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল। কামীনেরা সেই ধান্যগুলি কুলো দ্বারা ঝাড়িয়া তাহা হইতে আগ্‌ড়া বাহির করিতে লাগিল। এই পরিষ্কৃত ধান্যগুলির ওজন হইলে, তৎসমুদায় মরাইয়ে বা গোলাতে উত্তোলিত হইতে লাগিল। ধান্যের যে শীষগুলিকে আছড়াইবার উপায় ছিল না, গরু দ্বারা তাহা মাড়াইবার জন্য মুনিষেরা মাড়া জুড়িতে লাগিল। এই সমস্ত কার্য্যে কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের কিছুদিন অতিবাহিত হইল। এই সময়ের মধ্যে, ক্ষেত্রনাথ, নগেন্দ্র, ও মুনিষ কামীন্ কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার যেন অবসর ছিল না। ধান্য মরাইয়ে উত্তোলিত হইলে দেখা গেল, প্রায় ছয়শত মণ ধান্য সঞ্চিত হইয়াছে। এই ছয়শত মণ ধান্যের তিনটি মরাই বা গোলা হইল। খড় বা বিচালীগুলিকে স্তূপীকৃত করিয়া পালুই দেওয়া হইল। ধান্য সঞ্চিত হইলে, ক্ষেত্রনাথ কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া এক লক্ষ ইষ্টক প্রস্তুত করাইলেন এবং আসানসোল হইতে দুই গাড়ী কয়লা আনাইয়া তাহা পোড়াইবার বন্দোবস্ত করিলেন। এখানে উই পোকার অত্যন্ত উপদ্রব বলিয়া ক্ষেত্রনাথের গৃহের চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী কাষ্ঠের প্রাচীরগুলি জীর্ণ হইয়াছিল। ইষ্টক পোড়াইয়া ক্ষেত্রনাথ চারিদিকে পাকা প্রাচীর গাঁথাইবার অভিপ্রায় করিলেন।

এ দিকে অড়হর, বিরি (কলাই) এবং মুগও পাকিয়া উঠিল। এই সমস্ত ফসল কর্ত্তিত ও উৎপাটিত হইয়া খামারে আনীত হইল, এবং যথাসময়ে মাড়াই ঝাড়াই হইয়া গৃহমধ্যে রক্ষিত হইল। ক্ষেত্রনাথ সমস্ত ওজন করিয়া দেখিলেন, কলাই পঁচাত্তর মণ, অড়হর ত্রিশ মণ ও মুগ বাইশ মণ হইয়াছে। লখাই সর্দ্দার ধান্যাদি প্রত্যেক শস্যের বীজ যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিল এবং তৎসমুদায় বোরা বা থলিয়ার মধ্যে রাখিয়া তাহাদের মুখ উত্তমরূপে আঁটিয়া দিল।

পৌষমাসে ক্ষেত্র হইতে গোল আলু উঠাইবার সময় উপস্থিত হওয়ায়, সকলে গোল আলু উঠাইতে নিযুক্ত হইল। সেই সময়ে ডেপুটী কমিশনার সাহেব সতীশচন্দ্রের সহিত মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে আসিয়া বল্লভপুর অঞ্চলে উপনীত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ পূর্ব্বেই সতীশচন্দ্রের নিকট হইতে তাঁহাদের আগমনের সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। এই কারণে, তিনি কতকগুলি, বাঁধাকপি, শালগম, ওলকপি, ফুলকপি, মটরসুঁটি, টমেটো বা বিলাতী বেগুন ও বড় বড় গোল আলুর দ্বারা একটী বৃহৎ ডালি সাজাইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ডাকবাঙ্গালায় উপনীত হইলেন এবং সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎসমুদায় উপঢৌকন প্রদান করিলেন। বল্লভপুরে এই সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা শুনিয়া ডেপুটী কমি-

শনার সাহেব যারপরনাই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন এবং পরদিন প্রভাতে সতীশবাবুর সহিত বল্লভপুরে যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

পরদিন যথাসময়ে সাহেব ও সতীশবাবু বল্লভপুরে উপনীত হইয়া ক্ষেত্রনাথ ও নগেন্দ্রের সহিত তাঁহার শস্যক্ষেত্রসমূহে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই সময়ে আলুর ক্ষেত্রে আলু উত্তোলিত হইতেছিল; আলুর ফসল দেখিয়া সাহেব অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং ক্ষেত্রনাথ যে উপায়ে নন্দাজোড় বাঁধাইয়া জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও আনন্দিত হইলেন। তৎপরে তিনি কার্পাস ক্ষেত্রে গিয়া কার্পাসের গাছ দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। হরিণ ও হাতীর উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষার জন্য ক্ষেত্রনাথ প্রজাদের সহিত পরামর্শ করিয়া যে অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও সাহেব অতিশয় আমোদ অনুভব করিলেন ও ক্ষেত্রনাথের বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। সতীশচন্দ্র কৌশলক্রমে সাহেবকে পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করাইয়া গভর্ণমেণ্টের খাশমহাল নন্দনপুর মৌজাটি দেখাইলেন এবং তাহার মৃত্তিকার উর্ব্বরা শক্তিরও পরিচয় প্রদান করিলেন। এই বিস্তৃত ভূভাগটি আবাদ করিতে পারিলে তাহাতে যে বহুপ্রকারের শস্য এবং প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাও তাঁহাকে বুঝাইলেন।

সাহেব সতীশবাবুর কথা শুনিয়া বলিলেন "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য। কিন্তু এ দেশের অধিবাসীরা অতিশয় অলস ও অকর্ম্মণ্য। খাশমহালের ডেপুটি কলেক্টার অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনও প্রজা বসাইতে পারেন নাই। তবে আপনার বন্ধু ক্ষেত্রবাবুর মত উদ্যোগী, উৎসাহী ও শিক্ষিত লোকেরা যদি ইহা আবাদ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, ইহা নিশ্চিত আবাদ হইতে পারে।" তৎপরে তিনি ক্ষেত্রবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, আপনি কি ইহা গভর্ণমেণ্টের নিকট বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া আবাদ করিতে ও ইহাতে প্রজা বসাইতে পারেন না ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আপনার অনুগ্রহদৃষ্টি থাকিলে নিশ্চয়ই পারি ; তবে ইহা বহুব্যয়সাধ্য ও পরিশ্রমসাপেক্ষ। সুবিধামত বন্দোবস্ত করিয়া দিলে, আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।"

সাহেব বলিলেন "আচ্ছা, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব। আপনি মার্চ্চ মাসে পুরুলিয়ায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, আর সেই সময়ে আপনার কার্পাস ফসল কি রকম হয়, তাহাও আমাকে জানাইবেন। আর একটী কথা আপনাকে আমার বলিবার আছে। তাহা এই—আলু ও কার্পাসের চাষ আপনি আপনার প্রজাদিগকে শিখাইবেন ও তাহাদিগকেও তাহা আবাদ করিতে উৎসাহিত করিবেন।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তাহাই করিতেছি। প্রজারা আলুর চাষ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছে এবং আগামী বৎসর অনেকেই আলুর চাষ করিবে। আপনি আগামী বৎসর এই সময়ে মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে আসিলে, তাহা স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবেন। কার্পাস যদি উত্তমরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, তাহারা তাহাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আবাদ করিবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সাহেব বল্লভপুর হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় হাসিয়া সতীশবাবুকে বলিলেন "সতীশবাবু, আপনি বোধ করি অদ্য আপনার বন্ধুর গৃহেই আতিথ্য স্বীকার করিবেন। আচ্ছা, কাল প্রাতঃকালে আমার সহিত ডাক-বাঙ্গালায় আবার সাক্ষাৎ হইবে।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সৌদামিনীর পিসীমাতা আসিয়া স্বয়ং রন্ধন করিয়াছিলেন। সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া উভয়ে কাছারীবাটীতে প্রত্যাগত হইলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর স্নানাহার সমাপন করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আহারের পর দুই বন্ধুতে বসিয়া অনেক বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। বল্লভপুরে অদ্য ডেপুটী কমিশনার সাহেবের আগমনের উল্লেখ করিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন "ক্ষেত্তর, সাহেব আজ তোমার কৃষিকাজ দেখে অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছেন। নন্দনপুর মৌজাটি বন্দোবস্ত করে নেবার জন্য তিনি নিজেই তোমাকে অনুরোধ কর্‌লেন। এ ভালই হ'ল। তুমি ঐ মৌজাটি বন্দোবস্ত ক'রে নিতে ইতস্ততঃ ক'রো না। যা'তে সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়, তার চেষ্টা আমিও কর্‌ব। ঐ মৌজাটি হস্তগত হ'লে, তোমার আর ভাবনা কি? তুমি যদি কালক্রমে ক্রোড়পতি হও, তাও বিচিত্র নয়। মার্চ্চমাসে তুমি পুরুলিয়াতে নিশ্চয় যেও। এমন মাহেন্দ্রযোগ আর পাবে না। এ সুযোগ কিছুতেই ছেড়ো না।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "মার্চ্চ মাসটি হচ্ছে চৈত্রমাস। ফাল্গুন মাসে তোমার বিয়ে হ'বে। সেই সময়ে তো তুমি ছুটীতে থাক্‌বে। তুমি না থাক্‌লে, বন্দোবস্ত করে নেবার তেমন সুবিধা হ'বে কি?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "আরে, ভাই, ছুটী নিলেও আমি ফাল্গুন মাসেই নেবো। চৈত্র মাসে আমি এসে পড়্‌ব। তার জন্য ভাবনা কি? কথা হ'চ্ছে যে, তুমি এই মাহেন্দ্রযোগ ছেড়ো না। সাহেব তোমার উপর খুব সন্তুষ্ট।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তা বেশ; তাই করা যাবে। তুমি তো বড় জোর এক মাসের ছুটী নেবে। তুমি আমার পত্র পেয়েছ, বোধ হয়। ১৫ই ফাল্গুন তারিখে তোমার বিয়ের দিন অবধারিত হয়েছে। তুমি বিয়ে করে বৌ নিয়ে পুরুলিয়ায় যাবে, না দেশে যাবে?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "দেশেই যাব, স্থির করেছি। আমার পিস্তুতো ভাই, রজনী দাদারও মত তাই। দেশেই পাকস্পর্শ—না, বৌ-ভাত—তোমরা কি বল?—তাই কর্‌তে হ'বে। জ্ঞাতিদের সন্তুষ্ট কর্‌তে হ'বে। নতুবা তাঁরা একটা ছল ধ'রে নানারূপ গোল বাধাতে পারেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাদেরই পাণ্টীঘর বটে; কিন্তু দেশের সঙ্গে তাঁরা অনেক দিন সম্পর্ক ছেড়েছেন। এই জন্য, এখানে বিয়ে করা সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি। আর তুমি ঠিক্‌ই বলেছিলে—সকলেই বলেন 'বিয়ে কর্‌বে তো দেশে কর; অত দূরে বিয়ে কর্‌বে কেন?' তবে আমি নিজে মেয়ে দেখে পছন্দ করেছি বলে, আর বেশী কথা কেউ বল্‌লেন না। কিন্তু পাকস্পর্শ দেশেই কর্‌তে হবে। আমি আমাদের বাড়ীখানা মেরামত কর্‌বার বন্দোবস্ত করে এসেছি। অলঙ্কারপত্রও গড়াতে দিয়ে এসেছি। সাদা সাফ্‌টা রকমেরই অলঙ্কার। ছোট ক'নে হ'লে অন্য রকম ব্যবস্থা কর্‌তে হ'ত। রজনী দাদা নিজেই অলঙ্কারের ফর্দ্দ প্রস্তুত করেছেন।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ফর্দ্দে কি কি অলঙ্কার ধরা হয়েছে?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "আমার সব মনে নেই। তবে যতদূর স্মরণ হয়, তোমায় বল্‌ছি :—বালা, অনন্ত, চুড়ী, ডায়মণ্ডকাটা তাবিজ, হার, চিক্, এয়ারিং, মাথার কাঁটা, ফুল, চিরুণী, নেক্‌লেস্ (সেটিকে আবার টায়েরাও করা যেতে পারে)—এই সব আর কি।"

সেই সময়ে তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগের জানালাতে ঠক্ ঠক্ শব্দ শ্রুত হইল। শব্দ শুনিয়াই ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "কে রে? ভেতরে কে রয়েছে?"

জানালাতে আবার ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল। ক্ষেত্রনাথ যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "কে ঠক্ ঠক্ শব্দ কর্‌ছিস্, বল্ না?"

কোনও উত্তর নাই। তৎপরিবর্ত্তে আবার ঠক্ ঠক্ ঠক্ শব্দ!

ক্ষেত্রনাথ এইবার ক্রুদ্ধ হইয়া ভিতরে উঠিয়া গিয়া বলিলেন "ওঃ! তুমি? আমি মনে করেছিলাম, আর কেউ বুঝি?" তার পর ঈষৎ অমুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন "কি বল্‌ছ?"

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন "কি আর বল্‌ব, সতীশ-বাবুকে বল, যে-সব গয়না গড়াতে দেওয়া হয়েছে, তা বেশ হয়েছে। কিন্তু কোমরের জন্য একছড়া সোনার

গোট, নাকের জন্য ভাল দামী মুক্তোর একটী ছোট নথ, আর পায়ের জন্য ভারী মল চার গাছা চাই।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আরে ছেঃ! ধেড়ে মেয়ের পায়ে আবার চারগাছা মল!"

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন "ধেড়ে মেয়ে হ'ল তো কি হ'বে? বিয়ের ক'নে তো? এখন মল্ পর্‌বে না তো আর কখন পর্‌বে? সতীশবাবুকে বল, মল দিতেই হ'বে।"

ক্ষেত্রনাথ একটু হাসিয়া বিদ্রূপসূচক স্বরে বলিলেন "কেন? পায়ে বেড়ী না পড়্‌লে তোমারা বুঝি পোষ মান না?"

মনোরমা ক্ষেত্রনাথের কথায় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "আ মরি! কথার কি ছিরি, দেখ! যা হয়, তোমরা কর গে। আমি আর কিছু বল্‌ব না।" এই বলিয়া মনোরমা অভিমানভরে সেখান হইতে যাইতে উদ্যত হইলেন।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "ওগো, থাম, থাম; রাগ কর্‌ছ কেন? মল দেবার জন্য আমি সতীশকে বল্‌ছি।"

কিন্তু সতীশকে বলিবার পূর্ব্বেই, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "ক্ষেত্তর, নগিনের মাকে চটাও কেন? আমি তোমায় বল্‌তে ভুলে গেছি; চার গাছা মলেরও বরাত দেওয়া হয়েছে। তবে নথ আর গোট গড়াতে দেওয়া

হয় নাই। তা গড়াবার জন্য আমি কালই পত্র লিখে দেব।"

সতীশচন্দ্র অন্তরাল হইতে এইরূপে মাঝখানে পড়িয়া দম্পতিকলহ মিটাইলেন। মনোরমা ঈষৎ হাসিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "শুন্‌লে?" এই বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তোমারই জিত।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রের নিকটে আসিলে, সতীশচন্দ্র বলিলেন "কি হে ভায়া, গৃহিণীর সঙ্গে তো খুব ঝগড়া লাগিয়েছিলে?"

ক্ষেত্রনাথ যেন একটু বিমর্ষের ভাণ করিয়া বলি-লেন "ঝগড়া তো লাগিয়েছিলাম; কিন্তু ঝগড়ায় যেমন চিরকাল হেরে থাকি, আজও সেইরূপ হার হ'ল।"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বললেন "তোমার জন্য বাস্তবিক আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আমার জন্য :আর দুঃখ ক'রে কাজ নাই। এর পর নিজের জন্য ঐ জিনিষটা সঞ্চয় ক'রে রাখ। বুঝ্‌লে, ভায়া, ওদের না হ'লেও সংসার চলে না; আর ওদের পেরে উঠ্‌বারও যো নাই। এমনি চিজ্‌! যেটি ধর্‌বে, তা ছাড়বে না। আর যা মনে কর্‌বে, তা হবেই হ'বে।"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "থাম, থাম। গৃহিণীর উপর

বড় অন্যায় মন্তব্য প্রকাশ করা হ'চ্ছে।—মা কালীর পদতলে শিবঠাকুরকে প'ড়ে থাকৃতে দেখেছ তো? আমি সেদিন তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পড়্‌ছিলাম। লেখক বলেছেন, শিব পুরুষ আর কালী প্রকৃতি। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগেই এই বিচিত্র বিশ্বলীলা। কিন্তু পুরুষ নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। পুরুষের নিষ্ক্রিয়ত্ব দেখাবার জন্যই শিব ধরাতলে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত; আর প্রকৃতির ক্রিয়াশীলত্ব দেখাইবার জন্য কালী রণ-রঙ্গিণী। বুঝ্‌লে ভায়া?"

ক্ষেত্রনাথ গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিলেন "বুঝ-লাম। তোমার ঐ শিবঠাকুরটি আর আমাদের স্বয়ং কৃষ্ণঠাকুরটি পুরুষগুলাকে চিরকালের জন্য মাটী ক'রে গেছেন। একজন তো পদতলে প'ড়েই রইলেন; আর একজন বল্‌লেন 'দেহি পদপল্লবমুদারম্।' শুধু তাই নয়, আরও বল্‌লেন :—

'যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চলি যাতা,
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইও মঝু গাতা।'

ব্যাপার বোঝ! ঠাকুরেরা যখন এই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন, তখন ক্ষুদ্র মানুষের কথা ছেড়ে দাও।"

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয় উঠিলেন। বলিলেন "যখন এমন নজীর রয়েছে, তখ আর দুঃখ করা কেন? আচ্ছা, এখন থাক্ এ সব কথা—

বেশ কথা আমার মনে হয়েছে। পুরুলিয়া জেলা স্কুলের এই নূতন সেশন্ আরম্ভ হয়েছে। তোমার সুরেনকে এই সময়ে পাঠিয়ে দাও। আমি তাকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেব।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তুমি তো শীঘ্রই ছুটী নেবে। সুরেন থাক্‌বে কোথায়?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "কোথায় থাক্‌বে?—আমার বাসায় হে। বাসায় বামুণ চাকর সবই থাক্‌বে। একটী নূতন সব্‌ডেপুটী এখন আমার বাসায় আছেন। তিনিও থাক্‌বেন। তুমি সুরেনকে শীঘ্র পাঠিয়ে দাও।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "বেশ কথা। আমি একটী ভাল দিন দেখে তাকে নিয়ে যাব। আর অমনি একবার আসানশোল পর্য্যন্ত গিয়ে কয়লার হিসাবও মিটিয়ে আস্‌ব।"

সেই সময়ে বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া সতীশ-চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন "১৫ই ফাল্গুনেই বিবাহ হ'বে। সতীশের কোনও অমত নাই।" তাহা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

বৈকালে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর, সতীশচন্দ্র ক্ষেত্র-নাথের নিকট বিদায় লইয়া সাইকেলে রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে গমন করিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মাঘ মাসের দ্বিতীয় দিবসে একটী শুভদিন দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ সুরেন্দ্রকে লইয়া পুরুলিয়ায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সুরেন্দ্র বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া, মনোরমার মুখখানি সমস্ত দিন ভার-ভার ও বিমর্ষ-ভাবাপন্ন রহিল। মধ্যে মধ্যে তিনি গোপনে অশ্রুমোচন করিয়া অঞ্চলে তাহা মুছিয়া ফেলিলেন। সুরেন্দ্রের জন্মাবধি তিনি তাহাকে একটি দিনের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল করেন নাই। আজ তাহাকে স্থানান্তরে পাঠাইতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। মনোরমার মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন একবার হাত-পা ছড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পারিলে, তাঁহার হৃদয়ের গুরুভার লঘু হয়। কিন্তু কাঁদিলে অমঙ্গল হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি হৃদয়ের কষ্ট হৃদয়েই চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন।

মনোরমা স্বহস্তে সুরেনের তোরঙ্গ সাজাইয়া ও বিছানা গোছাইয়া দিলেন, এবং স্নানাহার সম্বন্ধে তাহাকে নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন। বল্লভপুরে আসিয়া অবধি, সুরেনের লেখাপড়ার সুবিধা ছিল না, এই জন্য তাহার মনে স্ফূর্ত্তির একান্ত অভাব ছিল। এক্ষণে সে স্কুলে পড়িতে যাইতেছে, এই চিন্তায় তাহার মনে বিলক্ষণ আহ্লাদ হইতে লাগিল। কিন্তু যাত্রা করিবার সময়,

তাহার কোমল হৃদয়টি প্রিয়জনগণের সহিত আসন্ন বিচ্ছেদাশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িল। সে কনিষ্ঠা ভগিনী বিভাকে কোলে করিয়া কতবার তাহার মুখচুম্বন করিল; নরুকে সঙ্গে করিয়া একবার পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতে গেল ও তাহাকে দুই চারিটি পুষ্প তুলিয়া দিল। সে নরুকে বলিল "নরু, তুমি আমার জন্য কেঁদ না। আমি তোমার জন্য কলের গাড়ী, ছোট বন্দুক, আর কতকি নিয়ে আস্‌ব। বুঝ্‌লে?"

নরু বলিল "দাদা, তুমি কোথায় যাবে?"

সুরেন বলিল "আমি স্কুলে পড়্‌বার জন্য পুরুলিয়া যাব।"

নরু বলিল "তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

সুরেন বলিল "নরু, তুমি যখন আমার মতন বড় হ'বে, তখন যাবে। এখন বাড়ীতে মার কাছে থাক।"

নরু কাঁদিয়া উঠিল ও বলিল "না, আমি মার কাছে থাক্‌ব না। আমি তোমার সঙ্গে যাব।" নরু পুষ্পোদ্যান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর ভিতর আসিয়া জননীর অঞ্চল ধরিয়া বলিল "মা, আমি তোমার কাছে থাক্‌ব না; আমি দাদার সঙ্গে যাব।" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জননী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া নরুকে ক্রোড়ে লইতে গেলেন। কিন্তু নরু ক্রোড়ে না উঠিয়া তাহার ক্ষুদ্র বাহু

দ্বারা জননীকে আঘাত করিতে করিতে বলিল "না, আমি তোমার কাছে থাক্‌ব না, আমি দাদার সঙ্গে যাব।" জননী ও নরুকে কাঁদিতে দেখিয়া ক্ষুদ্র বিভাও কাঁদিয়া উঠিল; এবং জননীর ক্রোড়ে উঠিবার জন্য তাহার ক্ষুদ্র বাহু দুটী বাড়াইয়া দিল।

এই সময়ে সৌদামিনী সেখানে আসিয়া এই বিচিত্র দৃশ্য দেখিল। সৌদামিনী মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে পারিয়া নরুকে ক্রোড়ে লইয়া বলিল "নরু, তোমার মার কাছে তোমায় থাক্‌তে হ'বে না। তুমি আমার কাছে থাক্‌বে। তোমার দাদা শীগ্‌গীর্ তোমার জন্য কলের ঘোড়া, কলের গাড়ী, কলের হাতী, কত-কি নিয়ে আস্‌বে। বুঝলে?"

নরু অল্প শান্ত হইয়া বলিল "দাদা আর কি আন্‌বে?"

"তুমি যা বল্‌বে, তাই নিয়ে আস্‌বে।"

নরু বলিল "কাকাবাবুর মত একটা গাড়ী?"

সৌদামিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিল "আচ্ছা, তা আন্‌বে।" এই বলিয়া তাহাকে পুষ্পোদ্যানে লইয়া গেল।

যাত্রার সময় উত্তীর্ণ হইবার আশঙ্কা দেখাই. ক্ষেত্রনাথ সকলকে ত্বরা দিতে লাগিলেন। মনোরমা চক্ষুর জল মুছিয়া সুরেনকে কিছু খাওয়াইলেন। ইত্যবসরে গাড়ীতে জিনিষপত্র উত্তোলিত হইল। সুরেন্দ্র পিতাকে, জননীকে, মাসীমাকে, ও নগেন্দ্রকে প্রণাম করিয়া এবং

নরুর জন্য একটা সাইকেল গাড়ী আনিবার, অঙ্গীকার করিয়া পিতার সহিত যানে আরোহণ করিল।

সেইদিন রাত্রি নয়টার সময় ক্ষেত্রনাথ সুরেনের সহিত পুরুলিয়ায় উপস্থিত হইলেন।

সুরেন্দ্র কলিকাতা হইতে আসিবার সময় তাহাদের স্কুল হইতে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট্ লইয়া আসিয়াছিল। তাহা দেখাইয়া সে শুভমুহূর্ত্তে স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইল।

সুরেন্দ্রকে পুরুলিয়ায় রাখিয়া, ক্ষেত্রনাথ আসানশোলে গেলেন এবং সেখানে কয়লার হিসাব মিটাইয়া পুরুলিয়ায় আসিবার জন্য গাড়ীর প্রতীক্ষায় প্লাট্‌ফর্ম্মে পদচারণা করিতে লাগিলেন। সহসা একটী যুবক আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। তাহার বেশ-ভূষায় দৈন্য সূচিত হইতেছিল। গায়ে একটী ছিন্ন কোট, র‍্যাপারখানিও ছিন্ন ও মলিন; পরিধেয় বস্ত্রও মলিন; পায়ের জুতা জোড়াটি জীর্ণ ও হস্তে একটী ছোট পুঁটুলি। মাথার কেশ অনেক দিন কর্ত্তিত হয় নাই। মুখে সামান্য গোঁপের রেখা; বদনমণ্ডল বিশুষ্ক; কিন্তু চক্ষুদুটী উজ্জল ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

যুবক ক্ষেত্রনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি চাও?"

যুবক উত্তরে কি বলিবে, তাহা যেন প্রথমে স্থির

করিতে পারিল না ; পরে বলিল "মশাই, আমি বিপদে পড়েছি।"

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি রকম বিপদ?"

যুবক বলিল "মশাই, আমি এণ্ট্র্যান্স পরীক্ষা পাশ করেছি। কিন্তু অর্থাভাবে আমি আর অধিক পড়্‌তে পারি নাই। পিতার মৃত্যুর পর আমার বিদ্যাশিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য কর্‌তে পারেন, এমন কোন ব্যক্তিকে দেখ্‌তে না পেয়ে, একটী চাকরীর চেষ্টায় আমি নানা-স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার মা আছেন, আর একটী ছোট ভাই আছে। আমি কোনও স্কুলে মাষ্টারী, কোনও আফিসে কেরাণীগিরি, কিম্বা যে-কোনও কাজ হোক্, কিছু একটা কর্‌বার জন্য নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি ও কত দরখাস্ত করেছি। কিন্তু কোথাও চাকরী পাই নাই। আসানশোলের কাছে অনেক কয়লাকুঠী আছে শুনে এখানে চাক্‌রীর চেষ্টায় এসেছিলাম ; কিন্তু এখানেও কোনও চাকরী পেলাম না। সঙ্গে যা পাথেয় ছিল, তা ফুরিয়ে গেছে। আপনাকে বল্‌তে লজ্জা হয়, কিন্তু না ব'লেও থাক্‌তে পারছি না—আজ সমস্ত দিন আমি কিছু খাই নাই। আমি ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌ছি না। কোথায় যাব, কেমন ক'রে যাব, আর কি যে কর্‌ব, তা ঠিক্ কর্‌তে পার্‌ছি না। আপনাকে দেখে সাহস ক'রে আপনার কাছে এলাম। আপনি

দয়া ক'রে কোথাও আমার একটা উপায় ক'রে দিতে পারেন? আমি বেশী বেতন চাই না। খেয়ে প'রে যদি আপাততঃ পাঁচটি টাকাও পাই, তা হ'লেই যথেষ্ট হবে। আমার মা এক জ্ঞাতির বাড়ীতে কাজকর্ম্ম ক'রে কোনও-রূপে জীবন ধারণ কর্‌ছেন। আমি যদি মাসে মাসে তাঁকে পাঁচটি টাকা পাঠাতে পারি, তা হ'লে তাঁর ও আমার ছোট ভাইটির কোনওরূপে প্রাণরক্ষা হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে যুবকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল এবং সে মুখ ফিরাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষেত্রনাথ যুবকের কাহিনী শুনিয়া কিছু বিচলিত হইলেন। তিনিও একদিন দারিদ্র্যের তাড়নায় উন্মত্তের ন্যায় নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। সহসা সেই স্মৃতি তাঁহার মনে জাগরিত হইল। যুবকটি যে বাস্তবিক বিপন্ন হইয়াছে, তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইল। তিনি তাহার নাম ও নিবাস জিজ্ঞাসা করিলেন।

যুবক বলিল "আমার নাম শ্রীঅমরনাথ দাস। আমরা জাতিতে তন্তুবায়। আমার নিবাস নদে জেলার চণ্ডীপুর গ্রামে।"

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার পিতার কি কোনও কাজকর্ম্ম ছিল না?"

যুবক বলিল "না; তিনি কৃষ্ণনগরে একটী কাপড়ের দোকানে চাকরী কর্‌তেন।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আচ্ছা, অমরনাথ, তুমি চাকরীর চেষ্টায় নদে জেলা থেকে এতদূর এসে পড়েছ। কোথাও একটা চাকরীর যোগাড় কর্‌তে পার্‌লে না ?"

যুবক বলিল "মশাই, কল্‌কাতার অনেক আফিসে চাকরীর চেষ্টা করেছি। অনেক আপিসেরই বড় বাবু হয় ব্রাহ্মণ, নয় কায়স্থ, নয় বৈদ্য; আমার জাতির পরিচয় শুন্‌লে, অনেকে চুপ ক'রে থাকেন; অনেকে তখনই ব'লে দেন, এখানে কোনও চাকরী নাই; আবার কেউ কেউ আমার জাতির উল্লেখ ক'রে বলেন, 'যাও, যাও, চাকরী কর্‌তে হবে না; তাঁতে কাপড় বোন'।"

ক্ষেত্রনাথ অমরের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "দেখ, অমরনাথ, তাঁরা ঘৃণা ও বিদ্রূপ ক'রে তোমাকে ওরকম কথা বল্‌লেও মিথ্যা কথা বলেন নাই। তুমি কিছু লেখাপড়া শিখেছ, তা ভালই করেছ। সকলেরই কিছু লেখাপড়া শেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু লেখাপড়া শিখ্‌লেই যে চাকরী কর্‌তে হ'বে, তার কোনও মানে নাই। আপনার জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন কর্‌লে কারও কথা সইতে হয় না। আর অনায়াসে সংসার প্রতিপালনও কর্‌তে পারা যায়।"

অমরনাথ বলিল "মশাই, আপনার কথা ঠিক্। কিন্তু জাতীয়বৃত্তি অবলম্বন কর্‌তে গেলেও বাল্যকাল থেকে সেই বিষয়ে শিক্ষালাভ করা কর্ত্তব্য। আমার সেরূপ

শিক্ষা হয় নাই। অতি যৎসামান্য যা লেখাপ'ড়া শিখেছি, তা'তে চাকরী করা ভিন্ন আর উপায় নাই। যদি স্কুলে না প'ড়ে, তাঁত বুন্‌তেই শিখতাম, তা হ'লে আজ এক মুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার ক'রে আমায় দেশ-বিদেশে বেড়াতে হ'ত না। চাকরী না কর্‌লে, আর ডেপুটী, মুন্‌সেব্, উকীল না হ'লে,—আজকাল কোনও লোকই সম্ভ্রান্ত ব'লে পরিচিত হন না। পিতামাতা সেই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে, ছেলেকে সম্ভ্রান্ত কর্‌বার জন্য স্কুলে পড়ান। ছেলেরও জীবনের লক্ষ্য কোন একটা ভাল চাকরী করা! এইজন্য সকলেই জাতীয় বৃত্তিকে ঘৃণা করেন। ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা ও পৌরোহিত্য কর্‌তে লজ্জা বোধ করেন। বৈদ্য চিকিৎসা-বিদ্যায় মন দেন না; কৃষক লাঙ্গল ধরে না; তাঁতী কাপড় বোনে না; আর কামার, কুমার, ছুতার—সকলেই অল্পবিস্তর লেখা পড়া শিখে চাকরীর জন্যই লালায়িত হয়। আমি যে এসব কথা না ভেবেছি, তা নয়; কিন্তু দেশের হাওয়া বদ্‌লে না গেলে,—প্রত্যেক জাতীয় বৃত্তিকে গৌরবের চক্ষে না দেখ্‌লে,—আমার মতন হতভাগ্যের সংখ্যা দেশে দিন দিন বাড়্‌বে বই কম্‌বে না।"

অমরনাথ অল্পবয়স্ক হইলেও, তাহার মুখে এই-সকল কথা শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ কিছু বিস্মিত হইলেন। দারিদ্র্যের কঠোর পীড়ন যে তাহাকে চিন্তাশীল করিয়াছে,

তদ্বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তিনি অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোন্ ডিভিজানে এণ্ট্রান্স্ পাশ করেছিলে?"

অমর বলিল "সেকেণ্ড ডিভিজানে; এই আমার সার্টিফিকেট্ দেখুন।" এই বলিয়া পুঁটুলি হইতে তাহার সার্টিফিকেট্ বাহির করিয়া ক্ষেত্রবাবুকে দেখাইল।

ক্ষেত্রনাথ সার্টিফিকেট্ দেখিয়া বলিলেন "দেখ, অমর, আমি তোমাকে বিশেষ কিছু সাহায্য কর্‌তে পার্‌ব না। তবে, তুমি খাওয়া-পরা ব্যতীত এখন যদি পাঁচটি টাকা পেলেই সন্তুষ্ট হও, তা হ'লে তোমাকে একটী কাজ দিতে পারি। তুমি আমার একটী ছেলেকে পড়াবে, আর যখন যা কাজ হয়, তাই কর্‌বে। এতে কি তুমি সম্মত আছ?"

অমরনাথ অন্ধকারের মধ্যে যেন আলোক দেখিতে পাইয়া বলিল "মশাই, এতেই আমি সম্মত আছি। আপনি দয়া ক'রে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।"

খাবারওয়ালার নিকট খাবার কিনিয়া খাইবার জন্য ক্ষেত্রনাথ তাহাকে কিছু পয়সা দিয়া তাহার জন্য একখানা টিকিট্ কিনিলেন এবং প্লাটফর্ম্মে গাড়ী লাগিবামাত্র উভয়ে তাহাতে উঠিয়া বসিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বল্লভপুর গ্রামে কোনও পাঠশালা, স্কুল বা পোষ্ট আফিস ছিল না। ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে আসিয়া অবধি একটী পাঠশালা ও একটী ডাকঘরের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই দুইটী স্থাপন করিবার কোনও সুযোগ করিতে পারেন নাই। আসানশোল ষ্টেশনে অমরনাথের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে পাঠশালা ও পোষ্টআফিস স্থাপনের আশা তাঁহার মনে জাগরিত হইল। নরু এতদিন সুরেন্দ্রের কাছেই ছিল; কিন্তু সুরেন্দ্র পুরুলিয়ায় আসাতে নরু একেবারে সঙ্গীহীন হইয়াছে। তাহাকে সর্ব্বদা কাছে রাখিতে ও অল্প অল্প লেখাপড়া শিখাইতে একটী লোকের প্রয়োজন। এই-সমস্ত কথা ভাবিয়া ক্ষেত্রনাথ অমরকে সঙ্গে লইলেন।

পুরুলিয়ায় সতীশচন্দ্রের বাসায় আসিয়া ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে অমরের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং নিজ মনোগত ভাব ও আশা ব্যক্ত করিলেন। সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের কথা শুনিয়া বলিলেন "চমৎকার হয়েছে। তুমি আপাততঃ একটী পাঠশালা স্থাপন কর। যাতে পাঠশালাতে মাসে মাসে কিছু সরকারী সাহায্য হয়, তার জন্য আমি স্কুলের ডেপুটী ইন্স্‌পেক্টার এবং ডেপুটী

কমিশনার্ সাহেবকেও বলব। পাঠশালাটি স্থায়ী হ'লেই, তার সংলগ্ন একটী ডাকঘরও স্থাপিত হবে। তারও ভার আমার উপর রইল। আমি পোষ্টাল্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ সাহেবকে ব'লে তার ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌ব ব'লে আশা করি।"

পরদিন পুরুলিয়ার মনোহারী দোকান হইতে নরু ও বিভার জন্য দুই চারিটি ক্রীড়নক ও পুতুল ক্রয় করিয়া ক্ষেত্রনাথ অমরকে সঙ্গে লইয়া বল্লভপুর যাত্রা করিলেন। বল্লভপুরে উপনীত হইয়া তিনি মনোরমাকে অমরনাথের পরিচয় দিলেন। অমর ও নগেন্দ্র প্রায় সমবয়স্ক। সুতরাং উভয়ের মধ্যে শীঘ্র সদ্ভাব স্থাপিত হইল। মনোরমারও তাহার প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ হইল। নরুও তাহার সহিত অনতিবিলম্বে আলাপ করিয়া লইল।

কাছারীবাড়ীর সম্মুখে সাহেবদের আস্তাবল, গুদাম, বাবুর্চ্চিখানা, খানসামাদের থাকিবার ঘর প্রভৃতি কয়েকটি ঘর ছিল। কিন্তু সেগুলি সংস্কারাভাবে অব্যবহার্য্য হইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ মনে করিলেন, এই ঘরগুলির সংস্কার হইলে, ইহাদের মধ্যে একটীকে পাঠশালাগৃহে, আর একটীকে ডাকঘরে ও অপর ঘরগুলিকে গুদামে পরিণত করা যাইতে পারে। ঘরগুলির সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত, আপাততঃ তাঁহার বৈঠকখানার বারাণ্ডাতেই পাঠশালা স্থাপন করা যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তা

করিয়া তিনি একদিন গ্রামের মণ্ডল ও বিশিষ্ট লোক-দিগকে কাছারীবাড়ীতে আহ্বান করিলেন ও তাহা-দিগকে তাঁহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। গ্রামে একটী পাঠশালা ও একটী ডাকঘরের যে অভাব আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিলেন। পাঠশালায় পড়িবার যোগ্য বালকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ জন অব-ধারিত হইল। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতেও দশ পনর জন বালক আসিতে পারে। ডাকঘর স্থাপিত হইলে, বল্লভপুর, মাধবপুর, কালপাথর, সোনাডাঙ্গা প্রভৃতি পনর ষোলটি গ্রামের লোকের সবিশেষ সুবিধা হইবে। কিন্তু প্রজাগণ নিবেদন করিল যে, পাঠশালা স্থাপিত হইলে, তাহারা মাসে মাসে ছেলেদের বেতন দিতে পারিবে না; তবে যখন ধান্য হইবে, তখন তাহারা অবস্থানুসারে কেহ এক মণ, কেহ দুই মণ, এবং কেহ বা অর্দ্ধমণ ধান্য দিতে পারিবে। কে কত ধান্য দিবে, তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত হইলে দেখা গেল যে গ্রাম হইতে শিক্ষকের বেতন স্বরূপ প্রায় পঞ্চাশ মণ ধান্য আদায় হইবে। সকলেই নিজ নিজ অংশের ধান্য সেই বৎসর হইতেই দিতে স্বীকৃত হইল। এইরূপে সকল কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলে ফাল্গুন মাসে সরস্বতী পূজার দিনে পাঠশালা স্থাপনের সঙ্কল্প হইল।

এদিকে পাথর ও ঘুটিম পোড়াইয়া প্রচুর চুন এবং ভগ্ন

ইষ্টক চূর্ণ করাইয়া প্রচুর সুরকী সংগৃহীত হইলে, ক্ষেত্রনাথ পুরুলিয়া হইতে ছয়জন রাজমিস্ত্রী আনাইলেন, এবং এক এক দিকের খুঁটির প্রাচীর উঠাইয়া, সেই দিকে ইষ্টকের পাকা প্রাচীর গাঁথাইতে লাগিলেন। সেই দিকের প্রাচীর সম্পূর্ণ হইলে, আবার অপর দিকের প্রাচীর গাঁথাইলেন। এইরূপে ক্ষেত্রনাথের অন্তঃপুর ও খামার-বাটীর চারিদিকেই উচ্চ পাকা প্রাচীর হইল। রান্নাঘরটি কাঁচাঘর ছিল; তাহাও তিনি পাকা করিয়া লইলেন। পুষ্পোদ্যানের দুই পার্শ্বে দুইটী পাকা পায়খানাও প্রস্তুত করাইলেন। এই-সমস্ত প্রস্তুত হইলে, তিনি আস্তাবল ও বাবুর্চ্চিখানা প্রভৃতির সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। বাবুর্চ্চিখানার গাঁথুনি পাকা ছিল; ছাদও মজবুৎ ছিল। কেবল দুই এক স্থানে দুই একটী জানালা ফুটাইতে হইল মাত্র। এই ঘরগুলির সংস্কার সম্পূর্ণ হইলে, সেগুলি দেখিতে সুন্দর হইল। বলাবাহুল্য, এই-সমস্ত কার্য্যে নগেন্দ্র, অমরনাথ ও লখাই সর্দ্দার ক্ষেত্রনাথকে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিল। ইষ্টকাদি প্রস্তুত করিতে ও গৃহসংস্কার সম্পূর্ণ করিতে ক্ষেত্রনাথের প্রায় চারিশত টাকা খরচ হইল। এদেশে সকল দ্রব্যই সুলভ এবং জনমজুরের বেতনও সামান্য বলিয়া এত অল্প খরচে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই-সমস্ত কার্য্য শেষ করিতে সমগ্র মাঘ মাস এবং ফাল্গুন মাসেরও এক সপ্তাহ লাগিল।

ইতিমধ্যে, ৩রা ফাল্গুন তারিখে বসন্তপঞ্চমী ও শ্রীশ্রী ৺সরস্বতীপূজা উপস্থিত হইল। নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামের কারিগর দ্বারা সরস্বতীদেবীর একটী প্রতিমা গঠিত হইয়া বল্লভপুরে আনীত হইল। ক্ষেত্রনাথ গ্রামের বালকগণকে সরস্বতীপূজা দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সাহেবদের অধ্যুষিত গৃহে হিন্দুদেবতার পূজানুষ্ঠান করা সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করায়, কাছারীবাড়ী ও বাবুর্চ্চিখানার মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ মাঠে একটী কাঁচাঘর ও তাহার সম্মুখে একটী ছান্‌লা প্রস্তুত করা হইল, এবং সেই গৃহের মধ্যে দেবী-প্রতিমা স্থাপিত হইল। মাধবপুর হইতে মাধবদত্ত মহাশয় ও তাঁহার ছেলেমেয়েরা নিমন্ত্রিত হইয়া পূজা দেখিতে আসিলেন।

বসন্তপঞ্চমীর প্রত্যুষে কাছারীবাড়ীতে ঢাক বাজিয়া উঠিবামাত্র, গ্রামের বালকেরা স্নান করিয়া ও নববস্ত্র পরিধান করিয়া দলে দলে কাছারীবাড়ীতে উপনীত হইতে লাগিল। কেহ কেহ নিকটবর্ত্তী অরণ্য হইতে রাশি রাশি আরণ্যপুষ্প লইয়া আসিল। কেহ কেহ সবিস্ময়ে প্রতিমা দেখিতে লাগিল; কেহ কেহ লম্ফন ও কুর্দ্দন, কেহ কেহ ঢাকের তালে তালে নৃত্য, এবং কেহ কেহ বা উচ্চ হাস্যধ্বনি করিয়া দেবীমন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী সেই সুবৃহৎ প্রাঙ্গণটিকে মুখরিত করিয়া তুলিল। যথাসময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র আসিয়া দেবীর পূজা করিলেন;

তৎপরে বালকেরা দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিল; সর্ব্বশেষে তাহাদের ভোজনের ব্যবস্থা হইল। লুচি তরকারী ও দধি সন্দেশ খাইয়া বালকদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। গ্রামের লোকেরা, এবং মাধবদত্ত মহাশয়, দত্তগৃহিণী, সৌদামিনী, মনোরমা প্রভৃতি মহিলারা বালকভোজনের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কেবলমাত্র প্রবাসী সুরেন্দ্রনাথের কথা মনে করিয়া মনোরমা এই আনন্দের দিনেও মধ্যে মধ্যে অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিতেছিলেন।

বালকভোজন শেষ হইলে, ক্ষেত্রনাথ বালকদিগকে একত্র বসাইয়া তাহাদিগকে সরল ভাষায় বলিলেন যে, সেই দিন হইতে সেই স্থানে তাহাদের পাঠশালা স্থাপিত হইল। তাহারা যেন প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া পাঠশালায় পড়িতে আসে; তারপর জলখাবারের ছুটী হইবে। জল-খাবার খাইয়া আবার পাঠশালায় আসিবে। মধ্যাহ্নে স্নান করিবার ও ভাত খাইবার ছুটী হইবে। তার পর বিকালে একবার আসিয়া নামতা পড়িয়া ও খেলা করিয়া বাড়ী যাইবে। ক্ষেত্রনাথ পঞ্চাশটি বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ আনাইয়াছিলেন; তাহা তিনি বিদ্যার্থী বালকগণকে একে একে ডাকাইয়া দিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি বলিলেন যে, তাহারা যদি ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখে, তাহা হইলে আগামী বৎসর সরস্বতী পূজার সময়ে

তিনি তাহাদিগকে আরও ভাল ভাল বই পুরস্কার দিবেন। এইরূপ বক্তৃতার পর, ক্ষেত্রনাথ অমরনাথকে দেখাইয়া বলিলেন "ইনি তোমাদের গুরুমহাশয় হইলেন। তোমাদের আর একটী গুরুমহাশয় আসিবেন। তোমরা ইহাঁদিগকে খুব ভক্তি করিবে। এখনই তোমরা ইহাঁকে প্রণাম কর।" বালকেরা ক্ষেত্রনাথের উপদেশানুসারে স্ব স্ব স্থানে বসিয়াই করজোড়ে মাথা নোঙাইয়া তাহাদের নবীন গুরুমহাশয়কে প্রণাম করিল।

সভাভঙ্গের পর বালকেরা তাহাদের দেশীয় ক্রীড়া ও কুস্তী দেখাইল। সন্ধ্যার সময় দেবীর আরত্রিক দেখিয়া তাহারা আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রী৺সরস্বতীপূজা ও পাঠশালা স্থাপনের উৎসবে ক্ষেত্রনাথের প্রায় পঞ্চাশ টাকা খরচ হইয়া গেল। হউক, কিন্তু তজ্জন্য ক্ষেত্রনাথ দুঃখিত হইলেন না। তিনি মনোরমাকে বলিলেন "আমরা এই দেশে এসে বাস করেছি। এদেশের লোকের অজ্ঞতা, অসভ্যতা ও দূষিত রীতিনীতি দেখে সময়ে সময়ে আমার হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হয়। জ্ঞানালোকের অভাবে এদেশের লোকেরা কোনও উন্নতিলাভ কর্‌তে পারে নাই। এই-সব অসভ্যদের মধ্যে বাস কর্‌লে আমাদের ছেলে মেয়েরাও ক্রমে ক্রমে অসভ্য হ'য়ে পড়বে। সকলে যদি ভাল থাকে, আমরাও ভাল থাক্‌তে পার্‌ব। এইজন্য এখানে একটী পাঠশালা স্থাপন করা বিশেষ আবশ্যক মনে কর্‌লাম। অমরকেই এখন পাঠশালার পণ্ডিত নিযুক্ত করা হ'ল। খাওয়া-পরা ব্যতীত অমরকে মাসে মাসে পাঁচটি টাকা দিতে আমি স্বীকৃত হয়েছি; কিন্তু তাতে তার বেশী দিন চল্‌বে না। সে হয়ত আর কোথাও একটী ভাল কাজ পেলে চ'লে যাবে। তখন নরুকে পড়াবার জন্য আবার একটী লোক নিযুক্ত কর্‌তে হ'বে। কিন্তু অমর খাওয়া-পরা ব্যতীত যদি আমার কাছে মাসে মাসে পাঁচটি টাকা পায়, আর পাঠশালা থেকেও

কিছু পায়, আর এখানে একটী ডাকঘর খুল্‌লে যদি তার থেকেও কিছু পায়, তা হ'লে হয়ত সে এখানে কিছু দিন থাক্‌তে পারে। তা না হ'লে, সে নিশ্চয়ই চ'লে যাবে। এই কারণে, একটী পাঠশালা স্থাপন কর্‌বার জন্য আমি পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'র্‌তে ইতস্ততঃ কর্‌লাম না।"

মনোরমা বলিলেন "এখানে একটী পাঠশালা খুলে তুমি ভাল কাজই করেছ। কিন্তু এ বৎসর তো তোমার অনেক টাকা খরচ হ'য়ে গেল। গাই-গরু-মোষ কেনা, ধান-চাল-কলাই কেনা, চাষের খরচ, ইট পোড়ানো, প্রাচীর দেওয়া, রান্নাঘর পায়খানা তৈয়ের করা, বন্দুক কেনা, চাকর মুনিষের বেতন, এই সরস্বতী পূজা, তারপর বাড়ীর খরচপত্র—এই সকলে তোমার অনেক টাকা খরচ হ'য়ে গেছে।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "এই সকল বিষয়ে প্রায় চৌদ্দ-শ টাকা খরচ হ'য়ে গেছে। কিন্তু যেমন খরচ হয়েছে, তেমনই আয়ও হয়েছে। তিনটি মরাইয়ে প্রায় ছয়-শ মণ ধান মজুত আছে। তার দাম বার-শ টাকা। পঁচাত্তর মন কলাইয়ের দাম দেড়-শ টাকা, ত্রিশমণ অড়হরের দাম ষাইট্‌ টাকা, বাইশ মণ মুগের দাম প্রায় ষাইট্‌ টাকা, দেড়-শ মণ আলুর দাম প্রায় তিন-শ টাকা। এই মোট সতের আঠার-শ টাকা মূল্যের ফসল উৎপন্ন হয়েছে।

এসব ছাড়া মাঠে এখনও গম, যব, ছোলা, সর্ষে, গুঞ্জা ও কাপাস রয়েছে। এই সকলেও চার পাঁচ-শ টাকা হ'তে পারে। তা হ'লে আমাদের প্রায় বাইশ শ টাকার ফসল হবে। এছাড়া প্রজাদের নিকট থাজনাও প্রায় তিন-শ টাকা আদায় হবে। তা হ'লে এবছর আমাদের আয় প্রায় আড়াই হাজার টাকা হবে।"

মনোরমা বলিলেন "যদি আড়াই হাজার টাকা হয়, তা হ'লে খরচ বাদে লাভ এগার-শ টাকা থাকে।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "প্রথম দৃষ্টিতে দেখ্‌লে তাই মনে হয় বটে ; কিন্তু প্রকৃত কথা তা নয়। এবৎসর এগার-শ টাকার অধিক মুনাফা থাক্‌বে না সত্য ; কিন্তু আগামী বৎসরে, এ বৎসরের মতন তো খরচ হ'বে না। আমাদের গরু-মোষ আছে, তা কিন্‌তে হবে না ; ধান-চা'ল-কলাইও কিনতে হবে না, বন্দুক কিন্‌তে হবে না, আর বাড়ী মেরামতও কর্‌তে হবে না। এই সকলেই যে এবৎসর প্রায় হাজার টাকা খরচ হ'য়ে গেছে। এই টাকাটা আগামী বৎসরে বাঁচ্‌তে পারে—অবশ্য যদি ফশল ভাল হয়। কেননা, ভাল ফশল হওয়ার উপরেই সব নির্ভর কর্‌ছে। তোমার সংসারের জন্য প্রায় কিছুই কিন্‌তে হবে না। ঘরে ধান, চা'ল, কলাই, অড়হর, মুগ আছে। তেলের জন্য সর্ষে গুঞ্জা আছে। বাড়ীতে তোমার ছয় সাত সের দুধ হয়। দুধও কিন্‌তে

হবে না। দুধের সর থেকে, আর দই জমিয়ে তুমি তো প্রত্যহই মাখন ও ঘী তৈয়ের কর। তাই আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে প্রচুর। জ্বালানী কাঠ কিন্‌তে হবে না; তা জঙ্গল থেকে কেটে আন্‌লেই হবে। তোমার তরকারী-বাগানে যথেষ্ট তরকারীও হয়। আলুও এ বৎসর অনেক হয়েছে। কিন্তু আমরা ঘর-খরচের মতন আলু রেখে অবশিষ্ট আলু বেচে ফেল্‌ব। কেননা, আলু শীঘ্র নষ্ট হ'য়ে যায়। এবৎসর ক্ষেত্রে গম হয়েছে। সুতরাং গমও কিন্‌তে হবে না। তোমার মোষ-গরুর জন্য খড় আর বিচালী যথেষ্ট রয়েছে। তার পর কলাই গম ছোলার ভূষা আছে। আর সর্‌ষে গুঞ্জা থেকে খইলও যথেষ্ট হবে; তা গরু-মোষে খাবে। আমাদের চাষ থেকে প্রায় সবই উৎপন্ন হয়েছে। হয় নাই কেবল আক। তাও লখাই এবৎসর আবাদ কর্‌বে বলেছে। আমাদের কেবল গুড়, চিনি, নুন, মশলা কিন্‌তে হবে। আর কাপড়-চোপড়ও অবশ্য কিন্‌তে হবে। তা'তে আর খরচ কত? বছরে বড় জোর একশ টাকা। তার উপর চাকর কামীনদের বেতন, অমরের বেতন, আর পূজা ইত্যাদিতে খরচ—এই সকলে বড় জোর চারশ টাকা খরচ হবে। আগামী বৎসর সর্ব্বসমেত যদি আড়াই হাজার টাকা আয় হয়, তা হ'লেও চারশ টাকা বাদ দিলে তোমার একুশ শ টাকা লাভ থাক্‌বে।"

মনোরমা বলিলেন "এবৎসর যে এত ধান কলাই অড়হর হয়েছে, তা সমস্তই কি রাখ্‌বে ?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তুমি চমৎকার গৃহিণী তো ? অত রেখে কি হবে ? কিন্তু ধান সমস্ত রাখ্‌ব ; ধান এখন হাত-ছাড়া করা হবে না। ধানই লক্ষ্মী। ধান আগামী বৎসরে কি রকম হবে, তা তো জানি না। যদি অজন্মা হয়, তা হ'লে ঘরে লক্ষ্মী থাক্‌লে অন্নের কষ্ট হবে না। ধান ছাড়া, কলাই, ছোলা, অড়হর, মুগ, গম, যব—এই-সকল কেবল বাড়ীর খরচের মতন রেখে বাকী সব বেচে ফেল্‌ব। আমি ঠিক্ করেছি, কলাই পঞ্চাশ মণ, অড়হর বিশ মণ, মুগ পনর মণ, আলু সোয়া শ মণ, আর খরচের মতন গম, যব, সরষে, গুঞ্জা রেখে অবশিষ্ট সব বেচে ফেল্‌ব। কাপাসও বেচে ফেল্‌ব। এখন জিনিষের দর কিছু নরম আছে। দর একটু চড়্‌লেই বেচ্‌তে আরম্ভ কর্‌ব। ঐ যে গুদাম-ঘর মেরামত কর্‌লাম, তা কি জন্য ? এই সব জিনিষ ধ'রে রেখে দেবো ব'লে। বুঝ্‌লে ?"

মনোরমা জিজ্ঞাসা করিলেন "এই সমস্ত বেচে যা টাকা পাবে, তা কি কর্‌বে ?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তা বুঝতে পার্‌লে না ? আগামী বৎসর যে চার শ টাকা খরচ হবে, সেই টাকাটি রেখে অবশিষ্ট টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেব।"

মনোরমা বলিলেন "ব্যাঙ্কে তোমার আর কত টাকা জমা আছে ?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তা এখন জেনে কাজ নাই। যা আছে, তোমাদেরই আছে।"

উত্তর শুনিয়া মনোরমা অতিশয় ক্ষুণ্ণা হইলেন। তিনি ঝঙ্কার করিয়া বলিলেন "এই জন্যই তো তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই না। আমাদের জন্য টাকা! টাকা কি তোমার নয়, আর তোমার জন্য নয় ?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, আচ্ছা, আমাদেরই টাকা। তুমি টাকার কথা যখন জিজ্ঞাসা কর্‌ছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার একটা মতলব আছে। কি মতলব বল, দেখি ?"

মনোরমা যেন একটু রাগিয়া বলিলেন "আমার আর মতলব কি ? তোমার ছেলে নগিনের জন্যই জিজ্ঞাসা করছিলাম। সে একটা কিছু কাজ করতে চায়। সেই জন্য রোজই আমাকে বলে। আমি তোমাকে এত দিন কোন কথা বল্‌তে সাহস করি নি। তুমি ওকে কিছু পুঁজি দিয়ে একটা কাজকর্ম্ম করে দাও—এই আমার কথা!"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "ও গো, আমি যে সে কথা ভাবি নাই, তা নয়। আরও দিন কতক যাক্, তার পর তোমাকে বল্‌ব। আগে এখানকার অবস্থা ভাল ক'রে বুঝি, তার পর তাকে একটা কাজ ক'রে দেব।"

ত্রয়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্রনাথ ইংরাজী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। তৎপরে পিতার দুরবস্থার সময়ে সে তাঁহার সহকারী রূপে তাঁহার দোকানে বসিত। ক্ষেত্রনাথ নগেন্দ্রকে আরও উচ্চশিক্ষা দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন; কিন্তু দারিদ্র্যের তাড়নে সে অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তথাপি অবসর মত গৃহে তাহাকে লেখা পড়া শিখাইতে তিনি শিথিল-যত্ন হয়েন নাই। নগেন্দ্রনাথ ইংরাজীতে বেশ কথাবার্ত্তা বলিতে পারিত এবং সহজ ধরণের ইংরাজী চিঠিপত্রও লিখিতে পারিত। নগেন্দ্র কার্য্যদক্ষ ও পরিশ্রমী এবং তাহার স্বভাবও পবিত্র ছিল। সকলের সঙ্গে সে মিলিতে মিশিতে পারিত এবং সেই জন্য অল্পদিনের মধ্যে বল্লভপুরে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিল।

ক্ষেত্রনাথের অবস্থা এখন অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছিল। ইচ্ছা করিলে, তিনি নগেন্দ্রকে আরও কিছুদিন স্কুলে ও কলেজে পড়াইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এই কঠোর জীবন-সংগ্রামে নগেন্দ্রই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। নগেন্দ্র না থাকিলে, তিনি কৃষিকার্য্যাদি কিছুই একাকী চালাইতে পারেন না। এই সমস্ত কথা ভাবিয়া তিনি নগেন্দ্রকে সহকারী রূপে আপনার কাছেই রাখা স্থির

করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাতে তাহার মনের এবং চিত্তের কর্ষণ হয়, তদ্বিষয়ে তিনি অমনোযোগী ছিলেন না।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নগেন্দ্র পিতার কাছে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিত। ক্ষেত্রবাবু একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক হইয়াছিলেন; তাহাও সে পড়িত। এক্ষণে অমরনাথ বল্লভপুরে আসায়, সে তাহার সহিত একত্র পুস্তক পাঠ করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইল। উভয়েই অবসর মত বিদ্যার চর্চ্চা করিত।

এই প্রথম বৎসরে, ক্ষেত্রনাথ ও নগেন্দ্র উভয়কেই কৃষিকৌশল অবগত হইবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। অতঃপর আর সেরূপ পরিশ্রম করিতে হইবে না। কেবলমাত্র সকল বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিলেই, অল্প পরিশ্রমে কৃষিকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। ক্ষেত্রনাথ স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিলেই যথেষ্ট হইবে; কেবল মধ্যে মধ্যে নগেন্দ্রের সাহায্য আবশ্যক হইতে পারে। এরূপ স্থলে, অন্য কোনও কার্য্য করিবার জন্য নগেন্দ্রের অবসর থাকিবার সম্ভাবনা।

নগেন্দ্র বল্লভপুরে কোনও একটী কারবার খুলিবার জন্য জননীকে অনেক বার বলিয়াছে। কিন্তু সেদিন ব্যতীত আর কোনও দিন মনোরমা স্বামীর নিকট তৎ-সম্বন্ধে কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সুযোগ না পাইলেও, ক্ষেত্রনাথ যে তদ্বিষয়ে কোনও চিন্তা করেন

নাই, তাহা নহে। ক্ষেত্রনাথ মনে মনে অনেক চিন্তা করিয়াছেন; কিন্তু কি কারবার করিলে সুবিধা হইবে, তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার ভূমিতে উৎপন্ন অতিরিক্ত শস্যসমূহ বিক্রয় করার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়া, তিনি মনে মনে একটী সঙ্কল্প করিলেন। এ দেশের প্রজাবর্গ তাহাদের অতিরিক্ত শস্যাদি নিজ নিজ গোযানে ও শকটে বহন করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে লইয়া যায় এবং সেখানকার আড়তে তাহা বাজার দরে বিক্রয় করে। কিন্তু ক্ষেত্রনাথের পক্ষে তদ্রূপ করা তাদৃশ সুবিধাজনক হইবে না। এই কারণে তিনি স্থির করিলেন যে তিনি অতিরিক্ত শস্যগুলি একটী গুদামে রক্ষা করিয়া পরে উচ্চদরে তৎসমুদায় বিক্রয় করিবেন। তদনুসারে তিনি সাহেবদের পরিত্যক্ত গুদাম ঘর ও বাবুর্চ্চিখানা প্রভৃতির সংস্কার করাইলেন। আস্তাবলটি পাঠশালার জন্য ও খানসামাদের থাকিবার ঘরটি ডাকঘরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

এই প্রদেশের ব্যবসায়ীরা এবং কলিকাতার মহাজনেরাও সময়ে সময়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কৃষকগণের নিকট শস্য ক্রয় করেন। ক্ষেত্রনাথের গুদামে শস্য সঞ্চিত আছে, ইহা জানিলে তাঁহারাও তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবেন। এই উপায়ে শস্য-বিক্রয় হইতে পারে বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা কোনও কারবারের সুবিধা হইবে না।

কারবার চালাইতে হইলে, বল্লভপুরে একটী আড়ত খুলিতে হয়। কিন্তু বল্লভপুরে কোনও গঞ্জ বা বাজার না বসাইলে, আড়ত কিরূপে চলিবে? লোকে বিক্রয়ের জন্য কেন বল্লভপুরে শস্য বহন করিয়া আনিবে? বল্লভপুরে ক্রেতা না থাকিলে আড়ত স্থাপন করা ব্যর্থ হইবে। বল্লভপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে ইছাকোণা গ্রামে সপ্তাহের মধ্যে একদিন হাট বসে। অনেকে সেই হাটে শস্য বিক্রয় করিতে যায়। বল্লভপুরে যদি একটী হাট স্থাপন করা যায়, এবং সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন তাহা বসে, তাহা হইলে এখানেও বহু লোকের সমাগম ও বহু শস্যের আমদানী হইবে। তখন আড়ত খুলিলে, তাহা চলিতে পারে, এবং এই প্রদেশের লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানী করিলে, একটী দোকানও চলিতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষেত্রনাথ তাহার বাটীর সম্মুখবর্ত্তী বৃহৎ মাঠে একটী হাট বসাইবার সঙ্কল্প করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে এক দিন গ্রামের প্রজাবর্গকে আহ্বান করিলেন।

তিনি তাহাদিগকে বলিলেন "আমাদের গ্রামের অনেক অভাব আছে। গ্রামে একটী পাঠশালা ছিল না; তা আমি স্থাপন ক'র্‌লাম। ডাকঘর নাই; যা'তে শীঘ্র একটী ডাকঘর হয়, তা'রও চেষ্টা ক'র্‌ছি। তারপর আমাদের গ্রামে কোনও হাট নাই। জিনিষ-পত্র ও মাল

বিক্রয় ক'র্‌তে হ'লে, তোমরা রেলওয়ে ষ্টেশনে, কিম্বা ইছাকোণার হাটে তা ব'য়ে নিয়ে যাও। বর্ষাকালে কালী নদীতে বান হ'লে, তোমরা ষ্টেশনেও যেতে পার না; তখন ইছাকোণার হাটে যেতে হয়। কিন্তু ইছাকোণা যাবার পথও বড় দুর্গম। এই সমস্ত কারণে আমার মনে হয়, এই বল্লভপুরে যদি একটী হাট স্থাপন করা যায়, তা হ'লে সকলেরই বিলক্ষণ সুবিধা হ'তে পারে। এ বিষয়ে তোমাদের অভিপ্রায় কি, তা আমি জান্‌তে চাই।"

প্রজাবর্গ হাট স্থাপনের প্রস্তাব শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। তাহারা বলিল, বল্লভপুরে একটী হাট হইলে, শুধু বল্লভপুর গ্রামের কেন, নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামের লোকের বিশেষ সুবিধা হইবে। কিন্তু হাট কোন্ স্থানে বসিবে?

প্রশ্নের উত্তরে, ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে কাছারী বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী বৃহৎ মাঠটি দেখাইলেন। সকলেই আহ্লাদ-সহকারে সেই স্থানটি অনুমোদন করিল, কিন্তু বলিল যে হাটের জন্য অনেক ছোট ছোট চালাঘর প্রস্তুত করিতে হইবে। কেননা, গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের সময় এবং বর্ষা-কালে বৃষ্টির সময় লোকের আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজন।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "পাহাড়ের ও জঙ্গলের কাট, বাঁশ, উলুখড় দিতে আমি প্রস্তুত আছি। তোমরা সকলে যদি

সেই সমস্ত কেটে এনে ঘর বাঁধ্‌তে সাহায্য কর, তা হ'লে অনায়াসেই চল্লিশ পঞ্চাশটি ঘর প্রস্তুত হ'য়ে যাবে। কিন্তু তোমরা সাহায্য না ক'র্‌লে, আমি একাকী এত ঘর বাঁধা'তে পার্‌ব না।"

মণ্ডলেরা একবাক্যে বলিল যে, কাঠ, বাঁশ ও উলুখড় পাইলে, তাহারা পরিশ্রম করিয়া ঘর বাঁধিয়া দিবে।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আগামী ১৫ই ফাল্গুন তারিখে আমাদের গ্রামে একটী শুভ বিবাহ হ'বে, তা তোমরা অনেকে শুনে থাক্‌বে। ভট্টচার্য্যি মশাইয়ের কন্যা সৌদামিনীর সহিত আমার বন্ধু পুরুলিয়ার ডেপুটী সতীশবাবুর বিবাহ হ'বে। এই বিবাহটী হ'লে, আমাদের সকলেরই পরম সৌভাগ্য। এখানে ডেপুটী বাবুর শ্বশুর বাড়ী হ'লে, এই গ্রামের ক্রমশঃ অনেক উন্নতি হ'বে। এই বিবাহটি হ'য়ে গেলে, তোমরা হাটের জন্য ঘর প্রস্তুত ক'র্‌বার উদ্যোগ ক'র্‌বে। উপস্থিত, এই বিবাহের সময়, ক'ল্‌কাতা থেকে কয়েক জন ভদ্রলোক আস্‌বেন। কিন্তু আমাদের গ্রামের রাস্তা ঘাট বড় খারাপ। তোমরা সকলে মিলে যদি রাস্তাটি একটু মেরামত ক'র্‌তে পার, তা হ'লে ভাল হয়।"

লুটন সর্দ্দার বলিল, সরকার বাহাদুর রাস্তা মেরামত করিবার হুকুম দিয়াছেন। পুরুলিয়া হইতে ওভারসিয়ার বাবু আসিয়া রাস্তা মাপিয়া গিয়াছেন, আর রাস্তার ধারে

ধারে কাঁকর পাথর ফেলাইতেছেন। গ্রামের অনেক প্রজা আজ দুই তিন দিন হইতে কাঁকর পাথর বহিয়া মজুরী লইতেছে। সেই বাবুটি বলিল যে, ডেপুটী কমিশনার সাহেব রাস্তা মেরামত করিতে হুকুম দিয়াছেন।

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তবে ভালই হ'য়েছে। তোমাদের আর কষ্ট ক'র্‌তে হ'বে না।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সেদিন সভা ভঙ্গ হইল। ডেপুটী বাবুর সহিত সৌদার বিবাহ হইতেছে, ইহা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইল এবং সেই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে গৃহে গমন করিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথের অন্তঃপুরের প্রাচীর রান্নাঘর ও পায়খানার চূন বালির কাজ বাকী ছিল। রাজমিস্ত্রীদিগকে এখন সেই কাজে লাগাইলেন। তিনি অপরাহ্নে তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে নগেন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, সাহেবী-পোষাক-পরা একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক সাইকেলে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন। ক্ষেত্রনাথ তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া সেই ভদ্রলোকটিকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। আগন্তুক বলিলেন "মশায়, আপনারই নাম ক্ষেত্রবাবু? আপনার সহিত আমার পরিচয় না থাক্‌লেও আপনার নাম আমি শুনেছি। আমার নাম হরিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়; আমি পুরুলিয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার। সতীশ বাবু যখন শিবপুর ইঞ্জিনায়ারীং কলেজের কৃষি-বিভাগে পড়্‌তেন, তখন আমিও ঐ কলেজে পড়্‌তাম। তখন থেকেই সতীশের সঙ্গে আমার আলাপ। সে দিন ডেপুটী কমিশনার সাহেব সতীশকে সঙ্গে নিয়ে এই বল্লভ-পুরে এসেছিলেন। বল্লভপুর গ্রামের ভিতর দিয়ে যে রাস্তাটি গিয়েছে, এই রাস্তাটি আমাদের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তার অন্তর্গত নয়; অন্ততঃ এই রাস্তাটি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড থেকে কখনও মেরামত হয় নাই। কাজেই এর অবস্থা

খুব শোচনীয়। সে দিন ডেপুটী কমিশনার সাহেব বল্লভপুর থেকে যেতে যেতে গ্রামের বাহিরে রাস্তার উপর একটী খালের মধ্যে সাইকেল-সুদ্ধ প'ড়ে যান। তা'তে তাঁর কিছু চোটও লেগেছিল। আমিও সাহেবের সঙ্গে রেলওয়ে ষ্টেশনে এসেছিলাম; কিন্তু সে দিন আমি তাঁর সঙ্গে এদিকে না এসে অন্যদিকের রাস্তা দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। সাহেব তো ডাক্‌বাঙ্গালাতে এসেই আমাকে তলব ক'রে বল্লেন 'বল্লভপুরের রাস্তা ভয়ানক খারাপ; এই রাস্তা মেরামত হয় নাই কেন, তার কৈফিয়ৎ দাও।' আমি বল্‌লাম 'ঐ রাস্তাটি এর পূর্ব্বে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে কখনও মেরামত হয় নাই।' সাহেব কি সে কথা শোনেন? তিনি বল্‌লেন 'পূর্ব্বে কখনও মেরামত হয় নাই ব'লে যে আর কখনও মেরামত হ'বে না, তার কোনও কারণ নাই; আমি তোমার কোনও কথা শুন্‌তে চাই না, এক মাসের মধ্যেই আমি রাস্তা মেরামত দেখ্‌তে চাই। আমি মার্চ্চ মাসে আবার বল্লভপুরে যাব, তখন যেন রাস্তা ঠিক্ থাকে।' সতীশ সে দিন আপনার এখানেই ছিল; কাজেই তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নাই; কেননা, সেই দিন বিকালেই আমি স্থানান্তরে যাই। তারপর পুরুলিয়ায় গিয়ে সতীশের সঙ্গে দেখা হ'লে সতীশকে সব কথা বল্‌লাম। সতীশ বল্‌লে 'চমৎকার হয়েছে; সাহেব তোমাকে এক মাসের মধ্যে

রাস্তা তৈয়ের কর্‌তে হুকুম দিয়েছেন; আর আমি তোমাকে হুকুম কর্‌ছি, তুমি পনর দিনের মধ্যে রাস্তা তৈয়ের কর।' আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম 'তোমার এত তাড়া কেন হে?' সতীশ বল্‌লে 'এই ফাগুন মাসে বল্লভ-পুরে আমার বিয়ে। যদি তার আগে রাস্তা তৈয়ের না হয়, তা হ'লে সাহেবের কাছে তোমাকে নাজেহাল কর্‌ব।' মশায়, সতীশের কথা আমি আদবে বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু আজ এখানে রাস্তার কাজ তদারক কর্‌তে এসে আপনার প্রজাদের মুখে শুন্‌লাম যে, আগামী ১৫ই ফাল্‌গুন তারিখে এখানে পুরুলিয়ার ডেপুটীবাবুর বিয়ে হ'বে। সতীশের কথাটা তবে সত্য না কি, মশায়? আমি মনে কর্‌লাম, একবার আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি, আর সংবাদটাও জেনে আসি। ব্যাপার কি, বলুন দেখি?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন "সতীশ আপনাকে সত্য কথাই বলেছে।"

হরিগোপালবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন "অ্যাঁ? বলেন কি, মশায়? সতীশ বিয়ে কর্‌বে? আর শেষ-কালে এই বল্লভপুরে?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "হাঁ, সতীশ এই বল্লভ-পুরেই বিয়ে করবে।"

"ঘট্‌কালী কর্‌লেন কে? আপনি বুঝি?"

"না, আমি করি নাই। সতীশ নিজের ঘটকালী নিজেই করেছে।"

"বটে? যা হোক্, ছোক্‌রার যে শেষকালে সুমতি হয়েছে, এতে আমি বাস্তবিক বড় সুখী হলাম। মশায়, বিয়ে কর্‌তে সতীশকে রাজী কর্‌বার জন্য এর আগে কত লোকে যে কত সাধ্য সাধনা করেছে, তা আপনাকে বলতে পারি না। শেষকালে ছোক্‌রা নিজেই ফাঁদে পা দিয়েছে, দেখ্‌ছি। চমৎকার হয়েছে—কিন্তু একটা কথা আমি আপনাকে ব'লে রাখছি। আমার অনুমান হচ্ছে, সতীশ ভায়া এখানে চুপি চুপি বিয়ে কর্‌তে আস্‌বে। কিন্তু, আমিও রাস্তার তদারকে ঠিক্ সেইদিনে এখানে হাজির হ'ব; আর তার বিয়েতে কিছু বাদ্য ভাণ্ডেরও ব্যবস্থা কর্‌ব।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "মশায় এখানে আস্‌বেন, সে তো আহ্লাদেরই কথা। কিন্তু আমার অনুরোধ, আপনি বাদ্যভাণ্ডের ব্যবস্থাটী কর্‌বেন না। তা হ'লে, সতীশ বিয়ে না ক'রেই পালাবে।"

হরিগোপালবাবু বলিলেন "কেন, মশায়, কাড়া-নাগ্‌রা আর ঢাক-ঢোল না হ'লে কি আর বাদ্যভাণ্ড হয় না? আমি একদল ব্যাগ-পাইপ্ পাঠিয়ে দেব। যা খরচ হবে, তা আমার। (এই বলিয়া হরিগোপালবাবু নিজ প্রশস্ত বক্ষের উপর জোরে করাঘাত করিলেন)।

সতীশ এই বুড়ো বয়সে বিয়ে কর্‌বে, আর বাদ্যভাণ্ড হবে না? আপনি বলেন কি? বাদ্যভাণ্ড আলবাৎ হবে। ব্যাগ্‌পাইপ আমি আন্‌বই আন্‌ব।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "কাড়ানাগরা ও ঢাকঢোল অপেক্ষা ব্যাগ্‌পাইপ অবশ্য সভ্য রকমের বাজনা। কিন্তু সতীশের মত না হ'লে, আমি আপনার ব্যবস্থায় মত দিতে পারি না। শেষকালে সে আমার উপর হাড়ে চটে যাবে, আর একটা গোল বাধাবে। আপনি তো সতীশকে চেনেন?"

হরিগোপালবাবু বলিলেন "তা বিলক্ষণ চিনি। আপনি কোনও চিন্তা কর্‌বেন না। সতীশকে ঠাণ্ডা কর্‌বার ভার আমার উপর রইল। ব্যাগ্‌পাইপ আমি নিশ্চয়ই নিয়ে আস্‌ব।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তা হ'লে আপনার ব্যবস্থা আমি সতীশকে জানাব কি?"

হরিগোপালবাবু বলিলেন "আরে মশায়, না-না-না। তা হ'লে আপনি সব মাটী করবেন। আপনি কারেও কিছু বল্‌বেন না। দেখুন, এটা বিয়ের সময় একটা মজা করা মাত্র। মজা না হ'লে বিয়ে কি? সতীশ চুপি চুপি আস্‌বে, আর বিয়ে ক'রে যাবে? আর আমরা কিছু মজা কর্‌তে পাব না? তা হ'তেই পারে না।"

হরিগোপালবাবুর তাৎকালিক অবস্থাটি ক্ষেত্রনাথ

বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং ব্যাগ্‌পাইপ সম্বন্ধে আর কোনও কথা উত্থাপন না করিয়া বলিলেন "আচ্ছা, আপনি কি আর পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে গ্রামের রাস্তাটি মেরামত কর্‌তে পার্‌বেন ?"

হরিগোপালবাবু বলিলেন "নিশ্চয়ই না; অসম্ভব—একেবারে অসম্ভব; তবে কতকটা রাস্তা মেরামত হ'তে পারে। আপনার বাড়ীর আগে যে একটা মস্ত বড় গর্ত্ত আছে, সেটা আগে মেরামত করিয়ে দিচ্ছি। সতীশ বোধ হয় আপনার এখানেই থাক্‌বে ?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তা নইলে এ গ্রামের মধ্যে আর স্থান কোথায় ?"

হরিগোপালবাবু বলিলেন "তবে আপনার বাড়ীই তো বিবাহবাড়ী, মশায়। আমিও তো আপনার এখানেই এসে উঠছি। বে-আদবী কর্‌ছি ব'লে কিছু মনে কর্‌বেন না।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "এ তো আপনাদেরই বাড়ী। আপনি আজ এখানে অবস্থিতি করুন।"

হরিগোপালবাবু সাইকেল ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন "না, ভাই, আজ আর না। সেই দিনেই নিশ্চয় ব্যাগ্‌পাইপ নিয়ে আসব আর এখানে থাক্‌ব। বিয়ে বুঝি ১৫ই ফাল্গুন তারিখে হচ্ছে ? ভারি চমৎকার, সে দিনটি রবিবার। বাঃ বাঃ! আপনার কাছে আজ

চমৎকার সংবাদ শুন্‌লাম। একবার পুরুলিয়াতে সতীশের সঙ্গে দেখা হ'লে হয়! আজ তবে আসি; এখন আমি ডাক-বাঙ্গলাতে চল্‌লাম।" এই বলিয়া হরিগোপালবাবু সাইকেলে চড়িলেন এবং ক্ষেত্রবাবুর দিকে ঈষৎ মাথা নোওাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথের মুখে মনোরমা এই আগন্তুকের বৃত্তান্ত ও প্রস্তাব অবগত হইয়া বলিলেন "বেশ তো। বিয়ের সময় বাজনা না হ'লে মানাবে কেন?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তুমি বুঝি সতীশকে এখনও চেন নাই? সে হয়ত পাগ্‌লামী ক'রে একটা গোল বাধাবে, আর হয়ত ব'লে বস্‌বে 'আমি বিয়ে কর্‌ব না'।"

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন "হঁা, অনেক লোক তা বলে। বাজনাই হোক্‌, আর ধরাখানা রসাতলেই যাক্‌, সতীশবাবু সেদিন সৌদামিনীকে বিয়ে না ক'রে কোথাও যাবে না; তা দেখ্‌তে পাবে।"

সন্ধ্যার সময় ডাক-পিয়ন সতীশচন্দ্রের একখানি পত্র দিয়া গেল। তাহাতে সতীশচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, ১০ই ফাল্গুন হইতে তিনি এক মাসের ছুটী লইবেন। ঐ তারিখেই তিনি কলিকাতায় যাইবেন এবং ১৩ই তারিখে আহারাদির পর তাঁহার পিস্‌তুতো ভ্রাতা, দুই তিন জন জ্ঞাতি এবং পুরোহিত ও নাপিতের সহিত বল্লভপুরাভিমুখে যাত্রা করিবেন। ষ্টেশনে ভোর রাত্রিতে যেন অন্ততঃ চারিখানা পাল্কীর বন্দোবস্ত থাকে এবং গো-গাড়ীও দুই তিন খানা থাকে। সতীশচন্দ্র সাইকেলেই বল্লভপুরে পঁহুছিবেন। তাঁহারা বল্লভপুরে পঁহুছিয়া গাত্রহরিদ্রার

তত্ত্বাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। সুরেন্দ্র ভাল আছে ও মন দিয়া পড়িতেছে। ইত্যাদি।

পরদিন প্রাতে ক্ষেত্রনাথ, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পাল্কীর কথা তাঁহাকে বলায়, তিনি বলিলেন "তার জন্য চিন্তা কি? মাধবদত্তের দুইখানা পাল্কী আছে; আর ময়নাগড়ের জমীদারও আমার যজমান, তাঁকে ব'লে পাঠালে তিনিও দুইখানা পাল্কী পাঠিয়ে দিবেন।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "বেহারা পাওয়া যাবে তো?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "যথেষ্ট, যথেষ্ট। এদেশে বেহারার অভাব নাই। চারিখানা কেন, দশখানা পাল্কীরও বেহারা পাওয়া যায়।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "বেশ কথা; আমি নিশ্চিন্ত হলেম। আপনি তবে পাল্কী-বেহারার বন্দোবস্ত করুন, আর তাদের বায়না দেবার জন্য এই দশটা টাকা নিয়ে রাখুন। ১৩ই তারিখে বৈকালে এই কাছারী-বাড়ীতে পাল্কীবেহারা উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাদের ষ্টেশনে পাঠাব।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "তা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; তারা যথাসময়ে এখানে আস্‌বে।"

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভট্টাচার্য্য মশায়, বিয়ের যোগাড় কি রকম কর্‌ছেন?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন “কি আর করব, বাবা? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—বুঝ্‌তেই পারছ? কেবল মেয়েটিকে আমি কোনও রকমে দান করব মনে করে-ছিলাম। কিন্তু বরাহভূমের রাজার আমি সভাপণ্ডিত। পুরুলিয়ার ডেপুটীবাবু আমার জামাতা হবেন, এই কথা শুনে তিনি জামাতার জন্য একজোড়া বেনারসী চেলী, মেয়ের জন্য একটী বেনারসী শাড়ী ও একছড়া সোনার হার দিয়েছেন। পঞ্চকূট কাশীপুরের মহারাজা আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। তিনি জামাতার জন্য একটী মূল্যবান্ হীরকাঙ্গুরী ও সোনার চেইন্ ঘড়ী, আর বিয়ের খরচপত্রের জন্য নগদ দুইশত টাকা দিয়েছেন। গড়-জয়পুর ও ঝাল্‌দ্যার রাজা নগদ একশত টাকা ক’রে দুইশত টাকা দিয়েছেন। বাঘমুণ্ডীর রাজাও নগদ একশত টাকা দিয়েছেন। এ ছাড়া ময়নাগড়ের জমীদার ও আমার অন্যান্য যজমানেরা প্রায় দুইশত টাকা দিয়েছেন। পিত্তল কাঁসার দানসামগ্রীও কিছু সংগ্রহ করেছি। ইছাগড়ের রাজা জামাতার জন্য রূপার ডিবে, গ্লাস ও থালা দিয়েছেন, এবং মেয়ের জন্য দুইটী জড়োয়া দুল দিয়েছেন। বাবা, এই অঞ্চলে আমি অনেক দিন আছি, আর সকলেই আমাকে শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুগ্রহ করেন; তাই এই-সমস্ত দ্রব্য ও টাকা সংগ্রহ করতে পারলাম। সতীশবাবুর মতন ব্যক্তিকে যে আমি কখনও জামাতা

কর্‌তে পার্‌ব, সে দুরাশা কখনও করি নাই। সকলই হরির ইচ্ছা। তাঁরই উপর সমস্ত ভার। আমি কয়দিন নানাস্থানে ভ্রমণ করেছি। সবেমাত্র কাল সন্ধ্যার সময় বাড়ী এসেছি। এসে শুন্‌লাম, আপনি এবৎসর সরস্বতী পূজা করেছিলেন, আর এখানে একটী পাঠশালাও স্থাপন করেছেন। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। আপনি আমাদের সৌভাগ্যগুণেই এখানে এসেছেন, বিশেষতঃ আমার আর সৌদামিনীর। আপনার ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব না। আর সৌদামিনী যে বাল্যকাল থেকে নিত্য শিবপূজা করে, তাও তার সফল হবে। বাবা, এখন আপনি দাঁড়িয়ে থেকে যা'তে শুভকার্য্য সম্পাদন হয়, আর সকলের মানসম্ভ্রম বজায় থাকে, তা কর্‌বেন। আমি অক্ষম, কিছুই জানি না, বা কর্‌তে পার্‌ব না।" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয় সাশ্রুনয়নে ক্ষেত্রনাথের হাত দুইটী ধরিলেন।

ক্ষেত্রনাথ ব্যগ্র হইয়া বলিলেন "আঃ, ভট্টাচার্য্য মশায়, করেন কি? করেন কি? আমি আপনারই আজ্ঞাবহ; আপনি আমায় যা আদেশ কর্‌বেন, তাই কর্‌ব! এখন আপনার নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কতগুলি হবে, মনে করেন?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "এই অঞ্চলে আমাদের কুটুম্ব ও পরিচিত ব্রাহ্মণ প্রায় পঞ্চাশজন হবে। অন্যান্য

ভদ্রলোকও পঞ্চাশ জন হবে; তা ছাড়া গ্রামের লোকগুলিও 'আছে। মোট পাঁচশত লোকের আয়োজন কর্‌তে হবে। আমাকে কেবল ময়দা, কিছু ঘৃত, আর মিষ্টান্নের যোগাড় কর্‌তে হবে। মিষ্টান্ন বাড়ীতেই প্রস্তুত কর্‌ব, তার জন্য পুরুলিয়া থেকে একজন ভাল ময়রা আন্‌তে পাঠিয়েছি। উৎকৃষ্ট দধি, ক্ষীর, মৎস্য ও তরকারী আমার যজমানেরাই দেবেন। মাধবদত্ত মশায় এবিষয়ে আমায় যথেষ্ট সাহায্য কর্‌বেন। তাঁর পুষ্করিণীতে অনেক মৎস্য আছে; আর তাঁর নিজের এবং প্রজাদের ঘরেও যথেষ্ট দুগ্ধ হয়। এইরূপে, বাবা, ভিক্ষা ক'রে কোনওরূপে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার পাবার আশা করছি।"

ক্ষেত্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন, যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব থাকিলে, তাহার সমাদর এখনও আছে। ব্রাহ্মণই সমাজের গুরু। যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ, সমাজ এখনও তাঁহাদিগকে প্রতি-পালন করিয়া থাকেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যজমানগণের নিকট চাহিবামাত্র তাঁহারা ইঁহার কন্যা ও ভাবী জামাতার জন্য প্রচুর যৌতুক প্রদান করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বয়ং দরিদ্র; কিন্তু ধনবান্ লোকের ন্যায় ইনি কন্যার শুভবিবাহ সুসম্পন্ন করিবেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "অনেক লোকের সমাগম হবে। বিবাহের সভা কোন্ স্থানে কর্‌বেন?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "বাবা, আপনি একবার স্বয়ং গিয়ে এই সকলের ব্যবস্থা ক'রে দিলে ভাল হয়। আমার বৈঠকখানার সম্মুখে যে খোলা মাঠটি প'ড়ে আছে, আমি মনে করেছি, ঐ স্থানের উপরে একটী চাঁদোয়া টাঙ্গিয়ে ও দুইদিক্ কানাত দিয়ে ঘিরে বিবাহের সভা করব। নিকটবর্ত্তী জমীদারেরা কেহ চাঁদোয়া কেহ কানাত, কেহ সতরঞ্চ, কেহ ঝাড়লণ্ঠন, কেহ অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। দুই তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত দ্রব্য এখানে এসে পড়বে। লোকজনকে খাওয়াবার ব্যবস্থা এইরূপ করেছি—বাড়ীর মধ্যে উঠানের উপর আর একটী বড় চাঁদোয়া টাঙ্গিয়ে তার তলে ভদ্রলোকদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করব। আর আমার খামারবাড়ীর উঠানে একটী শালপাতার ছাম্‌লা বেঁধে তার তলে ইতর লোকজনকে খাওয়াব। বাবা, আমি তো এইরূপ ব্যবস্থা করেছি; এখন আপনি একবার নিজে দেখে শুনে যা ভাল হয়, তাই করুন।"

বৈকালে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী গিয়া ক্ষেত্রনাথ তাঁহার সকল ব্যবস্থা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও তাহাদের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।

ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

১৪ই ফাল্গুন তারিখের প্রাতঃকালে, সতীশচন্দ্র, তাঁহার পিস্তুতো ভ্রাতা রজনীবাবু, তাঁহার দুইটী জ্ঞাতি ভ্রাতা, এবং পুরোহিত, পাচক ব্রাহ্মণ, দুইজন খানসামা ও একজন দাসী কাছারী বাটীতে উপনীত হইল। সতীশ-চন্দ্র সর্ব্বাগ্রে সাইকেলে অতি প্রত্যুষেই বল্লভপুরে উপস্থিত হইয়া ক্ষেত্রনাথকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিলেন। ক্ষেত্রনাথ সতীশকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। ক্ষেত্রনাথের সহিত দেখা হইবামাত্র সতীশচন্দ্র বলিলেন "ক্ষেত্তর, তোমাদের এখানে 'আলাদীনের প্রদীপ' আছে না কি? এ যে এই কয়েকদিনের মধ্যেই বল্লভপুরের শ্রী ফিরে গেছে! রাস্তা মেরামত হয়েছে; তোমার বাড়ী মেরামত হ'য়ে ধপ্ ধপ্ করছে; তোমার বাইরের ঐ ঘরগুলোরও সংস্কার হয়েছে; তোমার বাড়ীর সাম্নের এই বিস্তৃত মাঠটি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে—যেন এক নূতন স্থানে এসেছি ব'লে মনে হচ্ছে!"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "নূতন স্থানই তো! তুমি নূতন, আর আমাদের সদু ঠাকুরুণও নূতন; কাজেই বল্লভপুরও তোমার চক্ষে নূতন! তোমার সঙ্গীদের কত দূরে ছেড়ে এলে?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "তাঁরা বোধ করি এতক্ষণ

মাধবপুরের কাছাকাছি হয়েছেন। তাঁদের আস্‌তে আর বড় দেরী নাই; এই চলে এলেন বলে। আরে ভাই, কাল রাত্রিতে বড় হিমভোগ কর্‌তে হয়েছে। তোমার বেহারা বেটারা মদের দোকানে মদ খেয়ে বেহুঁস্‌ হয়ে পড়েছিল। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর তোমার লখাই সর্দ্দার তাদের একত্র কর্‌লে। তার পর বেটারা রাত্রি থাক্‌তে থাক্‌তে কিছুতেই পাল্কী তুল্‌তে চায় না। রাস্তার ধারে কতকগুলো শুক্‌নো পাতা আর খড় জ্বেলে আগুন পোহাতে লাগ্‌ল। শেষে রাত্রি চার্‌টের সময় আমি তাড়া দিলে, তারা পাল্কী নিয়ে উঠ্‌লো। আমি সকলকে বিদায় করে দিয়ে, ষ্টেশনে মুখ হাত ধুয়ে, সকলের শেষে সাইকেল চড়ে বেরুলেম। তোমার এই পাহাড়ে দেশে বেজায় ঠাণ্ডা হে—বেজায় ঠাণ্ডা। শীগ্‌গীর একটু চা তৈয়ের কর্‌তে বল।"

ক্ষেত্রনাথ যমুনার মাকে শীঘ্র চা প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পরে সতীশচন্দ্রের আত্মীয়গণের অবস্থানের জন্য তিনি যে যে ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেখাইলেন। সতীশচন্দ্র বলিলেন "চমৎকার বন্দোবস্ত হয়েছে; কোনও ত্রুটি নাই। আমার রজনীদাদা কখনও কল্‌কাতার বাহিরে আসেন নাই। শুন্‌তে পাই, ছেলেবেলায় নাকি তিনি একবার বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত এসেছিলেন! তাঁর বিশ্বাস ক'ল্‌কাতা ছাড়া আর

কোথাও সভ্য মানুষের বাস নাই! পাড়াগাঁয়ের লোক সব ধাঙ্গড়-সাঁওতাল! এখন তিনি এসে কি বলেন, শোন। তাঁর জন্যই আমার একটু চিন্তা। তিনি কি এখানে আস্‌তে চান? তাঁকে যে কষ্টে বাড়ী থেকে বার করেছি, তা আমিই জানি।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রের কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "একমাত্র তোমার রজনী দাদাই এ বিষয়ে দোষী নন। কল্‌কাতাবাসী অনেকেরই ধারণা, পাড়া গাঁ বাসের অযোগ্য, আর পাড়াগাঁয়ের লোক বড় অসভ্য। আমার আত্মীয় স্বজনেরাও বলেন যে, আমি পাড়াগাঁয়ে এসে বাস করে সাঁওতাল ধাঙ্গড়ের তুল্য হয়েছি। যাক্ সে সব কথা—এখন এই নাও,—চা প্রস্তুত হয়ে এসেছে।"

উভয়ে চা খাইতে খাইতে অনেক বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "ওহে, সতীশ, আমাদের ভট্টাচার্য্য মশাইটি যে সে লোক ন'ন! এ অঞ্চলের রাজা জমীদারদের ঘরে তাঁর বিলক্ষণ সম্মান আর প্রতিপত্তি! তিনি মেয়ের বিয়ের জন্য যেরূপ উদ্যোগ আয়োজন করেছেন, তা সকলে করে উঠ্‌তে পারেন না। আমি তো দেখেই অবাক্!"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "তাঁর অবস্থার অতিরিক্ত বাহ্যাড়ম্বর ক'র্‌ছেন না কি? তাঁকে তুমি নিষেধ কর নাই

কেন ? বেশী গোলমাল না করে চুপে চুপে কাজ সার্‌লেই তো হতো ? আমি বাহ্যাড়ম্বর আদৌ ভাল বাসি না ; বিশেষতঃ এই বয়সে বিয়ে কর্‌তে এসে। তোমার কথা শুনে আমার মনটা বড় খারাপ হ'ল যে !"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আচ্ছা, সতীশ, তোমার না হয় ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়স হয়েছে ; তুমি না হয় একটু প্রবীণ হয়েছ। কিন্তু সদু ঠাকৃরুণ তো আর প্রবীণা হন নাই। তার বিয়েতে তার বাপ যদি একটু বাহ্যাড়ম্বর করেন, তায় দোষ কি ? আর অবস্থার অতিরিক্ত খরচপত্র তিনি অবশ্যই কর্‌ছেন না, বা কর্‌বেন না। কিন্তু আমি যা কখনও আশা করি নাই, তিনি তাই কর্‌ছেন। সেই কারণেই আমি চমৎকৃত হয়েছি ! কাল তুমিও সমস্ত ব্যাপার দেখে বিস্মিত হবে।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "ব্যাপার কি, শুনি ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তা আমি বল্‌ছিনা। ঐ হে, ঐ তোমার পাল্কী দেখা দিয়েছে ! ওঠ, ওঠ, ওঁদের অভ্যর্থনা করি গে, চল।"

বৈঠকখানার বারাণ্ডার সম্মুখে পাল্কী আসিয়া লাগিলে, ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র অগ্রসর হইয়া পাল্কীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। পাল্কী হইতে সকলে অবতরণ করিলে, ক্ষেত্রনাথ প্রত্যেককে করজোড়ে প্রণাম করিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। সতীশ ক্ষেত্রনাথকে প্রত্যেকের

পরিচয় প্রদান করিলেন। রজনীবাবু ক্ষেত্রনাথের বৃহৎ সুন্দর বাটী, বাটীর সম্মুখে প্রশস্ত পরিষ্কৃত মাঠ, ও অনতি-দূরে বনাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া বলিলেন "আপনারই নাম বুঝি ক্ষেত্রবাবু? বাঃ, আপনি তো, মশাই, অতি সুন্দর স্থানেই বাস করেছেন! কল্‌কাতার বাইরে যে দ্রষ্টব্য কোনও সুন্দর স্থান থাক্‌তে পারে, আমার তো সে ধারণাই ছিল না। এ যে দেখ্‌তে পাচ্ছি, আপনার এ দেশ স্বর্গরাজ্য বা নন্দনকাননের ন্যায় সুন্দর! আমি তো প্রকৃতির এমন বিচিত্র সৌন্দর্য্য জীবনে আর কখনও কোথাও দেখি নাই। আহা, যা দেখ্‌ছি সবই নূতন, সবই অদ্ভুত, সবই সুন্দর, সবই বিচিত্র! আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন একটী স্বপ্নের রাজ্যে বেড়াচ্ছি। আহা, আজ ভোরের সময় কি শোভাই না দেখ্‌লুম, আর কি সঙ্গীতই না শুন্‌লুম! আপনার বেহারারা একটী পাহাড়ের নীচে পাল্কী নামিয়েছিল। আমি কৌতূহলবশতঃ একবার পাল্কীর বাড় খুলে দেখি, পূর্ব্বদিক্ লাল হ'য়ে উঠেছে, আর রাস্তার পার্শ্বে স্তরে স্তরে পাহাড় আর বন। আমি অবাক্ হ'য়ে সেই শোভা দেখ্‌ছি, এমন সময়ে, মশাই, কার যেন ইঙ্গিতে সহসা সেই পর্ব্বত আর অরণ্য সহস্র সহস্র পাখীর সুমধুর কণ্ঠধ্বনিতে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌লো! ওঃ, সে কি চমৎকার, কি অদ্ভুত, কি শ্রুতি-

মধুর! আমি তো পাল্কী থেকে বেরিয়ে অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। যতীন, চারু,—তোমরা পাখীদের গান শুনেছিলে? পুরোহিত মশাই, আপনি শুনেছিলেন?"

যতীন্দ্র বলিল "তা আবার শুনি নাই? সে যে কি চমৎকার, তা কেউ না শুন্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। আর পাখীই কত রকমের! সে সব পাখী আমরা কখনও দেখি নাই, বা তাদের গান শুনি নাই।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন "ওগো, এই জন্যই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় মুনি-ঋষিগণ লোকালয় ছেড়ে অরণ্যে ও পর্ব্বতে বাস কর্‌তেন। পাহাড়-জঙ্গলে যে কেবল ধাঙ্গড় সাঁওতাল বাস করে, তা নয়। এই তো ক্ষেত্রবাবুর মতন লোক কল্‌কাতা ছেড়ে এই দেশে এসে বাস কর্‌ছেন। ক্ষেত্রবাবুর মতন আরও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক এদেশে বাস করেছেন। তা নইলে, সতীশ বাবু কি ধাঙ্গড়ের দেশে একটা মেয়ে পছন্দ করেন, না বিয়ে কর্‌তে আসেন?"

রজনীবাবু ও যতীন্দ্রের উপর কটাক্ষ করিয়াই এই শেষোক্ত মন্তব্যটি প্রকাশিত হইল। সেই কারণে সতীশচন্দ্র অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন। রজনীবাবু পুরোহিত মহাশয়ের মন্তব্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সরলভাবে বলিলেন "পুরুত মশাই, আপনি ঠিক্ কথাই বলেছেন। আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ছিল।"

পুরোহিত মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "শুধু তাই নয়;—আমি এখনও মেয়ে দেখি নাই; কিন্তু আপনাদের ব'লে রাখ্‌ছি, আপনারা দেখ্‌তে পাবেন, মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ ঋষিকন্যা! প্রকৃতির এমন সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে কন্যার জন্ম আর লালন পালন হয়েছে, তার স্বভাব ঠিক ঋষিকন্যাদের মতন হবেই হবে। আমরা যে সহরে বাস করি, সে তো সাক্ষাৎ নরক! আর এই দেশ যেন ঋষিদের পবিত্র আশ্রম বা তপস্বীদের তপোবন! আজ সতীশবাবুর কল্যাণে এমন দেশ দেখে ধন্য হলাম। দেখুন দেখি একবার চারিদিকে চেয়ে?"

ক্ষেত্রনাথ তাঁহাদিগকে বলিলেন "আজ, কাল, পরশ্ব—এখন এই তিন দিন আপনারা এই প্রদেশের শোভা দেখে বেড়াবেন। এখন আপনারা ভেতরে এসে বসুন, ও প্রাতঃকৃত্য সমাধা করুন।"

দুইটী বালক ভৃত্য সকলের জন্য জল, গাড়ু, ঘটী, তোয়ালে, গামোছা, মঞ্জন, দাঁতন প্রভৃতি লইয়া আসিল। সকলে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া উপবিষ্ট হইলে, গরম গরম চা ও মোহনভোগ আনীত হইল। পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, তিনি স্নানাহ্নিক সমাপ্ত না করিয়া কিছু খাইবেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, দুইটী গোযানে, পাচকব্রাহ্মণ দাসী

ও ভৃত্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা গাড়ী হইতে বাক্স, তোরঙ্গ, বিছানা প্রভৃতি নামাইয়া যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিল; দাসী অন্তঃপুরে গমন করিল। তাহার অল্পক্ষণ পরেই ক্ষেত্রনাথের বরাতী দধি মৎস্য, ক্ষীর সন্দেশ প্রভৃতি আসিয়া পহুঁছিলে, ক্ষেত্রনাথ রজনীবাবুকে বলিলেন "আজই গাত্রহরিদ্রা; আপনি গাত্রহরিদ্রার জিনিষপত্র বা'র ক'রে দিন।"

রজনীবাবু একটী তোরঙ্গ হইতে সাড়ী, বডি, সেমিজ্‌, আয়না, চিরুণী, মাথার ফিতা, সাবান, তোয়ালে, রুমাল, এসেন্স্‌, সুগন্ধি তৈল, মাথাঘসা মশলা, চাঁদির রেকাব, কটোরা প্রভৃতি বাহির করিয়া দিলেন। কলিকাতা হইতে তাঁহারা দুই ঝুড়ি উৎকৃষ্ট ফল এবং ভাল আম-সন্দেশ আনিয়াছিলেন; তাহাও বাহির করিয়া দিলেন। মনোরমার অন্তঃপুরে এই-সমস্ত দ্রব্য ও দধি সন্দেশাদি নীত হইলে, তিনি সেগুলি সাজাইয়া গোছাইয়া কতিপয় দাসী ও ভৃত্যের দ্বারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কাছারীবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া রজনীবাবু প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়া গেলেন। ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের সৌজন্য ও বিনয়ে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন।

সেইদিন বেলা এগারটার পর বরের গাত্রহরিদ্রা না

হইলে কন্যার গাত্রহরিদ্রা হইবে না, এই কারণে পুরো-হিত মহাশয় সতীশচন্দ্রকে ত্বরাপ্রদান করিতে লাগিলেন। সতীশচন্দ্র বিপন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া পুরোহিত মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন "সতীশবাবু, তোমার কোনও চিন্তা নাই। তুমি স্নানাহ্নিক ক'রে প্রস্তুত হও; আমি কেবল একবিন্দু হরিদ্রা তোমার কপালে স্পর্শ করিয়ে কন্যার গৃহে পাঠিয়ে দেব। শাস্ত্রোক্ত বিধি, যতদূর সম্ভব হয়, পালন করা কর্ত্তব্য।"

সতীশচন্দ্র কি করেন, অগত্যা স্নানাহ্নিক সম্পন্ন করিয়া একটী গৃহের মধ্যে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত মহাশয় তাঁহার কপালে হরিদ্রাবিন্দু স্পর্শ করাইবামাত্র অন্তঃপুরের বারাণ্ডা হইতে বামাকণ্ঠে উলুধ্বনি ও শঙ্খ-ধ্বনি হইল। মনোরমা গ্রামের কতিপয় ব্রাহ্মণকন্যাকে অগ্রেই ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি শুনিবামাত্র সতীশচন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিলেন, এবং লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া বহির্ব্বাটীতে পলাইয়া আসিলেন।

যথাসময়ে কন্যার গৃহেও কন্যার গাত্রহরিদ্রা হইয়া গেল। ময়নাগড়ের রাজা তাঁহার বিখ্যাত রওশনচৌকীর বাদ্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রওশনচৌকীর সুমধুর ধ্বনিতে ও আনন্দকোলাহলে বল্লভপুর গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্নে রজনীবাবু প্রভৃতি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। এমন দুগ্ধ, এমন ক্ষীর, এমন মৎস্যের ঝোল, এমন মিষ্ট তরকারী তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কোথাও আস্বাদন করেন নাই। কফি, মটরসুঁটি, আলু প্রভৃতি ক্ষেত্রনাথের বাগানে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। চাউল, মুগের দাল প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার কৃষিজাত, ইহা অবগত হইয়া তাঁহার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দুগ্ধ তাঁহার গৃহপালিত গাভী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া তাঁহার বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, চলুন, চলুন, আপনার গাইগরু আর গোয়ালঘর দেখে আসি।" ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র তাঁহাকে এবং অপর সকলকে সঙ্গে লইয়া খামারবাড়ী, গোয়ালঘর, তরকারী-বাগান প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। ধান্যের মরাই এবং তাঁহার ভাণ্ডার-গৃহে রক্ষিত ও সঞ্চিত রাশীকৃত কলাই, মুগ, অড়হর, সরিষা, গুঞ্জা ও আলু দেখিয়া সকলে অবাক্ হইলেন। রজনীবাবু আনন্দমিশ্রিত বিস্ময় সহকারে বলিলেন "এ কি দেখ্‌ছি, ক্ষেত্রবাবু? এ যে আপনি রাজার হালে আছেন! এ যে আপনি আমাদের মতন দশটি গৃহস্থকে প্রতিপালন করতে পারেন! আপনি কলকাতা ছেড়ে কতদিন এখানে এসেছেন?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "প্রায় একবৎসর হ'বে।"

রজনীবাবু বলিলেন "বটে ? এর মধ্যেই আপনি এত উন্নতি করেছেন ? চমৎকার তো ? আপনার বাড়ী পটল-ডাঙ্গায় ছিল বল্‌ছিলেন না ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "হাঁ।"

"আমাদের চোরবাগানেও যে আপনাদের অনেক গন্ধবেণে আছেন। আপনি সর্ব্বেশ্বর দাঁকে চেনেন ?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তিনি আমার শ্বশুর।"

রজনীবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন "বটে ? বটে ? আপনি সর্ব্বেশ্বর দাঁয়ের জামাতা ? আপনি তাঁর কোন্ মেয়েকে বিয়ে করেছেন ? ছোটমেয়েকে বুঝি ?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "হাঁ।"

রজনীবাবু বলিলেন "কি অদ্ভুত ! কি চমৎকার ! তার নাম মনোরমা নয় ? ওহে, মনোরমা আর আমার ছোট বোন্ সরলা যে সমবয়সী, আর তারা সর্ব্বদাই একসঙ্গে খেলা কর্‌তো ও বই পড়্‌তো। মনোরমাকে নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন ?—হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে, বটে। সরলা সেদিন আমাদের বাড়ী এসেছিল ; সে আপনার ছোট শালা বীরুকে মনোরমার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল। বীরু বল্‌লে যে, মনোরমার শরীর বড় অসুস্থ ; তাই পশ্চিমে হাওয়া বদ্‌লাতে গেছে ! মনোরমা যে এখানে এসেছে, তা তো আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। যা

হোক্, আজ আমি আপনাদের এখানে এসে ভারি আশ্চর্য্য হ'য়ে পড়্লুম, দেখ্‌ছি। বাঃ, আপনি তো ভারি সুন্দর জায়গায় এসে বাস করেছেন!" এই বলিয়া তিনি সতীশকে বলিলেন "সতীশ, তুমি তো মধুপুর, বৈদ্যনাথ দেখেছ। সে সব স্থান কি এমন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "মধুপুর, বৈদ্যনাথ স্বাস্থ্যকর স্থান বটে। কিন্তু সেখানে আজকাল বহু লোকের বাস হয়েছে, আর ম্যালেরিয়া-বিষও প্রবেশ করেছে। স্বাস্থ্যকর হ'লেও সেখানকার প্রকৃতির শোভা এর কাছে কিছুই নয়। আমি তো ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য অনেক প্রদেশে বেড়িয়েছি, কিন্তু ঐ পাহাড়ের উপর থেকে অপর পার্শ্বে নন্দনপুর মৌজার যে চমৎকার প্রাকৃতিক শোভা দেখেছি, তেমন আর কোথাও দেখি নাই। আপনি যদি পাহাড়ে উঠ্‌তে পারেন, তা হ'লে সেই শোভা দেখে মুগ্ধ হবেন।"

রজনীবাবু বলিলেন "না, হে সতীশ, একেবারে আর অত সৌন্দর্য্য দেখে কাজ নাই। তা হ'লে, মাথা গুলিয়ে যাবে। যা দেখ্‌ছি, তা'তেই আমি অস্থির হ'য়ে পড়েছি। যদি আর কখনও এখানে আসা হয়, তা হ'লে তখন তোমার পাহাড়ে উঠ্‌বো।" কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি চিন্তা করিয়া বলিলেন "দেখ সতীশ, এই অঞ্চলে আমাদের এক-একটা বাঙ্গলা প্রস্তুত করলে হয় না?

কল্‌কাতায় মাঝে মাঝে প্লেগ্ টেলেগ্ নানারকমের উপদ্রব উপস্থিত হয়; তখন কোথায় পালানো যাবে, তাই ভাবি। এইরূপ স্থানে যদি একটা বাড়ী থাকে, তা হ'লে নিশ্চিন্ত হ'য়ে দিব্যি দুমাস কাটানো যায়। আর যখন ক্ষেত্রবাবু এখানে বাস করেছেন, আর আমাদের একজন নূতন কুটুম্বও হচ্ছেন, তখন এখানে এলে আমরা একেবারে নির্ব্বান্ধবপুরীতে এসে পড়্‌বো না। তুমি কি বল? রেলষ্টেশন থেকেও তো বল্লভপুর বেশী দূরে নয়। পাঁচ ছয় মাইল দূর হ'বে। ......হাঁ, তোমার ক্ষেত্রবাবুকে দেখে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। আমাদের নিশি তো এল্-এ ফেল্ হ'য়ে অবধি কি কর্‌বে তাই ভাব্‌ছে। তাকে এই অঞ্চলে কিছু জমীজায়গা কিনে দিলে হয় না? সেও ক্ষেত্রবাবুর মত ফার্ম্মিং কর্‌তো? কি ক্ষেত্রবাবু, জমী জায়গা এই অঞ্চলে সুবিধামত পাওয়া যায় না?"

ক্ষেত্রনাথ উত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বেই সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "উনিই এই বল্লভপুরের মালিক; আর বোধ হয় শীঘ্রই পাঁচ সাত হাজার বিঘা জমী ওঁর হাতে আস্‌ছে। উনি একজনের কেন, ইচ্ছা কর্‌লে, দুই শত লোকের সংসার চালাবার উপযুক্ত জমী বিলি কর্‌তে পারবেন। তা নিশিকে আপনি যদি এখানে পাঠাতে চান, জমীর অভাব হ'বে না।"

যতীন্দ্র ও চারু তাহা শুনিয়া ব্যগ্রভাবে ক্ষেত্রবাবুকে বলিল "বলেন কি, মশাই? আপনার এত জমী? তা হ'লে আমাদেরও কিছু কিছু জমী দিতে হ'বে। আমরাও আস্‌বো।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, তার জন্য কিছু আটকাবে না। যখন জমী বিলিবন্দোবস্ত হ'বে, তখন আপনাদের সংবাদ দেব। আপনাদের মতন লোক এসে চাষ বাস কর্‌লে তো খুব আনন্দেরই কথা হবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। মনোরমা সৌদামিনীদের বাড়ীতে অবূঢ়ান্নের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইলে নগেন্দ্র তাঁহাকে রজনীবাবুর পরিচয় প্রদান করিল। তাহা অবগত হইয়া মনোরমা রজনী-বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যগ্র হইলেন। নগেন্দ্র আসিয়া তাহার পিতাকে চুপি চুপি জননীর ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, ক্ষেত্রবাবু বলিলেন "যাও না, রজনীবাবুকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাও।" তারপর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মশাই, আপনি একবার বাড়ী-ভেতরে যান।"

রজনীবাবু বলিলেন "তা যাব বই কি? মনোরমাকে একবার দেখে আসি।" এই বলিয়া তিনি নগেন্দ্রনাথের সহিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ সতীশ-সৌদামিনীর শুভ বিবাহ। ক্ষুদ্র বল্লভপুর গ্রামটি আজ উৎসবময় হইয়াছে। সৌদামিনীর ন্যায় সুন্দরী গ্রামের মধ্যে আর কেহ নাই; সে নিজ সৌন্দর্য্য ও মধুর স্বভাব দ্বারা সকলের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সকলেই সৌদামিনীকে স্নেহ করে; সকলেই তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হয়; সে যেন গ্রামের আলোক-স্বরূপ! —আজ তাহার শুভ বিবাহ। সতীশ বাবুর ন্যায় সুশিক্ষিত, সুন্দর ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে। যোগ্যা যোগ্যের সহিত মিলিত হইতেছে। তাই গ্রামস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আহ্লাদের আর পরিসীমা নাই। শুধু গ্রামবাসী কেন, এই প্রদেশবাসী জমীদার ও গৃহস্থ, যাঁহারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত পরিচিত,—সকলেরই আনন্দের সীমা নাই। যাঁহার যেরূপ সাধ্য, প্রত্যেকেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এই শুভকার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটী আজ আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত। দূরবর্ত্তী আত্মীয়-কুটুম্বগণের সমাগম হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী হিতাকাঙ্ক্ষী মহাশয়েরা শুভাগমন করিয়াছেন। কেহ চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইতেছে; কেহ ঝাড় ঝুলাইতেছে; কেহ খুঁটি পুঁতিতেছে, কেহ ফটক বাঁধিতেছে; কেহ কানাত দিয়া প্রাঙ্গণ ঘিরিতেছে। কোথাও গ্রামবাসী যুবকেরা শোভা-

যাত্রা করিয়া বরকে আনিবার নিমিত্ত মশাল বাঁধিতেছে; কোথাও বালকবালিকারা রওশনচৌকীর সুমধুর বাদ্য শুনিতেছে। কোথাও ভারে ভারে দধি, ক্ষীর ও মৎস্য আসিয়া পঁহুছিতেছে। মহিলাগণের কলরবে ও হাস্য পরিহাসে এবং বালকবালিকাগণের ক্রন্দন ও চীৎকারে অন্তঃপুর শব্দায়মান। এমন সময়ে সহসা বিচিত্র পরিচ্ছদ-পরিহিত একদল ব্যাগ্-পাইপ্ বাদ্যকর আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে সমবেত হইল! তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের যন্ত্রাদি বাহির করিয়া একতান বাদ্য আরম্ভ করিল। মৃদঙ্গে ঘা পড়িল; ব্যাগ্পাইপ্ হইতে বিচিত্র সুর বাজিয়া উঠিল। সকলে চমকিত হইয়া সেই দিকে ছুটিয়া আসিল। এমন বিচিত্র বাদ্যধ্বনি কেহ কখনও শুনে নাই ও এমন বিচিত্র বাদ্যকর কেহ কখনও দেখে নাই! বালক ছুটিল, বালিকা ছুটিল; যুবক ছুটিল, যুবতী ছুটিল; প্রৌঢ় ছুটিল, প্রৌঢ়া ছুটিল; বৃদ্ধ ছুটিল, বৃদ্ধা ছুটিল। সকলেই চমৎকৃত ও মুগ্ধ! কূটিত মৎস্য ছাড়িয়া দাসী ছুটিয়া আসিল; সেই অবসরে চিলে ছোঁ মারিয়া দুই চারি খানা মাছ লইয়া পলাইল, এবং একটা মার্জ্জার একটী মাছের মুড়া লইয়া কোঠাঘরের সিঁড়িতে উঠিল। দধি, দুগ্ধ ও ক্ষীর ভাণ্ডারে না তুলিয়াই অর্পিত-ভার কুটুম্ব মহাশয় বাদ্য শুনিতে ছুটিয়া আসিলেন। অন্তঃ-পুরের মহিলারা স্ব স্ব কার্য্য ছাড়িয়া বাদ্য শুনিবার জন্য

সদর দ্বারে সমবেত হইলেন। চন্দ্রাতপ একদিকে টাঙ্গানো হইয়াছিল, অপর দিকে আর টাঙ্গানো হইল না। কুলী খুঁটি পুঁতিতে পুঁতিতে আর খুঁটি পুঁতিল না। যুবকগণের আর মশাল প্রস্তুত করা হইল না। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ বাদ্যকরদিগের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া এই অদ্ভুত ও বিচিত্র বাদ্যধ্বনি শুনিতে লাগিল। কোথা হইতে এই বাদ্যকরদল আসিল ও তাহাদিগকে কে আনিল, তাহা কেহ জিজ্ঞাসা করিল না, অথবা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতাও বুঝিল না;—সকলেই তন্ময় হইয়া এই অদ্ভুত বাদ্যধ্বনি শুনিতে লাগিল। সহসা বাদ্যধ্বনি নীরব হইল। বাদ্যকরেরাও কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া যন্ত্রাদি সহ কাছারী-বাড়ী অভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালকবালিকারা দৌড়িতে লাগিল।

সতীশচন্দ্র নান্দীমুখ ক্রিয়াদি শেষ করিয়া রজনীবাবু প্রভৃতির সহিত বৈঠকখানার বারাণ্ডায় বসিয়া ছিলেন, এমন সময়ে বাদ্যকরেরা তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া ব্যাগ-পাইপ্ বাজাইতে আরম্ভ করিল। সতীশচন্দ্র ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া ক্ষেত্রনাথের মুখের দিকে চাহিলে, তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "এটি তোমার বন্ধু ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার হরিগোপাল বাবুর কাজ। তিনি সেদিন এখানে এসেছিলেন এবং তোমার বিয়েতে ব্যাগ-

পাইপ্ নিয়ে আস্‌বেন ব'লে ভয় দেখিয়ে গেছ্‌লেন। তিনি যা ব'লে গেছেন, তাই কর্‌লেন, দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "সে হতভাগাটা এখানে এসেছিল না কি? আজও আস্‌বে, ব'লে গেছে না কি? এলে মুস্কিল কর্‌বে দেখ্‌তে পাচ্ছি।" ব্যাগ্‌পাইপ্ থামিলে, তিনি বাদ্যকরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তোমাদের এখানে পাঠালে? তোমরা কোথা থেকে আস্‌ছ?"

প্রধান বাদ্যকর সম্মুখ দিকে অর্দ্ধেক ঝুঁকিয়া ও জোড়হাত করিয়া বলিল "হুজুর, আমরা বর্দ্ধমান থেকে আস্‌ছি? হুজুরের চাপরাসী আমাদের নিয়ে এসেছে।"

তখন সতীশচন্দ্র বুঝিলেন, ইহা হরিগোপালেরই কাজ। ঠিক্ সেই সময়ে সাইকেলে চাপিয়া তিনটি ভদ্রলোককে কাছারীবাড়ী অভিমুখে আসিতে দেখা গেল। সতীশচন্দ্র সভয়ে দেখিলেন যে, হরিগোপাল-বাবু, মুন্‌সেফ সুখময়বাবু ও ডেপুটী অভয়বাবু আসিতে-ছেন! হরিগোপালবাবু সাইকেলে আসিতে আসিতেই "হুর্‌রে, হুর্‌রে" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সতীশচন্দ্র রজনীবাবুর পশ্চাতে দাঁড়াইলেন, রজনী বাবুকে দেখাইয়া, হাত নাড়িয়া বাড়াবাড়ি না করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু হরিগোপাল সেদিকে যেন লক্ষ্য না করিয়া, সাইকেল হইতে নামিয়াই, বাদ্যকরদিগকে বলিলেন "ব্যাটারা চুপ্ করে আছিস্

যে ? বাজা, বাজা।" বাদ্যকরেরা আবার বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিল।

ক্ষেত্রনাথ অভ্যাগত ব্যক্তিত্রয়কে সমাদর করিয়া বসাইলেন। হরিগোপালবাবু রজনীবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন "মশাই, আমার বে-আদবী মাপ করবেন। আপনারা নিশ্চয়ই বরযাত্রী; মশাই, আমরাও তাই; তবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এইটুকু যে, আমরা অনিমন্ত্রিত, অনাহূত ও রবাহূত। যাই হোক্, আমরাও যে বরযাত্রী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সতীশভায়ার আক্কেলটার একবার পরিচয় শুনুন। সতীশ তার বিয়ের কথা আমাদের আদৌ জানায় নাই। আজ যে তার এখানে বিয়ে, তা আমরা ঘটনাচক্রে জান্‌তে পারি। জান্‌তে পেরে বরযাত্রী হ'য়ে আমরা এখানে এসেছি। আর, মশাই, বর্দ্ধমান থেকে এই ব্যাগ্‌পাইপের দলও আনিয়েছি। এই অভয়বাবু হলেন ডেপুটী, এই সুখময়বাবু হলেন মুন্‌সেফ, আর আমি, মশাই, হলাম রাস্তাঘাটের তদারককার। আমরা সর্ব্বদাই সতীশবাবুর বাসায় যাই ও একসঙ্গে উঠি বসি। কিন্তু ইনি এমনই চমৎকার লোক যে, এমন একটা ব্যাপারে আমাদের আদৌ নিমন্ত্রণ করেন নাই। সেই দুঃখে, আমি এই ব্যাগ্‌পাইপ বাজনা নিয়ে এসেছি। মশাই, আমি কিছু অন্যায় করেছি কি ?"

রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন "আপনি অন্যায় কি করেছেন? খুব ভাল কাজই করেছেন। শুভকার্য্যে বাদ্যভাণ্ডের প্রয়োজন। তবে আমরা—"

হরিগোপাল বাবু রজনীবাবুকে বাধা দিয়া বলিলেন "বস্! মশাই, আর কোনও কথায় কাজ নাই। আমি আর কারুর পরোয়া রাখি না! এই ক্ষেত্রবাবু সেদিন এই বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে খুব ঝগড়া করেছিলেন। এই ব্যাগ্‌পাইপ্ ছাড়া আমি কতকগুলি গেঁঠে বোম্, হাউই, চরকী, তুব্‌ড়ি, রোশনাই প্রভৃতিও আনিয়েছি; তা ছাড়া লোহাগড়ের রাজাসাহেব তাঁর প্রধান ওস্তাদকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আসরে তার কালোয়াতী গান হবে।"

রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন "আপনি বেশ ব্যবস্থা করেছেন।"

হরিগোপালবাবু উল্লাসমিশ্রিত বিদ্রূপের সহিত সতীশচন্দ্রের দিকে একবার চাহিলেন। সতীশচন্দ্র এইবার যো পাইয়া বলিলেন "আজ না হয় রবিবার। কিন্তু তোমরা ষ্টেশন ছেড়ে এলে যে?"

হাকিম দুইজন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিলেন "তার জন্য ভাবনা নাই। আমরা সাহেবের অনুমতি নিয়ে এসেছি। এত কাঁচা কাজ আমরা করি নাই। কাল সাতটার ট্রেনে পুরুলিয়ায় ফিরে গিয়ে আবার কাছারী করব।"

সতীশচন্দ্র বড় দমিয়া গেলেন। রজনীবাবু সেখান হইতে উঠিয়া ভ্রমণের জন্য মাঠের দিকে বাহির হইলে, তিনজনে সতীশচন্দ্রের সহিত এরূপ হাস্য পরিহাস ও ঠাট্টা বিদ্রূপ আরম্ভ করিলেন যে, বেচারী তাহাতে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন।

ক্ষেত্রনাথ আগন্তুকত্রয়ের জলখাবার ও চায়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে কিরূপ উদ্যোগ-আয়োজন হইতেছে, তাহা দেখিতে গেলেন।

একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার সময় বিবাহের সভা সুসজ্জিত হইল। চন্দ্রাতপের চারিদিকে বিচিত্র বর্ণের কাগজের মালা ও ফুলের ঝালর লম্বিত হইল। ফটকটি লতাপাতায় বিমণ্ডিত হইল। সেই সময়ে বনে অসংখ্য পলাশবৃক্ষ পুষ্পিত হইয়াছিল। লোহিত বর্ণের পলাশপুষ্পগুচ্ছসমূহ হরিদ্বর্ণ পত্ররাজির মধ্যে বিন্যস্ত হওয়ায় ফটকের এমন অপূর্ব্ব শোভা ও সৌন্দর্য্য হইল যে, তাহা দেখিবার জন্য দলে দলে দর্শক-বৃন্দ সমবেত হইতে লাগিল। বিবাহ-সভা ঝাড়-দেওয়ালগিরি-সেজ প্রভৃতিতে ঝক্‌মক্‌ করিতে লাগিল। গ্রাম হইতে কিছু দূরে—অথচ সকলে দেখিতে পায়—এরূপ স্থলে, আতসবাজি পোড়াইবার বন্দোবস্ত হইল। অন্তঃপুরে বিবাহ-মণ্ডপও সুসজ্জিত হইল এবং দানসামগ্রীসমূহ সুবিন্যস্ত করিয়া রাখা হইল। সেখানে ভদ্রলোকগণের উপবেশনেরও স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজনের সুব্যবস্থা হইল। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ কাছারী বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, সতীশচন্দ্র বন্ধুগণের সহিত বিবাহসম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন। সতীশচন্দ্র বলিতেছিলেন "ভেবে দেখ, আমাদের মতন লোকের

একে তো বিবাহ করাই একটা বিষম সঙ্কট ; তার উপর, তোমরা সব এসে প'ড়ে আমার সঙ্কট শতগুণে বাড়িয়েছ। আমি মনে করেছিলাম, চুপি চুপি কাজটা সার্‌ব ; কিন্তু এই মহাত্মাটি (হরিগোপালবাবুকে দেখাইয়া) তা কর্‌তে দিলেন না। ইনিই যত নষ্টামীর গুরু! এখন তোমরা সত্য ক'রে বল দেখি, আমি বর সাজি কি করে? আর তোমাদের এই বাদ্যভাণ্ড নিয়ে পাল্কী চ'ড়েই বা যাই কি করে?"

হরিগোপাল বলিলেন "আচ্ছা, তোমার যদি এত লজ্জা হ'চ্ছে, তা হ'লে আমাদের মধ্যেই যে হোক্ বর সেজে চলুক (সকলের মধ্যে উচ্চ হাস্যধ্বনি); আর এই ব্যাগপাইপ্ বাজনাটা সঙ্গে নিয়ে যেতে যদি আপত্তি থাকে, তা হ'লে মাদোল আর কাড়ানাগ্‌রার ব্যবস্থা করা যাক্।" (সকলের মধ্যে আবার উচ্চ হাস্যধ্বনি)।

সতীশচন্দ্র বলিলেন "তোমাদের সঙ্গে এঁটে উঠা ভার। আমি যেন আজ তোমাদের কাছে চোর হ'য়ে ধরা পড়েছি!"

সুখময়বাবু বলিলেন "সত্যই তো; তুমি চোর নও তো কি? চুরী ক'রে বিয়ে কর্‌তে এসেছ, আর তুমি বুঝি সাধু পুরুষ! ডেপুটী অভয়বাবুর কাছে আজ চোরের বিচার হোক্।"

ডেপুটী অভয়বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন "চোরের

বিচার আমি অনেক আগেই করেছি, আর সাজাও ঠিক্ ক'রে রেখেছি। চোর, তুমি আমার হুকুম শোন—তুমি আজ মাথায় টোপর দিয়ে, আর বেনারসী চেলী প'রে পাল্কীতে চ'ড়ে, ব্যাগ্‌পাইপ্ বাজনা সঙ্গে নিয়ে, ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের কন্যা সৌদামিনীকে বিবাহ কর্‌তে যাও। না গেলে, তোমাকে এক জনের জেলে ছয় মাস আটক ক'রে রাখ্‌ব।" দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া আবার সকলের মধ্যে হাসি পড়িয়া গেল।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "হুজুরের চমৎকার বিচার হয়েছে! তা নইলে আপনাকে লোকে ধর্ম্মাবতার বল্‌বে কেন? এখন আপনাদের এজ্‌লাস্ ভাঙ্গলে হয় না? সতীশ, ওঠ, ওঠ; সায়ংসন্ধ্যে ক'রে প্রস্তুত হও।"

সুখময়বাবু বলিলেন "আজ্‌কে আবার সায়ংসন্ধ্যে কি, মশাই? আজ্‌কে যে পূর্ণিমা—সায়ংসন্ধ্যা নাস্তি! ভট্টাচার্য্য মশায়ের বাটীতে গিয়ে সতীশ একেবারে সায়ংসন্ধ্যে কর্‌বে। (আবার সকলের হাস্য)। বিয়ের লগ্ন ক'টার সময়?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন "রাত্রি দশটার পর।"

সুখময়বাবু বলিলেন "তবে, সতীশ ভায়া, ওঠ, ওঠ। আসরে গিয়ে দুটো কালোয়াতী গান শুন্‌তে হ'বে। বসে বসে আর ভাব্‌ছ কি? সাহস কর, সাহস কর। অত এলিয়ে পড়্‌লে চল্‌বে কেন? আরে, ভাই, একটা

রাত্রি যা কষ্ট ; তার পর আর কষ্ট কি ? কবির বাক্যটি স্মরণ কর :—

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে ?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?”

সুখময়বাবুর কথা শুনিয়া সকলে “ক্যাবাত, ক্যাবাত” বলিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

সকলে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পূর্ব্ব গগনে পূর্ণ-চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। বনে বনে কোকিল ও পাপিয়ার ঝঙ্কার হইতেছে ও ঝির্ ঝির্ করিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে। পাল্কী বেহারা সমস্তই প্রস্তুত। লোহাগড় রাজবাটী হইতে রৌপ্যমণ্ডিত আসাসোঁটা লইয়া কুড়ি জন ভৃত্য আসিয়াছে ; এসিটালিন্ গ্যাসের অনেকগুলি আলোক ও ঝাড় আসিয়াছে ; গ্রামের লোকেরা অসংখ্য মশাল লইয়া আসিয়াছে। কন্যার বাড়ী হইতে মধুর রওশন্‌চৌকী বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে একদল লোক বরের অভ্যর্থনার জন্য কাছারীবাড়ী-অভিমুখে আসিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া সুখময়বাবু প্রভৃতিও বরের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

হরিগোপালবাবু ও হাকিমবাবুদিগকে শিবিকারোহণ করিয়া যাইবার জন্য রজনীবাবু অনেক অনুরোধ করি-লেন; কিন্তু তাঁহারা বলিলেন “পাল্কী চড়ার প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন হ’লে আমরা সাইকেলে যাব। এও তো যান ?”

সতীশচন্দ্র বরসজ্জা করিয়া বাহিরে আসিলেন ; এবং রজনীবাবু ও পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া শিবিকায় আরোহণ করিলেন। তাঁহার শিবিকাটি সুন্দর পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত হইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ ও হরিগোপাল বাবু শোভাযাত্রার লোকজনকে সুবিন্যস্ত করিয়া দিলেন। সর্ব্বাগ্রে দুইটী গ্যাসের ঝাড় ; তার পর রওশনচৌকীর বাদ্য ; তৎপরে মশালশ্রেণী ; তৎপরে ব্যাগ্‌পাইপের বাদ্য ; তৎপরে আসাসোঁটাধারী বিচিত্র পরিচ্ছদ-পরিহিত ভৃত্যবৃন্দ এবং এসিটিলিন্ গ্যাস ল্যাম্প ও ঝাড়ের শ্রেণী, তৎপরে বরের পুষ্পমণ্ডিত সুসজ্জিত শিবিকা ; তৎপরে অন্যান্য শিবিকা ও সর্ব্বশেষে সাইকেল যানারোহী বন্ধুত্রয়। "সাইকেল্ যানারোহী" বলিলে তাঁহাদের ঠিক বর্ণনা করা হয় না। তাঁহারা নিজ নিজ সাইকেল্ বাম-হস্তে ধরিয়া গল্প করিতে করিতে পদব্রজেই গমন করিতে লাগিলেন। যাহাতে শোভাযাত্রার ক্রম ভঙ্গ না হয়, তজ্জন্য ক্ষেত্রনাথ, অমর, নগেন্দ্র ও তাঁহাদের ভৃত্যগণ ব্যস্ত রহিলেন।

শোভাযাত্রা অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিবামাত্র, দিগন্ত ও পর্ব্বতের কন্দরসমূহ প্রতিধ্বনিত করিয়া একটী বোমের ভীষণ শব্দ আকাশমার্গে উত্থিত হইল। সেই শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া বিহঙ্গমকুল বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশে উড্ডীন হইল ও ভয়সূচক চীৎকারধ্বনি করিতে

র, এবং অদূরে পর্ব্বতকন্দরে কতিপয় বন্যপশু ভীতিমিশ্রিত বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। বোমের শব্দ নিবৃত্ত হইতে না হইতে, শোভাযাত্রার পুরোভাগে একটী হাউই আকাশে উত্থিত হইয়া নানা বর্ণের বিচিত্র তারকামালা বর্ষণ করিল। এক মিনিট্ অন্তর এক একটী বোমের শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং এক একটী হাউই আকাশে উঠিয়া বিচিত্রবর্ণের আলোকচূর্ণ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে শত শত দর্শক এই অপূর্ব্ব ও মনোহারিণী শোভা দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। মধ্যে মধ্যে এক একটী তুব্ড়ী অপূর্ব্ব আলোক-প্রস্রবণের সৃষ্টি করিয়া সকলের চিত্ত বিমোহিত করিতে লাগিল। যথাসময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে শোভাযাত্রা উপস্থিত হইল। ফটকের নিকট পাল্কী লাগিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সমাদর-পূর্ব্বক বরের করধারণ করিয়া তাঁহাকে বহুমূল্য কারুকার্য্য-খচিত নির্দ্দিষ্ট আসনের উপর উপবিষ্ট করাইলেন। অমনই অন্তঃপুর হইতে উলুধ্বনি ও তুমুল শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। বরযাত্রিগণও যথোচিত সমাদৃত হইয়া বরের উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। বিবাহসভার শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়া সুখময় বাবু, অভয় বাবু, রজনী বাবু প্রভৃতি সকলেই চমৎকৃত হইলেন। এই আরণ্য প্রদেশেও যে এরূপ আড়ম্বর সম্ভবপর হইতে পারে,

তাহা তাঁহাদের বিস্ময়ের বিষয় হইল। পান তামাক লইয়া ভৃত্যেরা সকলের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল।

সভায় সকলে উপবিষ্ট হইলে, দুইটী ব্রাহ্মণ বালক এই বিবাহোপলক্ষে রচিত একটী চমৎকার গান গাহিল। তাহাতে "সতীশ-সৌদামিনী"র সুখ, সম্পদ্ ও মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা ছিল। গান শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন। তৎপরে সঙ্গীতজ্ঞ কতিপয় ব্রাহ্মণ যুবক বেহালা, এস্‌রাজ, তানপুরা ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে নানা প্রকার বৈঠকী সঙ্গীতের দ্বারা সকলের চিত্ত বিনোদন করিলেন। পরিশেষে লোহাগড় রাজ-বাটীর ওস্তাদজীর গান আরম্ভ হইল। তাঁহার গান শুনিয়া সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া রহিলেন।

বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মণগণের ও সভাস্থ সকলের অনুমতি গ্রহণ করিয়া স্ত্রী-আচারাদির অনুষ্ঠানের জন্য বরকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। পরে কন্যাদানের সময় বরযাত্রী ও অভ্যাগত ভদ্র ব্যক্তিগণকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিলেন। দরিদ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বরের জন্য যে-সমস্ত দানসামগ্রী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। যখন সালঙ্কারা সৌদামিনী বিবাহ-মণ্ডপে আনীত হইল, তখন রাজ্ঞীর ন্যায় তাহার সৌন্দর্য্য ও বেশভূষা দেখিয়া রজনী বাবু, সুখময় বাবু, অভয় বাবু,

হরিগোপাল বাবু প্রভৃতি সকলেই বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইলেন। সুখময় বাবু অস্ফুটস্বরে বলিলেন "সাধে কি সতীশ ভায়া এই বল্লভপুরে ফাঁদে পা দিয়েছে ?"

অভয় বাবু বলিলেন "সাক্ষাৎ রাজরাণী হে রাজরাণী !"

হরিগোপাল বাবু বলিলেন "এঁর সৌদামিনী নামটা ঠিক হয় নাই। এঁর নাম 'স্থির সৌদামিনী' রাখা উচিত ছিল।"

যথাসময়ে কন্যাদান হইয়া গেল। সকলে আবার বিবাহ-সভায় আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রওশন্‌চৌকী ও ব্যাগপাইপ আবার বাজিয়া উঠিল এবং সভার সম্মুখবর্ত্তী মাঠে আবার বোমের ভীষণ নাদ উত্থিত হইয়া পর্ব্বতগাত্র ও কন্দরসমূহ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। আতশবাজি দেখিয়া গ্রামবাসিগণ যারপরনাই আনন্দিত হইল। পরিশেষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া প্রচুররূপে পরিতুষ্ট করা হইলে, কোকিল ও পাপিয়ার ঝঙ্কারে রজনী প্রভাত হইল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাতে কাছারীবাটীতে চা-পান করিয়া হরিগোপাল বাবু প্রভৃতি সাইকেলে চাপিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মধ্যাহ্নে কুশণ্ডিকা সমাপ্ত হইল। অপরাহ্ন সময়ে বরকন্যার বিদায়ের উদ্যোগ হইল।

সেই সময়ে রজনী বাবু, ক্ষেত্রবাবু প্রভৃতি সকলেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। রজনী বাবু বরকর্ত্তা রূপে কাঙ্গালী ও অন্ধ-খঞ্জ-দিগের মধ্যে অর্থ বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। গ্রামবাসীরা গ্রামভাটী চাহিতে আসিল। গ্রামের বুড়া শিবের জীর্ণ মন্দির সংস্কারের জন্য পঞ্চাশ টাকা ও গ্রামে নূতন স্থাপিত পাঠশালার জন্য একশত টাকা প্রদত্ত হইল। যখন রজনীবাবু সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কাছারীবাটী অভিমুখে আসিতে উদ্যত হইলেন, ঠিক সেই সময়ে ফটকের নিকটে একদল ভুমিজ যুবতী তাঁহার গমনপথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "এ হে, তুই কুথা যাচ্ছ্স্; তুই আমাদের সঙ্গ্-ছাড়ানি দিয়ে যা।" রজনীবাবু বড় বিপদে পড়িলেন; তিনি তাহাদের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ক্ষেত্রনাথও ব্যাপার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না; তিনি যুবতীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"কি গো, তোমরা কি চাও?" যুবতীরা বলিল "কি আবার চাইবো হে? তোরা আমাদের সঙ্গ্‌-ছাড়ানি দিয়ে যা।" সেই সময়ে একজন স্থানীয় ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে আসিয়া বলিলেন "মশায়, কনে এই গ্রামে এদের সঙ্গে এতদিন ছিল; আজ আপনারা তাকে এদের সঙ্গ ছাড়িয়ে আপনাদের দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই জন্য এদের মনঃকষ্ট হচ্ছে। সেই মনঃকষ্ট শান্তির জন্য এরা কিছু পাবার দাবী রাখে। তারই নাম সঙ্গ্‌-ছাড়ানি।" রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন "ওঃ, এতক্ষণে বুঝ্‌লুম। বেশ কথাটি তো? সঙ্গ-ছাড়ানির জন্য এদের কি দিতে হ'বে?" সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন "আপনার যা অভিরুচি হয়; এদেশে সঙ্গ-ছাড়ানিও একটী গ্রামভাটী।" রজনী বাবু পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া অগ্রবর্ত্তিনী যুবতীর হস্তে প্রদান করিলেন। যুবতী আনন্দে এক মুখ হাসিয়া বলিল "ঢের দিয়েচুস্, ঢের দিয়েচুস্, যা তোরা এখন যা।" এই বলিয়া তাঁহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিল।

রজনী বাবু রাস্তায় বাহির হইয়া হাসিয়া অস্থির হইলেন। তিনি ক্ষেত্র বাবুকে বলিলেন "এদেশের ভারি অদ্ভুত নিয়ম দেখ্‌ছি। আমাদের দেশের মেয়েরা শয্যা-তোলানি বাসর-জাগানি ইত্যাদি আদায় করে। এদেশে দেখ্‌ছি আবার সঙ্গ্‌-ছাড়ানি আছে। গ্রামভাটী প্রথাটি

কোনও-না-কোনও আকারে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। আচ্ছা ক্ষেত্রবাবু, আপনি বল্‌তে পারেন, এ প্রথার উৎপত্তি কিরূপে হ'ল ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "উৎপত্তি বলা বড় শক্ত ; তবে আমার মনে হয়, এই প্রথাটি প্রাচীন কালের বিবাহ-প্রথা থেকেই উৎপন্ন হ'য়ে থাক্‌বে। প্রাচীনকালে বল প্রয়োগ করে কন্যাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়া হ'ত। সেই কন্যা-হরণের ব্যাপার নিয়ে দুই দল অর্থাৎ দুইটী গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ, কলহ, এমন কি, যুদ্ধ ও রক্তপাত পর্য্যন্ত হ'ত। শেষকালে, কন্যার অভাব-জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কন্যার পিতাকে ও গ্রামবাসী-দিগকে কিছু টাকা কড়ি দিয়ে বিবাদ মিটানো হ'ত। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে ভীষ্মের অম্বা ও অম্বালিকা-হরণ. অর্জ্জুনের সুভদ্রা-হরণ প্রভৃতি পৌরাণিক গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। বলপূর্ব্বক কন্যা-হরণ করার পরিণাম বড় ভয়ানক দেখে, শেষে বিবাহার্থী যুবক বা তার অভি-ভাবক কন্যার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব কর্‌ত ও তাঁকে টাকা কড়ি বা গোমহিষ দিয়ে রাজি করে কন্যা নিয়ে যেত। কিন্তু কন্যার পিতা একলা রাজি হ'লে চল্‌ত না, গ্রামবাসীদেরও রাজি করা আবশ্যক হ'ত ; কেননা কন্যার পিতা 'গ্রামনী' অর্থাৎ গ্রামপতি বা গ্রামের পঞ্চায়েতের অনুমতি ব্যতীত কোনও কাজ কর্‌তে

পারত না। এখনও পল্লীগ্রামে কোনও সামাজিক কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে গ্রামনী বা 'গ্রামুন্নি'র অনুমতি নিতে হয়। গ্রামবাসীদের সন্তুষ্ট কর্‌বার জন্যই এই গ্রামভাটীর সৃষ্টি হ'য়ে থাকবে।"

রজনীবাবু বলিলেন "আপনার কথা যথার্থ ব'লেই মনে হচ্ছে। শুনেছি, বিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই বাঙ্গলা দেশেই বিবাহের সময় গ্রামবাসীরা একটা যুদ্ধের অভিনয় করত। অর্থাৎ, বরের পাল্কী গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র গ্রামের ছেলেরা ও যুবকেরা পাল্কীতে ঢিল মারত। তারপর তাদের কিছু দিতে স্বীকার করলে তবে তারা ক্ষান্ত হ'ত। এই সব প্রথার বিদ্যমানতা দ্বারা দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমরা সেই প্রাচীন কালের অসভ্য সমাজের প্রথা হ'তে বড় বেশী দূরে যাই নাই।"

যতীন্দ্রনাথ কিছু দিন পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে বিবাহ করিতে গিয়া বিবাহের সময় শ্যালকদের কাছে কিল-চাপড় এবং শ্যালীদের হাতে এক-আধটা কানমলাও খাইয়াছিলেন। সেই ব্যাপারটি তাঁহার স্মরণ হওয়ায়, তিনি বলিলেন "যুদ্ধের অভিনয়ই বটে! পাড়াগাঁয়ে বিয়ের সময় শ্যালারা কিল চাপড় মারতে, আর শ্যালীরা কান ম'লতেও ছাড়ে না। তারা বলে যে বিয়ের সময় কিল মারা ও কানমলা একটী সনাতনী প্রথা ও বিয়ের একটী প্রধান অঙ্গ। সনাতনী প্রথা হোক্ আর নাই হোক্, এটি যে সেই অসভ্য

সমাজের যুদ্ধ-বিগ্রহের একটী অবশিষ্ট নিদর্শন, সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ নাই।”

রজনীবাবু ও ক্ষেত্র বাবু উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “যতীন্দ্র বাবুর অনুমান বোধ হয় মিথ্যা নয়।” এইরূপ গল্প করিতে করিতে তাঁহারা কাছারী-বাটীতে উপনীত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বরকন্যা বিদায় গ্রহণ করিয়া কাছারীবাটীতে উপস্থিত হইল। সতীশচন্দ্র শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া বৈঠকখানায় প্রবিষ্ট হইলেন। সৌদামিনী তাহার দাসীর সমভিব্যাহারে মনোরমার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল।

* * * * * * *

যে গ্রামে সৌদামিনী জন্মগ্রহণ করিয়া এত বড় হইয়াছে, যে স্থানে সে বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, যে স্থানের সহিত তাহার কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে, সেই গ্রাম ও গ্রামবাসি-গণের প্রতি মমতা ত্যাগ করিতে সৌদামিনীর হৃদয়গ্রন্থি যেন ছিন্ন হইতে লাগিল। স্বর্গগতা জননীদেবীর স্মৃতি, বৃদ্ধ পিতা, পিতৃষসা ও ভ্রাতৃগণের স্নেহ, বৌদিদির সাদর যত্ন, প্রতিবাসিনী মহিলাগণের সস্নেহ ব্যবহার, সঙ্গিনী-গণের সুমধুর সখ্য, আর সর্ব্বোপরি মনোরমার অকপট স্নেহ ও সৌহার্দ্দ্য—এই সমস্ত স্মরণ করিয়া, এবং এই সমস্ত হইতে অতঃপর তাহাকে চিরদিনের জন্য দূরে

থাকিতে হইবে, ইহা মনে করিয়া সৌদামিনী দুঃখে ও কষ্টে বিহ্বল হইয়াছিল এবং অদ্য প্রায় সর্ব্বক্ষণই নীরবে ক্রন্দন করিয়াছিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার বৃহৎ চক্ষু দুটী শিশিরসিক্ত রক্তকমলদলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। মনোরমার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ও মনোরমাকে দেখিবামাত্র, তাহার হৃদয়ের আবেগ আবার উদ্বেল হইয়া উঠিল এবং সে অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মনোরমারও চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। কিন্তু তিনি কোনও রূপে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন "ও কি কর, সদু? ছিঃ, কাঁদ্‌তে আছে?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনিও অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

নরু সেই সময়ে ছুটিয়া আসিয়া উভয়কে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল "মা, মাসী-মা, তোমরা কাঁদ্‌ছ কেন? মাসী-মা, তুমি কোথায় যাচ্ছ, বলনা? আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

সৌদামিনী আর থাকিতে পারিল না। একবারে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরে কোনও রূপে সংযত হইয়া নরুকে ক্রোড়ে লইয়া ছাদের উপর উঠিল। সেখানে সে নরুকে বলিল "লক্ষ্মী-ছেলে, বাবা ছেলে, তুমি কেঁদো না। আমি তোমার কাকা বাবুর সঙ্গে কল্‌কাতায়

যাচ্ছি। সেখান থেকে তোমার জন্য একটা গাড়ী, আর একটা ছোট বন্দুক নিয়ে আস্‌ব। তুমি আমার জন্য কেঁদো না। আমি আবার শীগগীর আস্‌বো। বুঝলে ?”

নরু বলিল “হঁা ; আমি কাঁদ্‌ব না, মাসী-মা। তুমি আমার জন্যে কাকা বাবুর মতন একটা গাড়ী নিয়ে আস্‌বে ? তুমি আবার কবে আস্‌বে ?”

সৌদামিনী বলিল “শীগগীর আস্‌ব।”

মনোরমা ছাদে আসিয়া সৌদামিনীকে বলিলেন “চল, সদু, নীচে চল। তুমি কিছু খাবে এস।”

সৌদামিনী বলিল “না, দিদি, আমি কিছু খাব না ; তুমি চল ; আমি যাচ্ছি।” এই বলিয়া সৌদামিনী সেই ছাদ হইতে একবার চারিদিকে চাহিয়া পাহাড়, নদী, বন, জঙ্গল, শস্যক্ষেত্র, গ্রাম ও তাহার পিতার বাড়ীটি দেখিয়া লইল। আবার তাহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সৌদামিনী ঈষৎ সংযত হইয়া তাহার দক্ষিণ হস্তের আনত অঙ্গুলিগুলি মস্তকে স্পর্শ করিয়া তাহার প্রিয় জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

ভৃত্যেরা গো-যানে জিনিষপত্র বোঝাই করিয়া অগ্রেই ষ্টেশনাভিমুখে গমন করিয়াছিল। অতঃপর বল্লভপুর হইতে পাল্কী না উঠিলে, রাত্রি আটটার ট্রেন ধরা কঠিন কার্য্য হইবে। এইজন্য ক্ষেত্রনাথ মনোরমাকে

ত্বরা প্রদান করিতে লাগিলেন। মনোরমা সৌদামিনীর খোঁপাটি মনোজ্ঞ করিয়া বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহার কপালে একটী ছোট সিন্দূরের টিপ্ দিলেন। তৎপরে দুইটী স্বর্ণমণ্ডিত শাঁখা বাহির করিয়া সৌদামিনীকে বলিলেন "এই দুইটী তোমার দিদির উপহার; এস, তোমার হাতে পরিয়ে দিই।" সৌদামিনী আপত্তি করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মনোরমা দুঃখিত হইয়া বলিলেন "সদু, তোমার দিদিকে মনে রাখবার জন্য হাতে কিছুই রাখবে না?"

সৌদামিনী আর আপত্তি করিতে পারিল না। সে মনোরমার দিকে হাত বাড়াইয়া আবার অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শাঁখা পরানো শেষ হইলে, সৌদামিনীর ভয়ানক আপত্তি সত্ত্বেও, মনোরমা তাহার পদধূলি লইয়া নরু ও বিভার মাথায় দিলেন।

মনোরমার আগ্রহাতিশয্যে সৌদামিনী কিছু না খাইয়া থাকিতে পারিল না। এদিকে রজনীবাবু সতীশচন্দ্র প্রভৃতিও কিছু জলযোগ করিয়া লইলেন। যথাসময়ে সকলে ক্ষেত্রনাথ প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শিবিকারোহণ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে শিবিকাগুলি দৃষ্টিপথের অতীত হইল। নরু বৈঠকখানার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ মাসীমার জন্য কাঁদিল।

নগেন্দ্র, অমরনাথ ও লখাই সর্দ্দার গো-যানগুলির

সহিত অগ্রেই ষ্টেশনে গিয়াছিল। সুতরাং, ক্ষেত্রনাথ আর ষ্টেশন পর্য্যন্ত গমন করিলেন না। তিনি বৈঠক-খানার বারাণ্ডায় কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া অবশেষে নকুর সহিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। সূর্য্যাস্তের পর কৃষ্ণা-প্রতিপদের তরল অন্ধকার সেই নিস্তব্ধ গ্রাম-খানির উপর অবতীর্ণ হইয়া নিরানন্দ গ্রামবাসিগণের হৃদয়ের তাৎকালিক অবস্থাটি যেন সূচিত করিয়া দিল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সতীশ-সৌদামিনীর বিদায়ের পর ক্ষেত্রনাথ দুই তিন দিন কোনও কাজে ভাল করিয়া মন লাগাইতে পারিলেন না। তাহাদের শুভ বিবাহোৎসবটি তাঁহার কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যে যেন ক্ষণিক সুখস্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দুই চারি দিন পরে সেই স্বপ্নের মোহ ভাঙ্গিয়া গেলে, জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা তাঁহার মানসচক্ষুর সম্মুখে আবার দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল, এবং তিনি অদম্য উৎসাহে সেই সংগ্রামে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলেন।

ক্ষেত্রনাথ একদিন মাধবদত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বল্লভপুরে একটী হাট-স্থাপনের প্রস্তাব-সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। মাধবদত্ত বলিলেন যে, সৌদামিনীর বিবাহের সময় বল্লভপুরে গিয়া তিনি তাঁহার উক্ত প্রস্তাব অবগত হইয়াছেন। একটী হাট স্থাপিত হইলে, সর্ব্বসাধারণের যে সবিশেষ সুবিধা হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু হাটে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে হইলে, হাটের নিকট আড়ত এবং কাপড়, মশলা, বাসন ও মনোহারীর দোকান স্থাপন করা কর্ত্তব্য। পুরুলিয়ার দরে, কিম্বা দুই এক আনা উচ্চ দরেও দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিলে, লোকে পুরুলিয়ায় না গিয়া বল্লভপুরেই জিনিষপত্র ক্রয় করিতে আসিবে।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আমিও তাই ভেবেছি। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্র কোনও একটা কাজ কর্‌তে চায়; কিন্তু সে ছেলে মানুষ, একলা কাজ চালাতে পার্‌বে কি না, তাই ভাব্‌ছি। আমার নিজের সময় বড় অল্প; এক কৃষিকাজ নিয়েই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি। আমি নিজে দেখ্‌তে পার্‌লে কোনও কথা ছিল না।"

মাধবদত্ত মহাশয় কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "দেখুন, ব্যবসাই বলুন, আর কৃষিকাজই বলুন, নিজে না দেখতে পার্‌লে, কোনটিতেই লাভ হয় না। কথায় বলে 'আঁতে পুতে চাষ'; ব্যবসা সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। আমিও নিজে কৃষি-কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি; নিজে কোনও ব্যবসাতে লিপ্ত হ'তে পারি না। আমার বড় ছেলে হরিধন মাঝে মাঝে এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি সুবিধাদরে ক্রয় ক'রে কখনও পুরুলিয়ায়, আর কখনও বা কল্‌কাতায় গিয়ে বেচে আসে। তারও একটা কাজ কর্‌বার খুব ঝোঁক আছে। বল্লভপুরে হাট স্থাপিত হবে এই কথা শুনে সে বল্‌ছিল যে, সেখানে গিয়ে সে একটী দোকান খুল্‌বে। আমি এখনও তার প্রস্তাবে সম্মত হই নাই। আপনার কাছে শুন্‌ছি, আপনার পুত্র নগেন্দ্রও কিছু একটা কাজ করতে চায়। কিন্তু আপনিও এখন পর্য্যন্ত কিছু স্থির কর্‌তে পারেন নাই। তারা যখন কিছু কাজ কর্‌তে চায়, তখন একটা কাজে তাদের

লিপ্ত ক'রে দেওয়া আবশ্যক। নতুবা, পরে কোনও কাজে আর তাদের তেমন উৎসাহ থাক্‌বে না। আমার মনে হয়, হরিধন আর নগেন্দ্র যদি একত্র মিলে কাজ করে, তা হ'লে কতকটা সুবিধা হ'তে পারে। আপনি নিকটে আছেন, সর্ব্বদা তাদের কাজের তত্ত্বাবধান কর্‌তে পার্‌বেন; আর আমিও অবসর-মত গিয়ে দেখে শুনে আস্‌ব। টাকাকড়ি সব আপনার কাছেই থাক্‌বে। রোজ যা নগদ বিক্রয় হবে, তহবীল মিলিয়ে আপনার কাছে তা জমা রাখ্‌বে। আপনি যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হ'ন, আর অংশমত টাকা দেন, তা হলে, না হয়, একটা যৌথ-কারবার খোলা যায়।"

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপাততঃ কি কি বিষয়ের কারবার খুল্‌তে চান?"

মাধবদত্ত বলিলেন "প্রথমে একটী আড়ত খুল্‌তে চাই। আড়তে চাল, কলাই, গম, সরিষা, সব রকমেরই শস্য থাক্‌বে, খরিদ্দারও অনেক আস্‌বে। যারা জিনিষ বেচ্‌তে আস্‌বে, তাদের জিনিষ বেচে দেওয়ার জন্য আমরা দস্তরী পাব; যারা ক্রয় কর্‌বে, তাদের গরজ অনুসারে তারাও সময়ে সময়ে কিছু দস্তরী দেবে। আমরা কেবল ব্যাপারীর জিনিষপত্রগুলি উচিত দরে বেচে দিয়ে ক্রেতার নিকট থেকে টাকা আদায় করে দেব। বেচা-কেনা সব নগদ টাকায় হ'বে। ধারে কারেও জিনিষ

দেওয়া হবে না। তবে যারা মাল নিয়ে আস্‌বে, তাদের মাল বিক্রয় না হ'লে, তারা কখনও কখনও আমাদের গুদামে মাল রেখে যাবে; আর হয়ত কখনও কখনও সেই মালের উপরে তাদের কিছু টাকাও দাদন করতে হবে। এতে বিশেষ কিছু ঝোঁক নাই। এই জন্য আপাততঃ আমাদের পাঁচশত টাকা মূলধন চাই। চাল, কলাই ইত্যাদি ব্যতীত, লাহার সময়ে লাহা, তসরের সময়ে তসর, হরিতকী আমলা কুসুমবীজ প্রভৃতি বনজ মালের সময় বনজ মাল,—এই সমস্ত দ্রব্যও আড়তে আমদানী হবে। কিন্তু এই কাজের জন্য একটী পাকা কারবারী লোক চাই। নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে মহেশহালদার নামে একজন গন্ধবণিক্ আছেন। সেই লোকটি খুব ভাল ও হুঁসিয়ার লোক—এই সব কাজে একপ্রকারের ঘুণ। তাঁকে খাওয়াপরা ব্যতীত মাসে দশটি টাকা বেতন দিলেই চল্‌বে। এছাড়া মাল ওজন করা ও অন্যান্য কাজের জন্য আরও দুই তিন জন লোক রাখ্‌তে হবে। তাদের বেতন ও বাসাখরচ ইত্যাদি বাবতে মাসে ৫০।৬০ টাকা খরচ হ'তে পারে। কিন্তু যদি আড়ত চলে, তা হ'লে ঐ এক আড়ত থেকেই মাসে দুইশত টাকা আয় হ'বে। আর আড়ত না চল্‌বার তো আমি কোনও কারণ দেখি না। হাট বসাবার আগে চারি-দিকের গ্রামে ঢোল দেওয়াতে হবে। একবার লোক-

জন আস্‌তে আরম্ভ কর্‌লে মুখে মুখে হাটের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আমি ঝালদ্যা, তুলীন, চাঁড়িল, বেগুনকুদ্দ, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে সংবাদ পাঠিয়ে দেব। আমাদের নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামের গন্ধবণি-কেরাও তাঁদের জিনিষপত্র হাটে বেচতে নিয়ে আস্‌-বেন। এ অঞ্চলের সব লোককেই আমি চিনি, আর মহেশ হালদারও চেনেন। সুতরাং ঠক্‌বার সম্ভাবনা খুব অল্প।

"এই হ'ল একটী কারবার। এই কারবার ছাড়া হাটের নিকটে আমাদের তিনটি দোকান খুল্‌তে হবে। একটী কাপড় আর বাসনের দোকান, একটী মশলার দোকান, আর একটী মনোহারীর দোকান। এখন বেশী পুঁজির দরকার নাই। কাপড় ও বাসনের দোকানের জন্য আপাততঃ হাজার টাকা পুঁজি হ'লেই যথেষ্ট হবে। এদেশের লোকে যে রকম কাপড় পরে ও পছন্দ করে, সেই রকম কাপড়ই বেশী রাখতে হবে; অন্যান্য রকমের কাপড়ও আবশ্যকমত রাখ্‌লেই চল্‌বে। বাসনও নানা রকমের আনাতে হবে। মশলার দোকানের পুঁজি আপাততঃ পাঁচশত টাকার বেশী দরকার হবে না। মনোহারী দোকানেরও পুঁজি সাতশত টাকার বেশী নয়। মনোহারী দোকানে বিলক্ষণ লাভ হবে। এদেশের লোকে যে যে জিনিষ পছন্দ করে, সেই সমস্ত জিনিষই বেশী রাখ্‌তে হবে। মনোহারী দোকানে অল্প দামের আনয়া,

চিরুণী, কাচের বাটী, ফিতে, গেঞ্জী, নানা রঙ্গের কাচের মালা, পলার মালা, পুতির মালা, দুই এক ডজন মোজা, দুই এক ডজন রুমাল, শ্লেট্ পেন্‌শিল্, কলাইকরা লোহার বাটী রেকাব প্রভৃতি, কালী, কলম, চিঠির কাগজ, সাদা কাগজ, বাদামী কাগজ, ছুরী, কাঁচি, ছুচ-সূতা, বাণ্ডিল, লণ্ঠন, হ্যারিকেন্ লণ্ঠন, ল্যাম্প, বাল্‌টী, অল্পদামের নানা প্রকার সুগন্ধি তৈল, সাবান, তোয়ালে, চীনামাটীর পুতুল, ছেলেদের নানারকমের খেলনা যেমন বাঁশী ঝুম্‌ঝুমী ইত্যাদি, তাস, দুই দশখানা বটতলার রামায়ণ মহাভারত ও পাঁচালী, ছেলেদের জন্য বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ইত্যাদি, অল্পমূল্যের পশমের কম্ফর্টার ও টুপি—এই সব জিনিষ রাখ্‌তে হবে। এ ছাড়া, এই দোকানে তারের চালুনী, লোহার কড়া, ছান্‌তা, হাতা, বেড়ী, কোদাল, কুড়ুল, টাঙ্গি, গাঁতি, লাঙ্গলের ফাল, স্ক্রু, জলুই, গজাল, কাঁটা, এই সবও রাখ্‌তে হবে। এদেশের লোকেরা এই-সকল দ্রব্য সর্ব্বদাই চায়, আর তা কিন্‌বার জন্য পুরুলিয়া, ঝ্যাল্‌দা, বলরামপুর প্রভৃতি স্থানেও যায়। কাট্‌তীর মুখেই লাভ; জিনিষ যেমন কাট্‌তি হবে, তেমনই লাভ হবে।

"এখন ধরুন, আড়তের জন্য আপাততঃ ৫০০৲ টাকা কাপড় বাসনের দোকানের জন্য ১০০০৲ টাকা, মশলার দোকানের জন্য ৫০০৲ টাকা, আর মনোহারী দোকানের

জন্য ৭০০৲ টাকা, এই মোট ২৭০০৲ টাকা পুঁজির আবশ্যক। 'এছাড়া গুদামের জন্য করুগেটেড্ লোহার ছাদের একটী ঘর, আর তিনটি দোকানের জন্যও ঐরূপ ছাদের তিনটি ঘর প্রস্তুত কর্‌তে হবে। তা'তেও ৫০০ টাকা খরচ হবে। তা হ'লে মোট ৩২০০৲ টাকার দরকার। এ ছাড়া ৭০০।৮০০ টাকা মৌজুৎ রাখ্‌তে হবে। তা হ'লে ৪০০০৲ টাকা মূলধন আবশ্যক। আপনি যদি ২০০০৲ টাকা দেন, আর আমিও ২০০০৲ টাকা দিই, তা হ'লে বল্লভপুরে একটী বেশ কার্‌বার চল্‌বে। গুদাম আর দোকানগুলি পাশাপাশি হ'লেই ভাল হয়। হরিধন যদি বাসন-কাপড়ের দোকানে থাকে, আমার মেজছেলে কৃষ্ণধন যদি মশলার দোকানে থাকে, আপনার নগেন্দ্র যদি মনোহারী দোকানে থাকে, আর মহেশ হালদার যদি আড়তের জিম্বায় থাকেন, তা হ'লে ৩৫০০৲ টাকা মূলধন খাটিয়ে যদি বৎসরের শেষে সাড়ে তিন হাজার টাকাই লাভ হয়, তা'তেও বিস্মিত হবেন না।"

ক্ষেত্রনাথ সত্যসত্যই বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সাড়ে তিন হাজার টাকা মূলধনে সাড়ে তিন হাজার টাকা লাভ কি রকমে হ'বে, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। লাভের হার কি খুব বেশী ধর্‌বেন ?"

মাধবদত্ত হাসিয়া বলিলেন "আরে, মশায়, না, না।

আপনি নিজে গন্ধবেণে, এ কথাটা আর বুঝ্‌তে পার্‌লেন না ? প্রত্যেক চালানে টাকায় যদি দুই আনা লাভ থাকে, আর বৎসরের মধ্যে আটবার সেই টাকার জিনিষ আনিয়ে যদি ঐ হারে লাভ করা যায়, তা' হ'লে বৎসরের শেষে টাকায় টাকা লাভ হ'বে। এই জন্যই তো বলছিলাম, কাট্‌তির মুখেই লাভ। পুরুলিয়ার অনেক দোকানদার টাকায় দুই আনারও অধিক লাভ রাখে। আমরা এখানে টাকায় দুই আনা লাভ রাখ্‌লে, পুরুলিয়ার দরেই জিনিষ বেচতে পারব। যদি জিনিষের কাটতি বেশী হয়, তা হ'লে লাভের হার কম করলেও ক্ষতি নাই। কেননা কাট্‌তির মুখেই লাভ। বৎসরের মধ্যে যত বেশীবার চালান আস্‌বে, লাভের পরিমাণও ততই বাড়্‌বে।" এই বলিয়া মাধবদত্ত কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে বলিলেন "হাটে লোকের আমদানী আর বেচাকেনা বেশী রকম হ'লে, অন্য একটী উপায়েও আপনার কিছু আয় হবে। যত লোক হাটে জিনিষ বেচ্‌তে আস্‌বে সকলেরই নিকট আপনি কিছু কিছু তোলা পাবেন। তাতেও আপনার বাৎসরিক দুই তিন শত টাকা আয় হ'তে পারে।" পুনর্ব্বার কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মাধবদত্ত আবার বলিতে লাগিলেন "দেখুন, আমি এই অঞ্চলের সব হাটই দেখেছি। সে-সব হাটে দুই একটী ছোট আড়ত, আর

দুই একটী সামান্য দোকান আছে। কিন্তু আমি যে রকম দোকানের কথা বল্‌লাম, সে রকম দোকান এক পুরুলিয়া ব্যতীত এ অঞ্চলে বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এ অঞ্চলের কোন কোন দোকানদার ঠিক যেন ডাকাতের মত ব্যবহার করে। সাঁওতাল, কুড়মি আর পাড়াগাঁয়ের লোক দেখ্‌লেই তারা তাদের ঠকিয়ে বসে। আমরা খরচ পুষিয়ে আর কেবল সামান্য লাভ রেখে জিনিষ বেচ্‌ব। আমাদের সাধুতায় লোকে একবার বিশ্বাস-স্থাপন কর্‌লে, সহজে সে বিশ্বাস টল্‌বে না। ব্যবসায়ে সাধুতা না থাকলে, তায় কখনও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। গন্ধবেণের একটী উপাধি হচ্ছে সাধু, তা আপনি জানেন।”

ক্ষেত্রনাথ মাধবদত্ত মহাশয়ের নিকট কারবারের প্রস্তাব শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন “আপনি একজন বহুদর্শী, প্রবীণ ও পাকা লোক। আপনার কাছে যা শুন্‌লাম, তা’তে মনে হয়, আপনার পরামর্শ অনুসারে কাজ কর্‌লে, নিশ্চয়ই কারবারে লাভ হবে। কিন্তু মশলা, মনোহারী ও বাসনকাপড়ের দোকানে এক এক জন লোক থাক্‌লে তো চল্‌বে না। আরও সহকারী লোক চাই।”

মাধবদত্ত হাসিয়া বলিলেন “তার জন্য ভাব্‌ছেন কেন, ক্ষেত্রবাবু? কারবারে যদি লাভ হয়, এক একটা

দোকানে এক এক জন সহকারী কেন, পাঁচ পাঁচ জন সহকারী নিযুক্ত করা যাবে। লোকের অভাব হবে না। খাওয়া পরার ব্যবস্থা থাক্‌লে, আর মাসে মাসে কিছু বেতন দিলে অনেক সহকারী পাওয়া যাবে। এ অঞ্চলে স্বজাতির অনেক ছেলে বেকার বসে আছে। তাদের মধ্যেই একজনকে এখন পাক কর্‌তে নিযুক্ত করা যাবে। সে পাকও কর্‌বে, আর অবসর-মত দোকানেও বস্‌বে। ডাল, ভাত আর একটা তরকারী রাঁধলেই যথেষ্ট হবে। ব্যবসা করতে গেলে কি নবাবী করা চলে? আমার ছেলেরাও সেখানে থাক্‌বে; সকলে যা খাবে, তারাও তাই খাবে। প্রথমে দুঃখ না করলে কি কখনও সুখ হয়?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "আপনি যা বল্‌ছেন, তা খুব সত্য। যাই হোক্‌, আপনার প্রস্তাবটী আমি বেশ ক'রে বুঝে দেখি; তারপর শীঘ্রই আপনাকে আমার মত জানাব।" এই বলিয়া তিনি মাধবদত্ত মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বল্লভপুরে প্রত্যাগত হইলেন।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথ গৃহে আসিয়া মাধবদত্ত মহাশয়ের দোকান করার প্রস্তাব মনোরমাকে জ্ঞাপন করিলেন। মনোরমা সকল কথা শুনিয়া বলিলেন "আমি মেয়েমানুষ; কাজ-কারবারের কথা কিছুই জানি না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, দত্ত মশায়ের প্রস্তাবটি ভাল। নগিন ছেলেমানুষ; একলা কাজকর্ম্ম চালাতে পার্‌বে না। দত্তমশায়ের ছেলেরাও যদি তার সঙ্গে একত্রে কাজ করে, তা হ'লে কোনও ভাবনা থাকৃবে না। তুমি দত্তমশায়ের প্রস্তাবে সম্মতি দাও গে। তুমি তো দুই হাজার টাকা দিতে পার্‌বে ?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তা পার্‌ব। ব্যাঙ্কে কেবল বাৎসরিক শতকরা চারি টাকা সুদে টাকা জমা আছে। তাতে বছরের শেষে দুই হাজার টাকার সুদ মোটে ৮০৲ টাকা হয়। দত্তমশায় বল্‌ছিলেন যে, বেশ বুদ্ধিবিবেচনা ক'রে কাজ চালাতে পার্‌লে, বছরের শেষে দুই হাজার টাকায় দুই হাজার টাকা লাভ হ'তে পারে! সে কথা আমি অবিশ্বাস করি না। কথায় বলে 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ'। কৃষিকাজেও বিলক্ষণ লাভ হয়। কিন্তু বাণিজ্যে যে রকম লাভের সম্ভাবনা থাকে, এমন আর কিছুতেই থাকে না। বাণিজ্য ও কৃষি, এই দুইটিই বৈশ্যের বৃত্তি। আমি কৃষি-

কাজের তত্ত্বাবধান কর্‌ব, আর এদের কারবারও নিজে দেখ্‌তে পার্‌ব। নগিনের জন্য কি কর্‌ব, তা আমি ভেবে কিছু ঠিক্ কর্‌তে পারি নাই। সেই কারণে, আজ দত্তমশায়ের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে গেছ্‌লাম। তিনি নিজেই যখন যৌথ কারবার কর্‌বার প্রস্তাব কর্‌লেন, তখন ভালই হ'ল।"

পরদিন বৈকালে ক্ষেত্রনাথ আবার মাধবদত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মাধব দত্ত তাহা অবগত হইয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি হরিধন ও কৃষ্ণধনকে ডাকিয়া সকল কথা বলিলেন। তাঁহারাও তাহা অবগত হইয়া আনন্দিত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে মাধব দত্ত দুই পুত্রের সহিত বল্লভপুরে আসিয়া ক্ষেত্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কোথায় গুদাম ও দোকান-ঘর হইবে, এবং কোন্ দিকে হাটের জন্য দুইচালা ঘরসমূহ নির্ম্মিত হইবে, তাহা তাঁহারা স্থির করিলেন। কাছারী-বাড়ীর দক্ষিণ দিকে সম্মুখবর্ত্তী বৃহৎ মাঠের নিম্নেই রাস্তা। রাস্তা হইতে কাছারীবাড়ীর এই মাঠে প্রবিষ্ট হইতে হইলে, একটী ফটকের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। উত্তরমুখ হইয়া ফটকে প্রবিষ্ট হইলে, বামভাগে রাস্তার ধারে বাবুর্চ্চিখানা, খানসামাদের ঘর ও গুদাম-ঘর, আর দক্ষিণভাগে রাস্তার ধারে আস্তাবল ও

সহীসদের ঘর। এই সমস্ত ঘরই উত্তরদ্বারী, এবং রাস্তার দিকে তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ। আস্তাবলটি পাঠশালাগৃহে পরিণত হইয়াছিল, আর বাবুর্চ্চিখানাটি ক্ষেত্রনাথ ডাক-ঘরে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাধব দত্ত বলিলেন যে, বাবুর্চ্চিখানায় ডাকঘর স্থাপন না করিয়া সহীসদের ঘরেই তাহা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, ডাকঘর ও পাঠশালা একদিকে এবং পাশাপাশি থাকিবে। আর বাবুর্চ্চিখানায় মনোহারীর দোকান, খান-সামাদের ঘরে মশলার দোকান, আর গুদামঘরে বাসন-কাপড়ের দোকান স্থাপন করা যাইতে পারে। এই সমস্ত ঘর পরস্পর সংলগ্ন থাকায়, দোকানগুলিও পাশাপাশি হইবে। ইহাদের সম্মুখে বারাণ্ডা না থাকায়, শালের খুঁটি ও শালের কাঠামোর উপর কারুগেটেড্ লোহার চাদরের একটী বারাণ্ডা করিলেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। কেবল আড়তের জন্য একটী গুদাম-ঘর প্রস্তুত করা আবশ্যক। যে পাকা গুদামঘরটি বাসনকাপড়ের দোকানের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার কিছু দূরে উত্তর-পশ্চিম ভাগে পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বা করিয়া এই নূতন গুদামঘর প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার সম্মুখের ভাগটি তিনদিকে খোলা থাকিবে, আর ইহার পশ্চিমে অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগে গুদামঘর হইবে। এই গুদামঘরটি দুই-কুঠারী হইবে। সম্মুখের কুঠারীতে বিক্রেতৃগণের অবিক্রীত মাল মৌজুৎ

থাকিবে, আর সর্ব্বপশ্চাতের কুঠারীতে ক্ষেত্রবাবুর কৃষি-জাত অতিরিক্ত শস্যসমূহ সঞ্চিত থাকিবে। গুদামঘরের পশ্চাদ্দিকের সুপ্রশস্ত মাঠে মাল বোঝাই গাড়ীসমূহ আসিয়া লাগিবে এবং উক্ত গাড়ীসমূহ সদর ফটক দিয়া প্রবিষ্ট না হইয়া গুদামের পশ্চাদ্দিকের পথে প্রবিষ্ট হইবে। বাসন-কাপড়ের দোকানের অব্যবহিত পশ্চিম-দিকে রন্ধনশালা ও বাসাবাটী হইবে। মাধবদত্ত বলি-লেন, তিনি তাঁহার জঙ্গলে অনেক মোটা মোটা শালের খুঁটি কাটাইয়াছেন; গুদামঘর, রন্ধনশালা, বাসাবাটী এবং দোকানসমূহের সম্মুখবর্ত্তী বারাণ্ডা নির্ম্মাণের জন্য যত কাষ্ঠ লাগিবে, তাহা তিনি দিবেন। গুদামঘরের চারি-দিকে মোটা মোটা শালের খুঁটি পুঁতিয়া ও শালকাষ্ঠের কাঠামো করিয়া চারিদিকের দেওয়াল ও ছাদ করু-গেটেড্ লোহার চাদর দিয়া ঢাকিতে হইবে; কেবল মেজেটি পাকা করিয়া লইতে হইবে। ক্ষেত্রবাবুর ইট ও চূনসুরকী মৌজুৎ ছিল। মেজে প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি তাহা দিতে সম্মত হইলেন।

পাঠশালা ও ডাকঘরের পূর্ব্বভাগে রাস্তার ধারে ধারে উত্তরমুখ করিয়া এবং তৎপরে হাতার পূর্ব্বসীমায় পশ্চিম-মুখ করিয়া হাটের জন্য তৃণাচ্ছাদিত চল্লিশটি দু'চালা ঘর প্রস্তুত করা হইবে, তাহা স্থিরীকৃত হইল। একটী প্রশস্ত রাস্তা গুদামঘর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে

দক্ষিণমুখে, তৎপরে দোকানঘরের নিকটে আসিয়া পূর্ব্ব-মুখে দোকানঘর, পাঠশালা, ডাকঘর ও হাটের গৃহশ্রেণীর সম্মুখ দিয়া যাইবে; পরে তাহা পূর্ব্বসীমায় উপনীত হইয়া উত্তরমুখে হাটের গৃহশ্রেণীর সম্মুখ দিয়া যাইবে। ক্ষেত্র-নাথ তাঁহার বাটীর সম্মুখে দশ বিঘা স্থান বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইবেন; অবশিষ্ট পঁচিশ বিঘা স্থান হাটের জন্য ছাড়িয়া দিবেন। এই পঁচিশ বিঘার মধ্যে অধিকাংশ ভূমিই তাঁহার বাটীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে থাকিবে। অনতি-দূরে নন্দাজোড় প্রবাহিত হইতেছে; সুতরাং পানীয় জলের কোনও অভাব হইবে না।

এই ব্যবস্থা ক্ষেত্রনাথের মনোনীত হইল। তিনি মাধব দত্ত মহাশয়ের বৈষয়িক জ্ঞান ও ব্যবস্থাশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার সহিত পরামর্শক্রমে স্থির হইল যে, এখন হইতেই গুদামঘর ও হাটের জন্য ঘর নির্ম্মাণ করা হউক। শুভ বৈশাখমাসের দ্বিতীয় দিবস হইতে দোকান ও হাট খোলা হইবে; আরও স্থির হইল যে, ক্ষেত্রনাথ হরিধনকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র কলি-কাতায় যাইবেন এবং সেখান হইতে করুগেটেড্ লোহার চাদর ক্রয় করিয়া সত্বর বল্লভপুরে পাঠাইবেন। তৎপরে দোকানের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া ও হরিধনকে কলিকাতায় রাখিয়া তিনি বল্লভপুরে প্রত্যাগত হইবেন। হরিধন যেমন যেমন

জিনিষ ক্রয় করিবে, অমনি রেলে তৎসমুদয় বোঝাই দিয়া পাঠাইতে থাকিবে।

এই-সকল কথাবার্ত্তা স্থির হইলে, মাধবদত্ত মহাশয় ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, এখন কারবার কোন্ নামে চল্‌বে, তাহা আমি স্থির করেছি, শুনুন। কারবার 'ক্ষেত্রনাথ দত্ত কোম্পানী'র নামে চল্‌বে। আমার নাম দেবার জন্য আপনি অনুরোধ কর্‌বেন না। আমি আর কয়দিন? আমাদের সৌভাগ্য-বশতঃই আপনি এই দেশে এসেছেন। আপনার হাতেই আমি আমার ছেলেদের সঁপে দিলাম। আপনি তাদের মুরব্বি ও অভিভাবক হ'য়ে তাদের রক্ষা ও পালন কর্‌বেন। ভগবান্ আপনাকে সুখে রাখুন। আর অধিক কি বল্‌বো?" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি বাষ্পগদ্গদকণ্ঠ হইলেন।

ক্ষেত্রনাথ তাঁহার প্রস্তাবে অনেক আপত্তি করিলেন; কিন্তু মাধবদত্ত মহাশয় তাঁহার আপত্তি শুনিলেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন "আমার আর একটী কথা আছে। আমাদের শ্রীশ্রী৺ গন্ধেশ্বরী দেবীর টাট। গন্ধবেণেদের মধ্যে কারবারনামা প্রায়ই লিখিত পঠিত হয় না। ধর্ম্ম আর বিশ্বাসই আমাদের মূল, আর আমা-দের খাতাপত্রই আমাদের পাকা দলীল।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আপনার কথা যথার্থ।"

পরদিন প্রাতঃকালে ক্ষেত্রনাথ মণ্ডলগণকে ডাকাইয়া হাটের ঘরের জন্য বাঁশ, কাঠ ও উলুখড় সংগ্রহ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। হাটের ঘর কি প্রণালীতে প্রস্তুত হইবে, তিনি তাহাদিগকে তাহার একটি আভাস দিলেন। মাধবদত্ত মহাশয় আসিয়া কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তাহাও তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন।

দুই তিন দিনের মধ্যে মাধবদত্ত মহাশয়ের বাটী হইতে মোটা মোটা শালের খুঁটি প্রভৃতি আসিয়া পঁহুছিল। দত্তমহাশয় একটী শুভদিনে ও শুভমুহূর্ত্তে গুদাম-ঘরের পরিমাপ-অনুসারে চারিদিকে মোটা মোটা খুঁটি পোঁতাইলেন। তৎপরে কতিপয় সূত্রধর নিযুক্ত করিয়া তাহার কাঠামো প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। প্রজারাও জঙ্গল ও পাহাড় হইতে শালের খুঁটি, বাঁশ ও উলুখড় কাটিয়া আনিতে লাগিল। এইরূপে চারিদিকে কার্য্যারম্ভ হইলে, ক্ষেত্রনাথ হরিধনকে সঙ্গে লইয়া একটী শুভ-দিনে কলিকাতা-যাত্রা করিলেন।

ব্যাঙ্ক হইতে দুই সহস্র টাকা বাহির করিয়া, ক্ষেত্র-নাথ আবশ্যক-মত করোগেটেড্ লোহার চাদর ও বোল্ট্, রিভেট্ কাঁটা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া তৎসমুদয় রেলে বোঝাই দিলেন। তিনি বড়বাজারের একটী পরিচিত বড় কাপড়ের দোকান হইতে মাধবদত্ত মহাশয়ের প্রস্তুত তালিকানুসারে বস্ত্রাদি, অপর একটী পরিচিত

বড় মশলার দোকান হইতে মশলাদি, এবং মুর্গীহাটা ও কলুটোলার দোকানসমূহ হইতে মনোহারী দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন। বাসন কতক কলিকাতায় ও কতক বাঁকুড়ায় ক্রীত হইবে, তাহা স্থির হইল। হরিধনকে সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়া, তিনি একদিন উত্তরপাড়ায় সতীশচন্দ্র ও সৌদামিনীর সহিত দেখা করিয়া আসিলেন। উভয়েই তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে সঙ্গে লইয়া চোরবাগানে রজনীবাবুর সহিত দেখা করিতে যাইবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু ক্ষেত্রনাথ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন "রজনীবাবু আমার শ্বশুরের প্রতিবাসী; আমার শ্বশুরবাড়ীর কারুর সঙ্গে এখন দেখা কর্‌বার ইচ্ছা নাই। সেখানে গিয়ে যদি তাঁদের সঙ্গে দেখা না করি, তা হ'লে সেটাও ভাল দেখাবে না।"

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সে বিষয়ে আর অনুরোধ করিলেন না। সতীশ ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন যে, আর সাত আট দিন পরেই তিনি সপরিবারে পুরুলিয়া যাত্রা করিবেন। সব্‌-ডেপুটীবাবু নূতন বাসা ভাড়া করিয়াছেন। সতীশচন্দ্র যেদিনে পুরুলিয়ায় পঁহুছিবেন, তাহার পূর্ব্বদিনেই তিনি নূতন বাসায় উঠিয়া যাইবেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আমি পুরুলিয়ায় নেমে সুরেনকে দেখে যাব।"

দুই এক দিন পরেই অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ক্ষেত্রনাথ কলিকাতা হইতে পুরুলিয়া গমন করিলেন।

ত্রি-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরুলিয়ায় সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে উপস্থিত হইলেন। তিনি ষ্টেশনে সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, এখনও উহাঁর প্রেরিত দ্রব্যাদি সেখানে আসিয়া পহুঁছে নাই। বল্লভপুরে আসিয়া দেখিলেন, মাধবদত্ত মহাশয় গুদামঘরের কাঠামো প্রস্তুত করাইয়াছেন। দোকানঘরসমূহের সম্মুখের বারাণ্ডার কাঠামোও প্রস্তুত হইয়াছে। বাসাবাটী এবং রন্ধনশালার কাঠামোও প্রস্তুত হইয়াছে। প্রজারা কেবল দুই তিনখানি হাটের ঘর বাঁধিয়াছে মাত্র। দত্তমহাশয় বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, বেগার দ্বারা কখনও কাজ ভাল হয় না। আপনার প্রজারা যে ঘর বেঁধেছে, তা বেশ পোক্তা হয় নাই। সেই জন্য ঘরবাঁধা বন্ধ রেখেছি। জনমজুর লাগিয়ে ঘর বাঁধাতে হবে। নতুবা ঘর পোক্তা হবে না। একদিনের ঝড়েই ঘর ভূমিসাৎ হ'য়ে যাবে। যা কাজ কর্‌তে হবে, তা পাকা হওয়া আবশ্যক। নতুবা পয়সা ও পরিশ্রম সবই নষ্ট হয়।"

দুই তিন দিনের মধ্যেই করুগেটেড্ লোহার চাদর প্রভৃতি আসিয়া পহুঁছিল। মাধবদত্ত মহাশয় মিস্ত্রী লাগাইয়া তদ্দ্বারা গুদামের ছাদ ও তৎপরে তাহার ভিত্তি প্রস্তুত করাইলেন। তৎপরে দোকানের বারাণ্ডার

ছাদ প্রস্তুত হইল। সর্ব্বশেষে বাসাবাটী প্রস্তুত হইল। কেবল রসুই ঘরটি তৃণাচ্ছাদিত হইল।

এই-সমস্ত প্রস্তুত হইলে, তিনি দৈনিক বেতনে পঁচিশ-জন মজুর লাগাইয়া হাটের ঘরগুলি প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করিলেন। ঘরের সম্মুখভাগ খোলা রাখিয়া পশ্চাদ্ভাগ ও দুই পার্শ্ব ঝাঁটি ও বাঁশের কঞ্চী দ্বারা আবৃত করাইলেন এবং তাহার উপর মৃত্তিকা ও গোময় লেপাই-লেন। এইরূপে প্রায় বারদিনের মধ্যে চল্লিশটি ঘর প্রস্তুত হইল। ঘরগুলি প্রস্তুত হইলে, মাঠের এক অপূর্ব্ব শোভা হইল।

সর্ব্বশেষে দত্তমহাশয় গুদামের মেজে ও দোকান-ঘরসমূহের বারাণ্ডার মেজে ইট দিয়া গাঁথাইয়া পাকা করিয়া লইলেন। এই-সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে, তিনি বাঁশের জাফরী করাইয়া ক্ষেত্রনাথের বাটীর সম্মুখবর্ত্তী দশবিঘা ভূমি বেষ্টন করাইলেন। বাঁশের জাফরী দ্বারা এই প্রশস্ত ভূমি বেষ্টিত হইলে, তাহার মনোহারিণী শোভা হইল। তৎপরে তিনি আপণশ্রেণীর সম্মুখভাগে একটী প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করাইলেন। বলা বাহুল্য, এই-সমস্ত কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণে তিনি নগেন্দ্র ও অমর-নাথের বিলক্ষণ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

চৈত্রমাসের মাঝামাঝি সময়ে, কাপড়, মশলা, মনো-হারী দ্রব্য ও বাসন প্রভৃতি বল্লভপুরে আসিয়া পহুঁছিল।

দত্তমহাশয়, ক্ষেত্রনাথ, নগেন্দ্র, হরিধন প্রভৃতি সকলেই চালানের ফর্দ্দ অনুসারে জিনিষপত্র মিলাইয়া যথাস্থানে তৎসমুদায় সজ্জিত ও বিন্যস্ত করিতে লাগিলেন। কাপড়ের গাঁইট হইতে কাপড় বাহির করিয়া প্রত্যেক কাপড়ে বিক্রেয় মূল্যের সঙ্কেত চিহ্নিত করা হইল। কাপড় রাখিবার জন্য কাষ্ঠের কতকগুলি ফ্রেম বা মাচা প্রস্তুত হইল। মনোহারী দ্রব্যাদিরও মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া তাহা মনোহররূপে সুসজ্জিত করা হইল। মহেশ হাল্‌দার, গোপীনাথ দাঁ, হারাধন মল্লিক প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ আসিয়া আপনাপন কর্ম্মের ভার লইতে লাগিলেন।

বল্লভপুরে একটী নূতন হাট বসিতেছে, তাহা চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিবৃন্দ ও দোকানদারগণ অবগত হইয়াছিল। তথাপি ঢোলসহরত দ্বারা সকলকে তাহা জ্ঞাপন করিবার ব্যবস্থা হইল। গ্রামের বলরাম মণ্ডলের একটী পুরাতন নাগরদোলা ছিল; তাহার সংস্কার করাইয়া সে ক্ষেত্রনাথ ও মাধবদত্তের অনুমতি-ক্রমে তাহা হাটের পূর্ব্বদিকের কোণে স্থাপিত করিল।

বুধবারে প্রথম হাট বসিবে; সেই বারে নিকটে অন্য কোথাও হাট বসে না। মাধবদত্ত মহাশয় বুধবারে ও রবিবারে বল্লভপুরে হাট বসাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

প্রথম হাট বসিতে আর সাতদিনমাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে সতীশচন্দ্রের পত্র পাইয়া ক্ষেত্রনাথ ডেপুটীকমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পুরুলিয়ায় গমন করিলেন।

মাধবদত্ত মহাশয় ইত্যবসরে হাটের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে একটী উচ্চ মাচা বা টঙ্ বাঁধাইলেন; এবং প্রতি হাট-বারে প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত তাহার উপরে একটী টীকোরা বাজাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। টীকোরার শব্দ বহুদূর হইতে শ্রুত হয়। টীকোরার শব্দ শুনিলেই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিগণ সেই দিন হাট-বার বলিয়া বুঝিতে পারিবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া মাধবদত্ত মহাশয় হাটের কথা চারিদিকে ঘোষিত করাইলেন।

ক্ষেত্রনাথ পুরুলিয়ায় উপস্থিত হইয়া সতীশকে সঙ্গে লইয়া ডেপুটীকমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব ক্ষেত্রনাথকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন যে, তিনি তাঁহাকেই নন্দনপুর মৌজা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া স্থির করিয়াছেন। নন্দনপুরের নক্সা ও কাগজপত্র প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি এখন জেলার বার্ষিক বিবরণী বা রিপোর্ট লিখিতে ব্যস্ত আছেন। রিপোর্ট লেখা শেষ হইলে, তিনি একদিন নন্দনপুরে গিয়া স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়া আসিয়া তাঁহাকে উক্ত

মৌজা বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জন্য আহ্বান করিবেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কার্পাস কিরূপ হইয়াছে?" ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "কার্পাসের শুঁটি বেশ পুষ্ট হইয়াছে; এখনও শুঁটি ফাটিয়া তুলা বাহির হয় নাই।" তৎপরে, সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, বল্লভপুরের রাস্তার সংস্কার-কার্য্য শেষ হইয়াছে। সাহেব ক্ষেত্রনাথকে হাসিয়া বলিলেন "আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে, রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বল্লভ-পুর যাইতে কালীনদী নামক যে ছোট নদী পার হইতে হয়, বর্ত্তমান নূতন বৎসরের বজেটে তাহার উপর একটী পাকা সেতু নির্ম্মাণ করিবার জন্য টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই বৎসরের মধ্যেই পুল প্রস্তুত হইবে।" ক্ষেত্রনাথ তাহা শুনিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন এবং তজ্জন্য সাহেবকে প্রচুর ধন্যবাদ দিলেন।

সতীশচন্দ্রের বাসায় গ্রামোফোন্ নামক একটী নূতন বাদ্য-ও-সঙ্গীতযন্ত্র দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ আনন্দিত হইলেন। তিনি সতীশচন্দ্রকে বলিলেন "সতীশ, তোমরা আপনা-দের মনোরঞ্জনের জন্য এই যন্ত্রটি আনিয়েছ। তোমার কাছে এটি দুই দশ দিনের জন্য চাওয়া অন্যায় হয়।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "তুমি বল্লভপুরে এটি নিয়ে যেতে চাও নাকি? তা অনায়াসে পার। উত্তরপাড়ায় আর এখানে ঐ যন্ত্রের বাদ্য আর গান শুনতে শুনতে সৌদা-

মিনী বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে। আর এটি বাসায় আছে ব'লে, সন্ধ্যার সময় বন্ধুবান্ধবেরা এসে বাজাতে আরম্ভ করে। তা'তে আমাদের তো বড় বিরক্তি হয়-ই, আর সুরেনেরও পড়াশুনার বড় ব্যাঘাত হয়। তুমি এটা কিছুদিনের জন্য নিয়ে গেলে বাঁচি।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তবে এটি আমি নিয়ে যাব। আমাদের নূতন হাটে লোক আকর্ষণ করবার জন্য এটি একটি চমৎকার উপায় হবে।"

সতীশচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন "আরে, তুমি মতলব-ছাড়া কিছুই কর না, দেখ্‌ছি। তুমি খাঁটি বৈশ্য। আমি মনে করেছিলাম, বুঝি নরু ও নগিনের মার মনস্তুষ্টি করাই তোমার উদ্দেশ্য!"

ক্ষেত্রনাথ তাহার কথা শুনিয়া কেবল হাসিতে লাগিলেন।

বৈকালে ক্ষেত্রনাথ পুরুলিয়ার আড়তে ও বাজারে গিয়া জিনিষপত্রের উপস্থিত বাজার-দর জানিতে লাগিলেন। চালের আড়তে র‍্যালী ব্রাদার্সের একজন এজেণ্টকে দেখিয়া তিনি তাহার সহিত আলাপ করিলেন। পুরুলিয়ায় আজ কতিপয় দিবস হইতে চালের আমদানী না থাকায়, তিনি অনর্থক বসিয়া আছেন ও অন্যত্র যাইবার সঙ্কল্প করিতেছেন, ইহা অবগত হইয়া ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে বলিলেন "বল্লভপুরে একটী নূতন হাট

বসিতেছে ; আপনি সেই হাটে গেলে সহস্র সহস্র মণ চাউল খরিদ করিতে পারিবেন।" চাউল ক্রয় করিতে এজেণ্টের ব্যগ্রতা দেখিয়া, ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে বল্লভপুরে যাইবার পথ বলিয়া দিলেন এবং ২রা বৈশাখে যে প্রথম হাট বসিবে, তাহাও তাঁহাকে জানাইলেন।

ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে আসিয়া মাধবদত্তকে সমস্ত কথা বলিলেন এবং ঐ তারিখে আড়তে প্রচুর পরিমাণে চাউল আমদানী করিবার জন্য নিজগ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে লোক পাঠাইলেন। মাধবদত্ত ক্ষেত্রনাথের আনীত সঙ্গীতযন্ত্রটি দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, আপনি যে যন্ত্র এনেছেন, তার জন্যই দেখ্‌তে পাবেন, আপনার হাটে লোক ধর্‌বে না। চমৎকার হয়েছে ; আপনি ভারি বুদ্ধির কাজ করেছেন। যেখানে নাগর-দোলা আছে, সেই-খানের একটী ঘরে এই যন্ত্র বাজাতে হবে। অমরকে বাজাবার ভার দিবেন। সেই এই কাজের জন্য বেশ উপযুক্ত। ঘরের মধ্যে একেবারে কুড়িজনের অধিক লোক ঢুকতে দেওয়া হবে না। প্রথম দিনে সকলে যন্ত্রটি দেখ্‌তে পাবে না, তা নিশ্চয়। যারা দেখ্‌তে পাবে না, তারা এই যন্ত্র দেখ্‌বার জন্য আবার আস্‌বে। হাট বস্‌লে কেবল এক ঘণ্টামাত্র যন্ত্র বাজানো হ'বে ; তার পর বন্ধ ক'রে দেওয়া যাবে। নইলে, সকলেই

যন্ত্র দেখ্‌বার জন্য ছুটবে। দোকানে বেচাকেনা কম হবে।”

ক্ষেত্রনাথ দত্তমহাশয়ের অভিপ্রায় বুঝিয়া হাসিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শুভ ১লা বৈশাখ তারিখে, নূতন গুদামগৃহে শ্রীশ্রী৺ গন্ধেশ্বরী দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করা হইল। কেবল ঘটস্থাপন করিয়া এবং নূতন তৌল, দাঁড়ি, প'ড়েন, বাট্‌খারা প্রভৃতি ঘটের নিকট সুসজ্জিত করিয়া দেবীর আহ্বান ও পূজা হইল। যথাসময়ে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো হইল। বলাবাহুল্য যে, গুদামঘর ও দোকানঘরগুলি আম্রপল্লবে এবং নানাবিধ পুষ্প-মালায় সুসজ্জিত হইল। হাটের ঘরগুলিকেও তদ্রূপ সুসজ্জিত করা হইল।

২রা বৈশাখ তারিখের প্রত্যূষে হাটের উচ্চ টঙ্ হইতে টীকোরা বাদিত হইতে লাগিল। বল্লভপুরের নূতন হাট দেখিবার জন্য গ্রামবাসী ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহের অধিবাসিগণের মনে এক নূতন উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার হইল। বেলা দশটা হইতে হাট বসিবে। আজ পাঠশালার ছুটি হইয়াছে। অমরনাথ গ্রামোফোন্ লইয়া নাগরদোলার নিকটবর্ত্তী একটি গৃহে উপবিষ্ট হইল। যাহাতে বহুলোক একেবারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য প্রহরীও নিযুক্ত হইল।

রেলওয়ে ষ্টেশনের একজন ময়রা হাটের মধ্যে একটি ঘর ভাড়া লইয়াছিল। সে তাহার মিষ্টান্ন প্রভৃতি

লইয়া হাটে উপস্থিত হইল। ক্ষেত্রনাথের পরামর্শক্রমে পরিষ্কৃত পানীয় জলের দ্বারা সে দুইটী জালা বা মট্‌কা পরিপূর্ণ করিল এবং পিত্তলের ঘটী ও গ্লাস্‌ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিল।

র‍্যালীব্রাদার্সের সেই এজেণ্ট মহাশয় তাঁহার লোক-জন সহ বল্লভপুরে উপনীত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

উচ্চ টঙ্‌্ বা মঞ্চ হইতে টীকোরার শব্দ চতুর্দ্দিক্‌ প্রতি-ধ্বনিত করিতে লাগিল। নগেন্দ্র, হরিধন, কৃষ্ণধন প্রভৃতি সকলেই শুদ্ধস্নাত হইয়া আপন আপন দোকান খুলিয়া তন্মধ্যে গঙ্গাজল ছিটাইল ও ধূপ জ্বালিয়া দিল। ধূপের মধুর গন্ধে সেই স্থান আমোদিত হইয়া উঠিল।

মহেশ হাল্‌দার আড়তের মধ্যে একটী চৌকী বিছা-ইয়া তাহার উপর বাক্স, কাগজপত্র ও খাতা লইয়া বসিলেন। ওজনের জন্য কাঁটা টাঙ্গান হইল।

ধীরে ধীরে দুইটি চারিটি করিয়া লোক হাটে উপনীত হইতে লাগিল। তাহারা হাট দেখিয়া বিস্মিত হইল। এমন সুন্দর ও সুব্যবস্থিত আপণ-শ্রেণী তাহারা আর কোনও হাটে দেখে নাই। মনোহারী দোকান, কাপড়ের দোকান, মশলার দোকান ও আড়ত দেখিয়া তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। মনোহারী দোকানের নানাবিধ অপূর্ব্ব সামগ্রী দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হইল।

পুরুলিয়ার কোনও দোকানে এত জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

নগেন্দ্র তাহাদিগকে ডাকিয়া জিনিষপত্র দেখাইতে লাগিল এবং তাহাদের প্রশ্নানুসারে তাহাদের মূল্য বলিতে লাগিল। প্রথমে কেহ কিছু ক্রয় করিল না; পরন্তু স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া তাহারা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করিতে লাগিল। পরে আবার আসিয়া মূল্য কিছু কমিতে পারে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। নগেন্দ্র বলিল "আমাদের একদর; কোনও হাটে বা পুরুলিয়াতে যদি এর চেয়ে কম দর হয়, তোমরা জিনিষ ফিরে দিয়ে মূল্যের পয়সা নিয়ে যেও। আমরা একেবারে কল্‌কাতা থেকে জিনিষ নিয়ে এসেছি, আর সামান্য লাভে তা বিক্রয় কর্‌ব।"

যাহারা পুরুলিয়ায় বা অন্য কোনও হাটে সেই প্রকারের দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিল, তাহারা সরলভাবে আসিয়া বলিল যে, নগেন্দ্রনাথ ঠিক্ কথাই বলিয়াছে; পুরুলিয়াতেও সেই দ্রব্যের বেশী দাম। তখন তাহারা মনোহারী দোকান হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। একজনের দেখাদেখি আর একজন ক্রয় করিল। তাহার দেখাদেখি আর একজন ক্রয় করিল। এইরূপে নগেন্দ্রের দোকানে ক্রয়বিক্রয় আরম্ভ হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার দোকানে ভিড় লাগিয়া গেল।

কাপড়ের দোকানেও ভিড় লাগিল। নানাবিধ সুন্দর বস্ত্র দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। কেহ কেহ কাপড় এবং কেহ কেহ বাসন ক্রয় করিতে লাগিল। বাসন ও কাপড়ের দোকানের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য একটী বালক মধ্যে মধ্যে কাঁসর বা ঝাঁজ বাজাইতে লাগিল। বস্ত্রাদি পুরুলিয়ার দরে, এমন কি, এক আধ আনা সুবিধাজনক দরেও বিক্রীত হইতেছে, দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইল।

মশলার দোকানে পাইকার খরিদ্দারগণ আসিয়া মশলার দর প্রভৃতি জানিতে লাগিল। পুরুলিয়ার দরে এখানে মশলা বিক্রীত হইতেছে, ইহা দেখিয়া তাহা-রাও মশলা ক্রয় করিতে লাগিল। মাধবদত্ত মহাশয়কে সেই দোকানে উপস্থিত দেখিয়া পাইকারেরা তাঁহাকে বলিল যে, হাটে তাঁহারা যদি খুচরা মশলা বিক্রয় না করেন, তাহা হইলে তাহারাই পাইকারী দরে মশলা ক্রয় করিয়া হাটে বসিয়া খুচরা দরে তাহা বিক্রয় করিবে। দত্তমহাশয় বলিলেন "তোমরা যদি হাটে ব'সে খুচরা বিক্রয় কর, তা হ'লে দোকানে খুচরা বিক্রয় করা হ'বে না।" নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের ছোট ছোট দোকানদারেরা হাটে ও নিজ নিজ গ্রামে মশলা বিক্রয় করিবার জন্য পাইকারী দরে মশলা ক্রয় করিতে লাগিল।

আড়তের পশ্চাদ্ভাগের বিস্তৃত মাঠে গো-গাড়ীতে

চাউল আমদানী হইতে লাগিল। বিক্রেতৃগণ চাউলের নমুনা আনিয়া দেখাইতে লাগিল। ক্রেতৃগণ তাহা দেখিয়া দর করিতে লাগিলেন। দর স্থির হইলে এক একটী গাড়ী আড়তের সম্মুখে আনীত হইল এবং চাউলের বস্তা-গুলিকে কাঁটায় তুলিয়া ওজন করা হইতে লাগিল। মহেশ হাল্‌দার দরদস্তুর চুকাইয়া দিতে ও ওজন দেখিতে লাগিলেন এবং হারাধন মল্লিক প্রত্যেক ব্যাপারীর নাম এবং চাউলের পরিমাণ, দর ও মূল্য লিখিতে লাগিলেন। আড়তে কলাই, সরিষা প্রভৃতিও আমদানী হইল। তাহা-দেরও অনেক ক্রেতা জুটিল।

যে-সকল লোক হাটে কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিল, ক্ষেত্রনাথ ও দত্তমহাশয় তাহাদিগকে যথাস্থানে বসাইতে লাগিলেন। যাহারা পেঁয়াজ, রসুন, ডিঙ্গলা (বিলাতী কুমড়া), লাউ, ও তরকারী লইয়া আসিল, তাহাদিগকে তাঁহারা একটী স্বতন্ত্রস্থানে বসাইলেন। যাহারা মৎস্য বিক্রয় করিতে আসিল, তাহাদিগকে অন্য একটী স্থানে বসাইলেন। কেহ মুড়ী, মুড়কী ও তেলেভাজা ফুলরি, ভাপ্‌রা ও গুড়পিঠা বিক্রয় করিতে আসিল। কেহ ছোলাভাজা ও কুট্‌কলাই, কেহ চিঁড়ে, কেহ টানা লাড়ু ও দেশীয় মিষ্টান্ন, কেহ সরু চাউল, কেহ কলাই, কেহ মুগ, কেহ অড়হর, কেহ রম্না বা বরবটী, কেহ গম, কেহ ময়দা, কেহ যবের ছাতু, কেহ

বুটের ছাতু, কেহ গুড়, কেহ চিটে বা ঝোলা গুড়, কেহ তৈল, কেহ খইল, কেহ ঘৃত, কেহ দুগ্ধ, কেহ দধি, কেহ ছানা, কেহ চাঁছি বা মোয়া, কেহ মধু, কেহ মোম, কেহ মালা ও ঘুন্‌সী, কেহ কাগজের ঘুড়ি, কেহ সোলার পাখী ও কদম্বফুল, কেহ কাঠের পুতুল, কেহ ছেলেদের জন্য টিম্‌টিমি বাদ্য, কেহ বাঁশের ঝাঁটা, ঝুড়ি, ধুচুনি, চেঙ্গারী, টোকা ও পেথে, কেহ ঢোলকবাদ্য, কেহ মাদোল, কেহ বাঁশী, কেহ রশা, কেহ সিকে, কেহ দড়ী ও দড়া, কেহ বাঁশের ছড়ি ও ছাতা, কেহ জুতা, কেহ কাটারী, কেহ জাঁতী ও ছুরী, কেহ কিরোশিন তৈল, কেহ হরিতকী, কেহ আমলকী, কেহ ধাঁইফুল, কেহ কুঁচিলা, কেহ সতরঞ্চ ও কম্বল, কেহ বিলাতী কাপড়ের গাইট্‌ ও কাটাপোষাক—এইরূপ নানাবিধ দ্রব্য লইয়া হাটে উপস্থিত হইল। লোকের কলরবে, মাদোলের ও ঢোলকের ধ্বনিতে এবং কাঁসরের শব্দে সেই বৃহৎ মাঠটি শব্দায়মান হইতে লাগিল। হাটে গো, মহিষ, ছাগল, পাঁঠা, ভেড়া, টাট্টুঘোড়া, পাতিহাঁস, রাজহাঁস, বাল-হাঁস, মোরগ, মুরগী হরিণশিশু, ময়ূর-শাবক, তিতির, গরুড়পাখী, কপোত, পার্ব্বতীয় পারাবত, হড়িয়াল্‌ বা হরিৎ-কপোত, টিয়াপাখী, ফুলটুসী, ময়ুর-চন্দনা, দেশী ময়না বা শালিকপাখী, পাহাড়ে ময়না, শ্যামা, দয়েল্‌, কোকিল, বানরশিশু, গোচর্ম্ম, মহিষচর্ম্ম,

ছাগচর্ম্ম, মেষচর্ম্ম, হরিণচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মহিষশৃঙ্গ, হরিণ-শৃঙ্গ, হস্তিদন্ত প্রভৃতিও বিক্রয়ের জন্য আসিল। হাটের পূর্ব্বদিকের আপণ-শ্রেণীর পশ্চাদ্বর্ত্তী মাঠে গোমহিষাদি-বিক্রয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল; তাহার একপার্শ্বে পক্ষি-বিক্রয়ের স্থান এবং আরও কিয়দ্দূরে শুষ্ক চর্ম্মাদি বিক্রয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। অপরাহ্ন সময়ে জনতা ও কলরব এত অধিক হইল যে, সকলকেই ভিড় ঠেলিয়া হাটের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিতে হইল, এবং কেহ নিকটের লোকেরও কথা শুনিতে পাইল না। কোথাও অশ্বের হ্রেষা, কোথাও গাভীর হাম্বারব, কোথাও পাখীর চীৎকার, কোথাও ছাগ ও মেষের রব, কোথাও বাদ্যধ্বনি, কোথাও হাঁকাহাঁকি, কোথাও ডাকা-ডাকি, কোথাও তক্রার, কোথাও হাস্যধ্বনি, কোথাও সঙ্গ হারাইয়া বালক-বালিকাদের ক্রন্দনধ্বনি—এই-সমস্ত বিচিত্রধ্বনির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে হাট হইতে এক মহাশব্দ উত্থিত হইল।

নাগর-দোলায় বালকবালিকারা ও পার্ব্বতীয় যুবক-যুবতীরা চাপিয়া দোল খাইতে লাগিল ও অতিশয় আমোদ অনুভব করিতে লাগিল। নাগর-দোলা এক মুহূর্ত্তের জন্যও অচল থাকিল না। গ্রামোফোনের ঘরের নিকটে ভয়ানক ভিড় হইল। সেখানে জনতা কমাইতে না পারিয়া অমরনাথ যন্ত্রবাদন বন্ধ করিয়া

দিল। ময়রার দোকানেও ভিড় কম হইল না। গোপীনাথ দাঁ ও লখাই সর্দ্দার প্রভৃতি বিক্রেয় জিনিষের অবস্থা ও মূল্যানুসারে কাহারও নিকট অর্দ্ধ আনা, কাহারও নিকট এক পয়সা এবং কাহারও নিকট অর্দ্ধ পয়সা পর্য্যন্ত তোলা আদায় করিল। যাহার দ্রব্য সামান্য, তাহার নিকট কিছুই গ্রহণ করা হইল না। সূর্য্যাস্তের সময় হইতে হাট ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল এবং সন্ধ্যা না হইতে হইতে সেই কোলাহলময় প্রকাণ্ড হাটটি প্রায় জনশূন্য হইয়া গেল। সেই বিশাল জনসঙ্ঘ যেন যাদুমন্ত্রবলে কোথায় বিলীন হইয়া গেল! ভবের হাটেও মানুষের লীলাখেলা এইরূপই হইয়া থাকে! এই সংসারে কত সোনার হাট এইরূপ নিত্য বসিতেছে, আবার নিত্য ভাঙ্গিয়া যাইতেছে!

*　　　*　　　*

সন্ধ্যার পর, আড়তের ও প্রত্যেক দোকানের নগদ-বিক্রয়ের হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, আড়তে সেদিন নয়শত মণ চাউল, দুইশত মণ কলাই, পঞ্চাশ মণ সরিষা, ষাইট মণ গম ও ত্রিশ মণ মুগ বিক্রীত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা আড়তের দস্তুরী প্রায় ৪০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। হাটের তোলা ৫৵০ আদায় হইয়াছে। বাসন-কাপড়ের দোকানে ১০৩ টাকা, মশলার দোকানে

৬১৲ টাকা ও মনোহারী দোকানে ৪৭৸৵০ নগদ বিক্রয় হইয়াছে।

মাধবদত্ত মহাশয় ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, প্রথম দিনের হাট যে এমন জম্‌কালো হবে, তা আমি ভাবি নাই। যা হোক্ আজকের বেচাকেনা দেখে আমার মনে খুব আশা হয়েছে। দেখ্‌ছেন কি? প্রত্যেক মাসেই কল্‌কাতা থেকে সব রকম জিনিষের নূতন আমদানী কর্‌তে হবে। লোকের কথা শুন্‌লেন না? তারা বলে, এমন হাট আর কখনও দেখে নাই, আর পুরুলিয়ার চেয়েও জিনিষ শস্তা। কালক্রমে দোকানের টাট্ আরও বাড়াতে হবে। নগদ টাকা ছাড়া ধারে আমরা কারেও একটা পয়সার জিনিষ বেচ্‌ব না। বরং টাকায় আধ আনা শস্তা দেব, তবু ধারে জিনিষ দেওয়া হবে না।"

দত্তমহাশয় ক্ষেত্রনাথের অনুরোধক্রমে তাঁহার বাটীতে জলযোগ করিয়া রাত্রি আটটার সময় গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আপন আপন দোকান বন্ধ করিল। রাত্রিতে দোকানে পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করা হইল। কর্ম্মচারীরা দোকানঘরে ও আড়তে শয়ন করিবে, এবং দুইজন ভৃত্য বাহিরের বারাণ্ডায় থাকিবে। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ করিয়া ও রোকড় মিলাইয়া হরিধন ও কৃষ্ণধন বাটী যাইবে, তাহা স্থির হইল।

পরদিন প্রভাতে আবার সকলে আপন আপন দোকান খুলিল। হাটবার ব্যতীত অন্যদিনেও দোকানে কিছু কিছু ক্রয়বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা ছিল।

ক্ষেত্রনাথ হাটতলায় ঝাঁট দেওয়ার ও জল ছিটাইবার জন্য তিনটি দাসী নিযুক্ত করিলেন। হাটের সমস্ত আবর্জ্জনা রাশীকৃত করিয়া অগ্নিসংযোগে তৎসমুদায় দগ্ধ করা হইল। আবার সেই বৃহৎ মাঠটি পূর্ব্ববৎ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন দেখাইতে লগিল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বুধবারের হাট অপেক্ষা রবিবারের হাটে অধিক সংখ্যক লোক সমবেত হইল। এই নূতন হাটে মনোহারী দোকানে, মশলার দোকানে ও বাসন-কাপড়ের দোকানে জিনিষপত্র সুলভ দরে পাওয়া যাইতেছে, এই সংবাদ চারিদিকে বিকীর্ণ হওয়ায়, দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও অনেক লোক হাট দেখিতে আসিতে লাগিল। এই কারণে দোকানে এবং হাটে ক্রয়বিক্রয় সতেজে চলিতে লাগিল। দশ পনর দিনের মধ্যে মনোহারী দোকান প্রভৃতির জন্য জিনিষপত্র কলিকাতা হইতে আবার আমদানী করিতে হইবে, তাহা মাধবদত্ত মহাশয় ও ক্ষেত্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, এবং তজ্জন্য ব্যবস্থা করিলেন।

প্রত্যেক দোকানের নগদ বিক্রয়ের টাকা প্রত্যহ ক্ষেত্রনাথের নিকট জমা রাখা হইত। ক্ষেত্রনাথ প্রত্যেক দোকানের টাকা সেই দোকানের নামে জমা করিতেন। সুতরাং কোন্ দোকানে মোট কত টাকার দ্রব্য বিক্রীত হইল, খতীয়ান্ দেখিলে তাহা সহজেই বুঝা যাইত। খাতা ও খতীয়ানের সঙ্গে তাঁহার তহবীলের মিল থাকিল।

হরিধন, কৃষ্ণধন, নগেন্দ্র বা কোনও কর্ম্মচারীর উপর কোনও বাবতে কিছু খরচ করিবার ভার অর্পিত

হইল না। তাহারা দোকানে কেবল জিনিষপত্র বিক্রয় করিত। সকলপ্রকার খরচপত্রের ভার ক্ষেত্রনাথ নিজ হস্তে রাখিলেন। প্রত্যহ প্রত্যেক দোকানের নগদ বিক্রয়ের টাকা বুঝিয়া লইবার সময় তিনি সেই দোকানের খাতায় নিজ নাম স্বাক্ষরিত করিয়া কর্ম্মচারীকে তাহা ফেরৎ দিতেন। এইরূপ সুব্যবস্থায় কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে লাগিল, এবং হিসাবেরও কোনও গোলযোগের সম্ভাবনা রহিল না।

বল্লভপুরে একটী পোষ্টঅফিস্ খোলা যাইতে পারে কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য একদিন পোষ্টঅফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ সাহেব সেখানে আগমন করিলেন। তিনি পুরুলিয়ায় প্রত্যাগত হইয়া বল্লভপুরে একটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস্ খুলিবার আদেশ প্রদান করিলেন, এবং অমরনাথকে মাসিক ১০্ দশ টাকা বেতনে ডাক্-মুন্সী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ তাহাকে একমাসকাল শিক্ষানবিশী করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। পুরুলিয়া হইতে একটী অভিজ্ঞ ব্যক্তি এক মাসের জন্য ডাক্‌মুন্সী নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। অমরনাথ তাঁহার নিকট কার্য্যশিক্ষা করিতে লাগিল। গ্রামের একটী বিশ্বাসী লোক পিয়ন নিযুক্ত হইল।

স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্স্‌পেক্টারবাবু আসিয়া এক-

দিন বল্লভপুরের পাঠশালা দেখিয়া গেলেন। তিনি পাঠশালা-গৃহ, ছাত্রসংখ্যা, অমরনাথের ন্যায় প্রধান শিক্ষক এবং আর একটি মধ্য-বাঙ্গলা-পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষক দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি পাঠশালার জন্য মাসিক সাত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। বুধবারে যে দিন হাট হইত, সেদিন কেবল প্রাতঃকালে পাঠ-শালা বসিত। রবিবারে পাঠশালা বন্ধ থাকিত।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ে ডেপুটী কমিশনার সাহেব খাশ-মহাল নন্দনপুরে আসিয়া তাঁহার তাঁবু খাটাইলেন। তাঁহার সঙ্গে খাশ-মহালের ডেপুটী-কলেক্টার ও তহশীলদার এবং সতীশচন্দ্রও আসিলেন। দুই তিন দিন তাঁহারা নন্দনপুরের অবস্থা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একদিন প্রাতঃকালে ক্ষেত্রনাথকে ক্যাম্পে আহ্বান করিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহাদের সঙ্গে নন্দনপুর মৌজার অনেক স্থান পরিদর্শন করিলেন। সার্ভে নক্সা ও চিঠায় দেখা গেল যে, নন্দনপুর মৌজার মোট রকবা (area) ৮৭৫৩ বিঘা; তন্মধ্যে প্রায় নয় শত বিঘার উপর ছোট শালবৃক্ষের বন, একশত বিঘার উপর তিন সহস্র সুরক্ষিত বড় শালবৃক্ষ, একহাজার পাঁচশত বিঘার উপর কতিপয় বনাচ্ছন্ন শৈল, পাঁচশত বিঘার উপর কতিপয় পার্ব্বতীয় নদী বা জোড় ও তিনশত বিঘার উপর একটী স্বভাব-খাত

হ্রদ আছে; অবশিষ্ট ভূমি অকৃষ্ট অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। সুতরাং বন, জঙ্গল, পাহাড়, নদী ও হ্রদ যে ভূমি অধিকার করিয়া আছে, তাহা বাদ দিলে, প্রায় ৫৪৫৩ বিঘা কৃষিযোগ্য ভূমি হইতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যেও কঙ্করময় ও প্রস্তরাকীর্ণ উচ্চনীচ ভূমির পরিমাণ প্রায় দেড় হাজার বিঘা হইবে। তাহা হইলে প্রকৃত কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রায় চারি সহস্র বিঘা হইবে। ডেপুটী কমিশনার সাহেব তহশীলদারের কাগজ-পত্র দেখিয়া অবগত হইলেন যে, এই মৌজার জঙ্গল ও কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া গড়ে বাৎসরিক ৬০্ টাকার অধিক আদায় হয় না; অথচ তহশীলদারকে মাসিক ১০্ টাকা হিসাবে বাৎসরিক ১২০্ টাকা বেতন দিতে হয়। অর্থাৎ, এই মৌজাটি গভর্ণমেণ্ট খাসে রাখিয়া প্রতিবৎসর ৬০্ টাকা করিয়া ক্ষতি সহ্য করেন। এই মৌজার মধ্যে বহু মধুক বৃক্ষ (মহুয়া বা মোল গাছ) দেখিয়া ডেপুটী কমিশনার তহশীলদারকে বলিলেন "এই সমস্ত মহুয়া বৃক্ষের ফুল ও ফল কি হয়? তাহা বিক্রয় করিলে তো আরও অনেক টাকা আদায় হইতে পারিত? তুমি তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়া সরকারী টাকা নিশ্চয়ই আত্ম-সাৎ কর।"

সরকারী টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ শুনিয়া তহশীলদার ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, এবং তাহার কণ্ঠ শুষ্ক

হইয়া গেল। সে কৈফিয়ৎস্বরূপ বলিল "ধর্ম্মাবতার, মহুয়াফুল বা কঁচড়া ফল একটীও আদায় করিতে পারা যায় না।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

তহশীলদার বলিল "হুজুর, নন্দনপুরে ভালুকের ভয়ানক উপদ্রব। ফুল পড়িবামাত্র ভালুকে তাহা খাইয়া ফেলে।"

সাহেব বলিলেন "আর কঁচড়া ফল?"

তহশীলদার বলিল "হুজুর, এই নন্দনপুরে বাঘ ও ভালুকের সংখ্যা অনেক; সেই কারণে, কেহ ফল ভাঙ্গিতে আসিতে সাহস করে না।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন "আর সেই কারণেই বুঝি নন্দনপুরের পলাশবনে ও কুসুমগাছে কেহ লাহা লাগাইতে আসে না? আমি তো অনেক গাছে লাহা দেখিলাম?"

তহশীলদার বলিল "হুজুর, কেহ লাহা ভাঙ্গিতে আসিতে চায় না বলিয়া তাহা ফুঁকিয়া যায়।" (অর্থাৎ লাহার কীটগুলি লাহা কাটিয়া বাহির হইয়া যায়)

সাহেব আবার বলিলেন "আচ্ছা, আমি তো আজ তিন দিন এখানে আছি; কই, একটীও তো বাঘ বা ভালুক দেখিলাম না?"

তহশীলদার বলিল "হুজুর, গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের সময় তাহারা বাহির হয় না; সন্ধ্যার পর বাহির হয়। কিন্তু

হুজুরের তাঁবুর চারিদিকে রাত্রিতে আগুন জ্বলে। আগুন দেখিয়া কোনও জানোয়ার এদিকে আসে না।”

সাহেব তহশীলদারের কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “তুমি পাকা তহশীলদার! তুমি যে-সমস্ত কথা বলিলে, তাহা সত্য হইতে পারে; কিন্তু আমি তাহা বিশ্বাস করি না। আচ্ছা, তুমি এখন যাইতে পার।”

তহশীলদার যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া সাহেব বলিলেন “ক্ষেত্র-বাবু, আমি আপনার কৃষিকার্য্যে উৎসাহ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি; আপনার ব্যবস্থাশক্তিও যথেষ্ট আছে। এই কারণে, এই মৌজা আপনাকে বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য আমি গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছি। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, এই মৌজাতে প্রজা স্থাপন করিতে আপনাকে কিছু কষ্ট পাইতে হইবে। এই কারণে, আমরা স্থির করিয়াছি যে, প্রথম পাঁচ বৎসর এই মৌজার জন্য আপনার নিকট কোনও রাজস্ব গ্রহণ করা হইবে না। এই পাঁচ বৎসরের পরে, আপনাকে বিঘা প্রতি অর্দ্ধ আনা হিসাবে রাজস্ব দিতে হইবে। এই রাজস্ব আপনি পাঁচ বৎসর কাল দিবেন। তাহার পর আপনাকে বিঘা প্রতি এক আনা হিসাবে রাজস্ব দিতে হইবে। তাহা হইলে মোট মৌজার রাজস্ব ৫৪৭।৵০

হইবে। এই রাজস্বই চিরস্থায়ী রাজস্ব হইবে। এই মৌজার মধ্যে যে-সকল বড় বড় শালবৃক্ষ সুরক্ষিত করা গিয়াছে, তাহার আনুমানিক মূল্য ৯০০৲ টাকা হয়। গভর্ণমেণ্ট এই গাছগুলিও আপনাকে বিনামূল্যে দিবেন, কিন্তু প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে আপনি একটীও গাছ কাটিতে বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। আপনি এই সময়ের মধ্যে এই মৌজায় প্রজা বসাইতে পারেন কি না, তাহা দেখিয়া তবে আপনাকে গাছের উপর অধিকার দেওয়া হইবে। আপনি সকল কথা ভাল করিয়া বুঝুন। যদি নন্দনপুর মৌজা পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমাকে জানাইবেন। আপনার পত্র পাইলে, আমি পাট্টা ও কবুলতীর মুসাবিদার জন্য কলিকাতায় পত্র লিখিব।"

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "মৌজা বন্দোবস্ত করিয়া লইলে, মৌজার তলসত্বও তো আমার হইবে?"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন "নিশ্চয়ই হইবে। আপনার দলীলে তাহাও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া যাইবে।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আপনার কথিত সর্ত্তে মৌজা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে আমার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু এই মৌজায় যে-সকল প্রজা বসাইব, তাহাদিগকে এক একটী বন্দুকের পাশ দিতে হইবে। নতুবা, এখানে

বাঘ-ভালুকের যেরূপ উপদ্রবের কথা শুনিতেছি, তাহাতে কেহ সহজে এখানে বাস করিতে সাহস করিবে না।"

সাহেব বলিলেন "যোগ্য ব্যক্তিকে বন্দুকের পাশ দিতে আমি আপত্তি করিব না। আর আপনি বাঘ-ভালুকের জন্য ভয় বা চিন্তা করিবেন না। আগামী শীতকালে শিকারের ব্যবস্থা করিয়া আমরা এই স্থানের বাঘ-ভালুক নির্ম্মূল করিব। যদি প্রথম বারে নির্ম্মূল না হয়, তাহা হইলে দুই তিন বার উপর্য্যুপরি শিকারের ব্যবস্থা করিলে তাহারা যে নির্ম্মূল হইবে, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

তাঁবুর সম্মুখভাগে কিয়দ্দূরে একটী পার্ব্বত্য পথ দিয়া কতকগুলি নরনারী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল; এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাদোল বাজাইতেছিল। তাহা দেখিয়া সাহেব ক্ষেত্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই-সকল লোক কোথায় যাইতেছে?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন "আমি বল্লভপুরে একটী হাট স্থাপন করিয়াছি। আজ বুধবারের হাট। ইহারা হাটে যাইতেছে।"

সাহেব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কতদিন হইল হাট স্থাপন করিয়াছেন?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "এই বৈশাখ মাসের প্রথম হইতে।"

সাহেব বলিলেন "চমৎকার তো! চলুন, আপনার সঙ্গে আমরা আপনার হাট দেখিয়া আসি। এখন বৈকাল হইয়াছে। রৌদ্রের তেজও আর বেশী নাই।" এই বলিয়া তিনি ডেপুটী কলেক্টার ও সতীশচন্দ্রকে হাট দেখিতে যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন।

তিনি হাকিমে সাইকেলে যাওয়া অভিপ্রায় করিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "এই পাহাড়ের উপর দিয়া একটা সোজা পথ আছে, আমি সেই পথে যাইতেছি।"

ষট্‌-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথ ডেপুটী কমিশনারের নিকট বিদায় লইয়া পার্ব্বত্য পথ অবলম্বন করিলেন। লখাই সর্দ্দার ও শিকারী কার্ত্তিক ভূমিজ দুই বন্দুক লইয়া তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ চলিল। হাকিমেরা সাইকেলে চাপিয়া অর্দ্ধঘণ্টা বা তিন কোয়ার্টারের মধ্যেই হাটে পঁহুছিবেন: এই কারণে, ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে, শীঘ্র উপনীত হইতে উৎসুক হইলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার অনুচরদ্বয় একটী সরল অথচ দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অবলম্বন করিল। পথের উভয় পার্শ্বেই ঘনসন্নিবিষ্ট বন। দুর্গম বলিয়া এই পথে কেহ বড় একটা গতায়াত করে না। অধিকন্তু এই পথে বন্য পশুর ভয়ও আছে। কিন্তু ক্ষেত্রনাথের অনুচরদ্বয় মনে করিল, দিনের বেলায় ভয়ের কোনও কারণ নাই। ক্ষেত্রনাথ অতিশয় কষ্টে কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে অনুচরদ্বয়ের সহিত পর্ব্বতশৃঙ্গে উপনীত হইলেন। পর্ব্বতা-রোহণে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হওয়ায়, তিনি অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিবার জন্য বৃক্ষচ্ছায়াসমন্বিত এক পরিচ্ছন্ন শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন।

মস্তকের উপরিভাগে বৃক্ষশাখায় বসিয়া আরণ্য পক্ষি-সমূহ কূজন করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে পবনহিল্লোলে বৃক্ষপত্রসকল মর্ম্মরিত হইতেছিল এবং বল্লভপুরের

হাটের মহান্‌ কলরব দূরবর্ত্তী বারিধির অস্পষ্ট কল্লোলের ন্যায় তাঁহাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছিল। শীতল বায়ুস্পর্শে ক্ষেত্রনাথের কপোলদেশে শ্রমবিগলিত স্বেদ-বিন্দুচয় বিশুষ্ক হইয়া গেল; তাঁহার ক্লান্তি অনেকটা বিদূরিত হইল, এবং তাঁহার শ্রান্ত দেহে আবার বলসঞ্চার হইল। তখন তিনি পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিবার জন্য অনুচরদ্বয়ের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন।

সেই দুর্গম পথে কিয়দ্দূর অবতরণ করিতে না করিতে অগ্রবর্ত্তী লখাই সর্দ্দার সহসা নিশ্চল হইল, এবং বামহস্ত তুলিয়া সঙ্কেত করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী সঙ্গিদ্বয়কে অনুচ্চস্বরে বলিল "ঠহর যা।" কার্ত্তিক ভূমিজ মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহারা এবং ক্ষেত্র-নাথ সভয়ে দেখিলেন যে, প্রায় একরশি নিম্নে, স্নিগ্ধ বৃক্ষচ্ছায়াতলে, তাঁহাদের গমনপথ অবরুদ্ধ করিয়া, এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রী বসিয়া আছে! তাঁহাদের দিকে ব্যাঘ্রীর পৃষ্ঠদেশ রহিয়াছে এবং তাহার সম্মুখে দুইটী শাবক ক্রীড়া করিতেছে। ব্যাঘ্রীকে দেখিবামাত্র ক্ষেত্রনাথের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, কণ্ঠ ও তালু বিশুষ্ক হইল, এবং চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। সেই মুহূর্ত্তেই শৃঙ্গাভিমুখে তাঁহার পলায়ন করিবার প্রবৃত্তি প্রবলা হইল। তাহা যেন বুঝিতে পারিয়াই লখাই অনুচ্চ-কণ্ঠে বলিল "গলা, তোর কিছু ডর নাই আছে; ঠহর

যা।” ক্ষেত্রনাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভীতিবিহ্বল-নেত্রে কালান্তকতুল্য সেই ব্যাঘ্রীকে দেখিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে, লখাই ও কার্ত্তিক চুপি চুপি কি পরামর্শ করিয়া ব্যাঘ্রীর দিকে নিঃশব্দে দুই দশ পদ অগ্রসর হইল। সহসা একটা ব্যাঘ্রশাবক তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া একটা অস্ফুট ভয়সূচক চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শ্রবণ করিবামাত্র ব্যাঘ্রী ঘাড় ফিরাইয়া তাহার পশ্চা-দ্দিকে চাহিল। নিমেষমধ্যে ডুড়ুম্ শব্দে বন্দুকের আওয়াজ হইল। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকম্পকারী এক ভয়াবহ গর্জ্জন শ্রুত হইল। বন্দুকের ধূম অপসারিত হইলে, দেখা গেল ব্যাঘ্রী সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলশায়িনী হইয়াছে, কিন্তু তাহার দেহ হইতে তখনও প্রাণ বিযুক্ত হয় নাই। লখাই অমনই লম্ফ দিয়া কতিপয় পদ ধাবিত হইয়া ব্যাঘ্রীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যাঘ্রী নিস্পন্দ হইয়া গেল।

এই ব্যাপারটি যেন চক্ষুর নিমেষের মধ্যেই সংঘটিত হইল। কিন্তু এই সামান্য মুহূর্ত্তটি ক্ষেত্রনাথের নিকট তীব্রযন্ত্রণাদায়ক অনন্ত কালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ব্যাঘ্রী নিস্পন্দ হইলে, লখাই ও কার্ত্তিক হর্ষে ও উৎসাহে লম্ফ দিয়া তাহার দিকে ধাবমান হইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার সমীপবর্ত্তী হইল। শাবকদ্বয়ের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত কার্ত্তিক পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট

হইল। ক্ষেত্রনাথ সেই স্থলে একাকী দণ্ডায়মান থাকিতে অথবা অগ্রসর হইতেও সাহস করিলেন না। পরে লখাই সর্দ্দারের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে তিনি কম্পিত ও স্খলিত চরণে তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। ব্যাঘ্রীর লম্বিত দেহের উপর একটী পদ রক্ষা করিয়া লখাই তাহাকে উল্লাসপূর্ণ নয়নে দেখিতেছিল; তথাপি ক্ষেত্রনাথ ব্যাঘ্রীর সমীপবর্ত্তী হইতে সাহস করিলেন না। পরে হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করিয়া লখাইয়ের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং অনিমিষ লোচনে ব্যাঘ্রীকে দেখিতে লাগিলেন। তখনও ব্যাঘ্রীর আঘাতস্থলে ও মুখ হইতে উত্তপ্ত শোণিত-ধারা অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইতেছিল এবং সম্ভবতঃ তখনও তাহার দেহ উত্তপ্ত ছিল। তাহার হরিদ্রাভ লম্বিত দেহ, সুচিক্কণ লোমরাজি ও দীর্ঘকৃষ্ণ রেখাচিহ্নিত গাত্র দেখিয়া তিনি তাহাকে "শালদা বাঘ" (Royal Bengal tigress) বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং অদ্য ইহার করাল গ্রাস হইতে যে রক্ষা পাইয়াছেন তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি এই ভীষণ স্থানে আর অধিকক্ষণ থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতে ব্যস্ত হইলেন। লখাই বলিল, তাহারা এই ব্যাঘ্রীকে না লইয়া যাইবে না। এই কারণে সে কার্ত্তিককে আহ্বান করিতে লাগিল। কার্ত্তিক অরণ্যের অভ্যন্তর হইতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সেই স্থানে

উপনীত হইল। কার্ত্তিক অনেক চেষ্টা করিয়াও শাবক-দ্বয়কে ধরিতে পারিল না; তাহারা কোথায় যে লুকাইল, তাহা সে জানিতে পারিল না। ক্ষেত্রনাথ গৃহে প্রত্যাগত হইতে ব্যস্ত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া লখাই তাঁহার সমভি-ব্যাহারে পর্ব্বতের তলদেশ পর্যন্ত গমন করিল; পরে ব্যাঘ্রীর দেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য পুনর্ব্বার সেইস্থলে ফিরিয়া গেল। ইত্যবসরে কার্ত্তিক তাহার ছোট কুঠারের দ্বারা একটী বোলা কাটিতে লাগিল এবং ব্যাঘ্রীর পদচতুষ্টয় বন্ধন করিবার জন্য আরণ্যলতা সংগ্রহ করিল।

ক্ষেত্রনাথ পর্ব্বতের পাদমূলের অরণ্য অতিক্রম পূর্ব্বক উন্মুক্ত স্থানে উপনীত হইয়া দেহে যেন পুনর্ব্বার প্রাণ পাইলেন। তখনও তাঁহার বক্ষ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। তিনি ইতিপূর্ব্বে জীবনে কখনও অরণ্যে ব্যাঘ দেখেন নাই বা ব্যাঘের সম্মুখে পড়েন নাই। লখাই ও কার্ত্তিক সঙ্গে না থাকিলে আজ তাহার কি যে দশা হইত, তাহা চিন্তা করিতেও তাঁহার দেহ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। নন্দাজোড় পার হইবার সময়, তাহার শীতল জলে তিনি হাতমুখ প্রক্ষালন করিলেন ও মস্তক ধুইয়া ফেলিলেন। এইরূপে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া, তিনি হাটের সন্নিহিত হইলেন।

হাটে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, হাকিমেরা

দশমিনিট পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন ও হাট দেখিয়া বেড়াইতেছেন। ক্ষেত্রনাথ অবিলম্বে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া পথের দুর্ঘটনার কথা তাঁহা-দিগকে বলিলেন। ডেপুটী কলেক্টার ও সতীশচন্দ্র তাহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু সাহেব ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ক্ষেত্রবাবু আজ আপনার কি সৌভাগ্য! নন্দনপুরে আজ তিন চার দিন থাকিয়াও আমি একটা শৃগাল দেখিতে পাইলাম না। আর আপনারা একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার মারিয়া ফেলিলেন! আমি সাইকেলে না আসিয়া আপনার সঙ্গে পার্ব্বত্য পথে বল্লভপুরে আসিলেই খুব ভাল করিতাম। তাহা হইলে, আজ ব্যাঘ্র শিকারের আমোদ অনুভব করিতে পারিতাম। যাই হোক, আপনার শিকারীরা যে খুব ক্ষিপ্রহস্ত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক সেকেণ্ড বিলম্ব করিলে, ব্যাঘ্রী তাহার শাবক সহিত অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইত। ব্যাঘ্রী অতিশয় সন্তানবৎসল। সন্তান রক্ষা করিবার জন্য সে অসম-সাহসও প্রদর্শন করে। তাহার শাবক দুইটাকে ধরিতে পারিলে চমৎকার হইত। আপনি নিজে বন্দুক চালাইতে ও শিকার করিতে শিক্ষা করুন। আপনার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনি অদ্যকার ঘটনায় পড়িয়া যেন ভীত হইয়াছেন।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এরূপ ঘটনার মধ্যে পড়ি নাই। কিন্তু আমি ভরসা করি যে, কাল-ক্রমে আমিও শিকারে অভ্যস্ত হইব। আমার অনুচর-দ্বয় নির্ভীকচিত্তে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং তাহাদের উল্লাস ও উৎসাহের সীমা নাই!"

সাহেব বলিলেন "প্রকৃত শিকারীর লক্ষণই তাই। যাই হোক, চলুন, এখন আপনার হাটের সকল স্থল দেখিয়া আসি।"

ক্ষেত্রনাথ তাঁহাদিগকে হাটের সর্ব্বস্থানে লইয়া গেলেন। সুবিন্যস্ত আপন-শ্রেণী, মনিহারী দোকান, মশলার দোকান, বাসন-কাপড়ের দোকান, খাবারের দোকান, হাটে বিক্রয়ের জন্য আনীত অসংখ্য পশুপক্ষী ও নানাবিধ দ্রব্য, এবং পাঠশালা-গৃহ ও পোষ্ট-অফিস্ প্রভৃতি দেখিয়া সাহেব অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ক্ষেত্রনাথের উদ্যম, অধ্যবসায় ও ব্যবস্থা-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ—

"ক্ষেত্রবাবু, আপনার উদ্যম ও ব্যবস্থাশক্তি দেখিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। ইয়োরোপীয়দিগের ন্যায় আপনার চেষ্টা ও কার্য্যপ্রণালী। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আপনার ন্যায় উদ্যোগী বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। আপনি এই অল্পদিনের মধ্যে

অসম্ভবকে সম্ভবপর করিয়াছেন। আপনাদের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের জন্য কত কার্য্যই রহিয়াছে। আপনাদের এই দেশে কত প্রভূত ধনরত্ন সঞ্চিত রহিয়াছে! সেদিকে শিক্ষিত লোকের কোনও দৃষ্টি নাই। তাঁহারা কেবল চাকরী ও ওকালতীর জন্যই ব্যস্ত! চাকরী বা ওকালতী দ্বারা কেবল নিজের অবস্থার কিছু উন্নতি হইতে পারে তাহা সত্য বটে, কিন্তু দেশের লোকের তাহাতে কি উপকার হয়? ইংরাজ জাতি যদি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি আসক্ত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা জগতে কদাপি এরূপ উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন না। ভাবিয়া দেখুন, ভারতবর্ষে এত বড় একটা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা একটা ব্যবসায়ী কোম্পানী! এদেশের সমস্ত ব্যবসায়ই ইয়োরোপীয়গণের হস্তে রহিয়াছে। কয়লার খনি, অভ্রের খনি, লোহার খনি, স্বর্ণের খনি, পাটের ব্যবসায়, কল-কারখানা, চা-বাগান, হৌস ইত্যাদি অধিকাংশই ইংরাজের হস্তে। আর এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কেবল তাঁহাদের অধীনে কেরাণীগিরি করিবার জন্য লালায়িত! স্বাবলম্বন শক্তিকে জাগরিত না করিলে, জগতে কোনও জাতি বা ব্যক্তি উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হন না। স্বাবলম্বন শক্তির আশ্রয়েই লোকে শ্রেষ্ঠত্বে উপনীত হয়। আমি বাঙ্গালীদের মধ্যে স্বাবলম্বন শক্তির একান্ত অভাব দেখিয়া অনেক সময়ে বিস্মিত ও দুঃখিত হই। আপনারা শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হউন;

দেখিবেন, তদ্দ্বারা আপনাদের প্রভূত ধনসঞ্চয় হইবে, আপনারা বহুলোক পালন করিতে পারিবেন, আপনাদের দেশের অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জনসঙ্ঘের মঙ্গলসাধন করিতে পারিবেন এবং সর্ব্বত্রই শক্তিমান্ লোক বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিবেন। তখন সকলেই আপনাদিগকে সম্মান করিবেন, এবং কেহই আপনাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। ক্ষেত্রবাবু, আমি আপনার উদ্যোগ ও অধ্যবসায় দেখিয়া মনের আনন্দে আজ অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। আপনি ভাবিয়া দেখিবেন, আমার কথা যথার্থ কিনা। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই কার্য্যে চরম উন্নতিলাভ করুন, এবং আপনার সাধু দৃষ্টান্ত দেখিয়া এদেশের শিক্ষিত যুবকগণ আপনার পদাঙ্কের অনুসরণ করুন।”

ডেপুটী কমিশনার সাহেবের বাক্য শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ অতিশয় আহ্লাদিত ও উৎসাহিত হইলেন এবং তাঁহার শুভকামনার জন্য কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

হাট দেখিয়া সাহেব ক্ষেত্রবাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময়ে লখাই সর্দ্দার ও কার্ত্তিক ভূমিজ একটী সুদৃঢ় রোলাতে ব্যাঘ্রীর মৃত-দেহ ঝুলাইয়া ও সেই রোলাটি স্কন্ধে বহন করিয়া

হাটের বহির্ভাগে উপনীত হইল। শত শত নরনারী ব্যাঘ্রীর দেহ দেখিবার জন্য ছুটিল। ক্ষেত্রনাথের সমভি-ব্যাহারে হাকিমেরাও তাহা দেখিতে গেলেন। সাহেব ব্যাঘ্রীর দেহ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হই-লেন। তিনি বলিলেন "ইহা পূর্ণবয়স্ক ব্যাঘ্রী দেখি-তেছি, এবং ইহা রয়াল বেঙ্গল জাতীয় বটে। ইহার চর্ম্ম কি সুন্দর!" এই বলিয়া তিনি ব্যাঘ্রীর গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আপনি অনুমতি করিলে, ইহার চর্ম্মটি প্রস্তুত করাইয়া আপ-নাকে উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।" সাহেব ক্ষেত্রবাবুকে তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, আমি নিজে যে ব্যাঘ্র না মারিয়াছি, তাহার চর্ম্ম কখনও গ্রহণ করি নাই। আপনার ও আপনার শিকারীদেরই ইহা প্রাপ্য। আপনি এই চর্ম্মটি আপনার কাছে রাখিবেন। ইহা আপনাকে অদ্যকার ঘটনা সর্ব্বদা স্মরণ করাইবে, এবং আপনার মনে শিকার করিবার প্রবৃত্তিও জাগরিত করিবে।" এই বলিয়া তিনি শিকারীদ্বয়ের ক্ষিপ্রহস্ততার প্রশংসা করিলেন এবং প্রত্যেককে পাঁচটাকা করিয়া অর্থপুরস্কার দিলেন। লখাই ও কার্ত্তিক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া দুই হাতে সাহেবকে সেলাম করিতে লাগিল।

শিকারীদের সহিত সাহেব যখন কথাবার্ত্তা কহিতে-

ছিলেন, সেই সময়ে সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "ক্ষেত্তর, এ যে ভয়ানক বাঘ দেখ্‌ছি ! আজ খুব বেঁচেছ, যা হো'ক। আজকার দিনটি তোমার পক্ষে খুব শুভ। নন্দনপুর মৌজার যেরূপ বন্দোবস্ত হ'ল, তাও তোমার পক্ষে খুব ভাল। সাহেব কাল সকালে ক্যাম্প তুল্‌বেন। আমি বৈকালে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা ক'রে যাব। সাহেব তোমার উপর ভারি সন্তুষ্ট।"

অল্পক্ষণ পরেই হাকিমেরা ক্ষেত্রবাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বল্লভপুর ত্যাগ করিলেন।

লখাই ও কার্ত্তিক ব্যাঘ্রীর মৃতদেহ বহন করিয়া মনোরমাকে দেখাইল। লখাইয়ের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া মনোরমার হৃদয়ের ভাব যে কিরূপ হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। হাট ভাঙ্গিয়া গেলে, সন্ধ্যার পর ক্ষেত্রনাথ মনোরমাকে অদ্যকার ঘটনার কথা বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। মনোরমাকে ভীত ও নির্ব্বাক্ দেখিয়া, ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "মনোরমা, আরণ্যজীবনের এইগুলি আনুসঙ্গিক ব্যাপার। এতে ভয় পেলে চল্‌বে না। ভয় কোথায় নাই ? সহরেও আছে, বনেও আছে। ভগবান্ যাকে রক্ষা ক'রেন, তা'কে কেউ মার্‌তে পারে না ; আর তিনি মার্‌লে, কেউ বাঁচাতে পারে না। তাঁর দয়ার উপর নির্ভর ক'রেই আমাদের বলা উচিত।" কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি আবার বলিতে লাগি-

লেন “দেখ, আজ্‌কের এই ব্যাপারের একটা দৃশ্য যেমন সুন্দর, তেমনই করুণ ও শোকাবহ হ'য়েছিল। সেটা আমি জীবনে কখনও ভুল্‌তে পার্‌বো না। যখন আমি দেখ্‌লাম, বাঘিনী সেই নির্জ্জন পাহাড়ে, নিবিড় ছায়ার মধ্যে, রাজরাণীর মত ব'সে তার বাচ্ছাদুটীর খেলা দেখ্‌ছে, তখন আমি যেন মা জগদ্ধাত্রীকে দেখ্‌তে পেলাম। এই পশুর হৃদয়েও জগন্মাতার মাতৃ-স্নেহ তখন পূর্ণমাত্রায় ফুটে উঠেছিল। মহামায়ার মায়ার খেলা দেখে ভয়ের সহিত আমি বিস্ময়ও অনুভব ক'রেছিলাম। আহা, বাঘিনীর মনের এমন কোমল ভাবের উচ্ছ্বাসের সময়,—যখন তার মাতৃস্নেহের অমিয়ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল, ঠিক্ সেই সময়ে, কার্ত্তিকের বন্দুকের সাংঘাতিক গুলি তাকে ধরাশায়িনী ক'রে ফেল্‌লে। এই দৃশ্যটি দেখে, আমার হৃদয়ে বড় আঘাত লেগেছে। আমি তার মৃতদেহটি দেখে দু'এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে থাক্‌তে পারি নাই।”

মনোরমা সন্তানের জননী। স্বামীর এই কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহারও হৃদয় ব্যাকুল ও চক্ষুর্দ্বয় সজল হইয়া উঠিল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতঃকালে, ক্ষেত্রনাথ লখাই সর্দ্দারকে বলিলেন "লখাই, নন্দনপুর মৌজা আমি সরকার বাহাদুরের কাছে বন্দোবস্ত ক'রে নিচ্ছি। ঐ মৌজাটি নিলে আমাদের লাভ হ'বে তো?"

লখাই বলিল "তুই লাভের কথা ব'ল্‌চুস্, গলা? লাভ খুব হ'ব্যেক্। অমন মৌজা ই তল্লাটে আর নাই আছে। কাল ওথাতেই তহশীলদারের কাছে শুন্‌লি যে সাহেব মৌজাটো তোকে দিব্যেক।" *

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তুমি লাভ হ'বে, ব'ল্‌ছো; কিন্তু কাল তহশীলদার সাহেবকে বল্‌লে যে, নন্দনপুরে বাঘ-ভালুকের ভয়ানক উপদ্রব। ভয়ে কোনও লোক সেখানে বাস ক'র্‌তে চায় না—এমন কি যেতেও চায় না। কেহ মহুয়া ফুল কুড়োতে বা লাহা ভাঙ্গতে যায় না।" গত-কল্যকার ঘটনাটি ক্ষেত্রনাথের মনে আবার জাগিয়া উঠিল।

লখাইসর্দ্দার রাগিয়া বলিল "উটো মিছা কথা

* লখাই বলিল "প্রভু, আপনি লাভের কথা বল্‌ছেন? লাভ বিলক্ষণ হ'বে। এরূপ মৌজা এ অঞ্চলে আর নাই। কাল ওখানেই তহশীলদারের কাছে শুন্‌লাম যে, সাহেব মৌজাটি আপনাকে দিবেন।"

ব'লেছে, গলা। বাঘভালুক কুথায় নাই আছে? বাঘ তো বনকুকুর বটে; আর ভালগুলান্ তো বনছাগল বটে। ইগুলান্‌কে আবার কিসের ডর? তহশীলদারটো ভারি বজ্জাত লোক বটে। সে বরষ বরষ মোল, কঁচড়া, লা, তসর—সব ভিন গাঁয়ের লোককে বিকে কি ন? পর, এথার লোককে নাই বিকে; এথার লোককে সে নন্দনপুরে নাই সামাতে দেয়। কেহু একটা শালপাত টুকেচে কি অমনি তাকে ধরপাকড় করেছে। তহশীলদারের ডরে কেহু নন্দনপুরে নাই সামায়।" †

ক্ষেত্রনাথ সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন "নন্দনপুরের জমী বিলি ক'র্‌লে, লোকে তা' বন্দোবস্ত ক'রে নেবে তো?"

লখাই বলিল "কেনে নাই লিব্যেক্ হে? সবাই লিব্যেক্। নন্দনপুরের মাটীচলে ভাল মাটী ইগুল্লাটে আর কুথায় পাবি। বাঘভালুকের কিসের ডর আছে? তোর

† লখাই বলিল "প্রভু, সে মিথ্যা কথা ব'লেছে। বাঘ ভালুক কোথায় নাই? বাঘ তো বনকুকুরের তুল্য, আর ভালুক তো বনছাগলের তুল্য। এদের আবার কিসের ভয়? তহশীলদার ভারি বজ্জাত লোক। সে প্রতি বৎসরই ভিন্ন গ্রামের লোককে মহুয়া, কঁচড়া, লাহা ও তসর বিক্রয় করে। কিন্তু এই গ্রামের লোককে কখনও বিক্রয় করে না বা নন্দনপুরে ঢুকতে দেয় না। কেউ একটী শালপাতা ছিড়িলে, সে তাকে ধরপাকড় করে। তহশীলদারের ভয়ে কেউ নন্দনপুরে প্রবেশ করে না।"

রায়তগুলাই বাঘভালুক খেদ্দাড়ে দিবোক্।” কিয়ৎক্ষণ পরে লখাই আবার বলিল “ঐ গাঁটোতে বহুত মোল, কুসুম, পলাশ, মুরগা, সৎসারের—আর-মরু উটোর কি নাম বটে—ভাল পাশুরে গেলুছি—হুঁ আসন—আসনই বটে—এই সব পেঁড় আছে। এই সব পেঁড়ে তোর বহুত টাকা হব্যেক্। এত টাকা তুই কুথায় রাখ্বি, গদা?” *

ক্ষেত্রনাথ লখাইয়ের কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। তাহার সহিত আরও আলাপ করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, নন্দনপুর মৌজায় তিন চারি শত কুসুম-গাছ আছে। কুসুমগাছে লাহা লাগাইলে, এক এক গাছে অন্ততঃ দেড়শত টাকার লাহা উৎপন্ন হইবে। যদি গাছ খাশে রাখিয়া প্রজাদিগকে প্রতিবৎসর বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহারা গাছ অনুসারে প্রতি গাছের জন্য পাঁচ টাকা হইতে

* লখাই বলিল “কেন নেবে না? সকলেই নেবে। নন্দন পুরের মাটীর চেয়ে এ অঞ্চলে ভাল মাটী আর কোথায় পাবেন? বাঘ ভালুকের কিসের ভয়? আপনার প্রজারাই বাঘ ভালুক তাড়িয়ে দেবে।” কিয়ৎক্ষণ পরে সে আবার বলিল “ঐ গ্রামে অনেক মহুয়া, কুসুম, পলাশ মুর্গা, সৎসায়ের—আর ওর কি নাম, ভুলে যাচ্ছি না—হাঁ—আসন—আসনই বটে—এই সব গাছ আছে। এই সব গাছে আপনার অনেক টাকা হ'বে। প্রভু, আপনি এত টাকা রাখ্বেন কোথা?”

দশ টাকা পর্য্যন্ত খাজনা দিবে। কুলগাছের সংখ্যা করা যায় না। কুলগাছেও বিস্তর লাহা উৎপন্ন হয়। মহুয়া গাছের সংখ্যা হাজারেরও অধিক হইবে। প্রতি গাছে বার্ষিক এক টাকা করিয়া খাজনা আদায় হইতে পারে। আসন গাছও দুই তিন শত আছে, তাহাতে তসরের গুটি হয়। সেই গাছগুলিও খাজনায় বিলি হইবে। এই সমস্ত গাছ ছাড়া রাখা বন (অর্থাৎ সুর-ক্ষিত বড় শালগাছের বন) আছে, জঙ্গল আছে, আর পাহাড়ের উপর সংসায়ের, মুরগা প্রভৃতি অনেক বহুমূল্য বৃক্ষ আছে। সেই সমস্ত বৃক্ষের কাষ্ঠে টেবিল, চেয়ার, আলমারী, পালঙ্ক প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। লথাইয়ের মুখে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ বিস্মিত হইলেন।

বৈকালে সতীশচন্দ্র আসিলেন। আসিবার সময় শ্বশুরবাড়ীতে নামিয়া সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি-লেন। তিনি সাইকেল্‌টি রাখিয়াই বলিলেন "ক্ষেত্তর, তোমার এখানে আসাও যা, আর ঢেঁকীসাল দিয়ে কটক যাওয়াও তা। সম্মুখের ঐ পাহাড়ের উপত্যকা-ভূমি থেকে বেরিয়েই তোমার বাড়ীটি নজরে পড়ে। সেখান থেকে তোমার বাড়ী এক মাইলেরও অধিক নয়, কিন্তু এদিকে মানুষ চ'ল্‌বার সুঁড়ি রাস্তা ভিন্ন আর রাস্তা নাই। কাজেই ঐ দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের কোলে কোলে এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে তবে তোমার

গ্রামের পশ্চিমভাগে উপনীত হওয়া যায়। তারপর সমস্ত গ্রামটি পার হ'য়ে তোমার বাড়ী আস্‌তে হয়। তোমার বাড়ীর পূর্ব্বদিকে ঐ পাহাড়ের কোলে কোলে একটা সোজা রাস্তা তৈয়ার হয় না কি?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তা হ'বে না কেন? তবে তা বিলক্ষণ ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু এঁকে বেঁকে, ঘুরে ফিরে গ্রামের ভিতর দিয়ে আস্‌তে তোমার তো কষ্ট হওয়া উচিত নয়? পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙ্গিয়েও শ্বশুরবাড়ী যেতে লোকের কষ্ট হয় না।" এই বলিয়া ক্ষেত্রনাথ চক্ষু নিটাইয়া একটু হাসিলেন।

সতীশচন্দ্রও ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "ওঃ, তা সত্য বটে! কিন্তু তুমি বুঝি সেই গানটা ভুলে গেছ;

'পিয়া বিনু সব শূন ভাওবে।'

প্রিয়া যেখানে নাই, তা বাড়ীই হোক্, আর শ্বশুরবাড়ীই হোক্, সবই শূন্য। এ সত্যটা তুমিও বেশ বোঝ; সুতরাং এ সম্বন্ধে তোমায় আর বেশী কিছু বল্‌তে হ'বে না। থাক্ এখন সে কথা। এখন হচ্ছে এই সোজা রাস্তাটীর কথা। কাল সাহেব সাইকেলে তোমার এখানে আস্‌তে আস্‌তে এই সোজা রাস্তাটি প্রস্তত ক'রবার কথা ব'লছিলেন। সম্ভবতঃ এ সম্বন্ধে হরিগোপালের উপর শীঘ্র হুকুমজারী হ'বে।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তা হ'লে তো খুব সুখেরই

বিষয় হয়। আমিও অনেকবার এই সোজা রাস্তাটির কথা ভেবেছি; কিন্তু এই রাস্তায় নন্দাজোড়টি দুইবার পার হ'তে হয়। নন্দার উপর দুইটী সেতু প্রস্তুত না হ'লে, এই রাস্তা প্রস্তুত করা বৃথা। কিন্তু দুইটী সেতু প্রস্তুত করা এখন আমার সাধ্যাতীত। তবে ডেপুটী কমিশনার সাহেব যদি অনুগ্রহ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা। এই রাস্তাটি প্রস্তুত হ'লে নন্দনপুর যাওয়ার পক্ষেও আমাদের খুব সুবিধা হ'বে। পাহাড়ে পাহাড়ে ওঠা-নামা করা আমার অভ্যাস নাই। কাল পাহাড়ের রাস্তায় যাওয়া-আসা ক'রে আজ আমার সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ পায়ে, ভয়ানক বেদনা হ'য়েছে।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "সাহেব কাল নন্দনপুর সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত ক'র্লেন, তা চমৎকার হ'য়েছে। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, বন্দোবস্ত এমন সুবিধাজনক হ'বে। সাহেব তোমার উপর ভারি সন্তুষ্ট। কাল সন্ধ্যার সময় কেবল তোমার কথাই ব'ল্‌ছিলেন। থাক্ সে সব কথা। এখন নন্দনপুর বন্দোবস্ত ক'রে নেওয়া সম্বন্ধে আজই তোমার সম্মতি জানিয়ে সাহেবকে একখানা পত্র লিখে দাও; আর তাঁকে লিখ, যে, পাট্টা-কবুলতী সম্পাদিত হ'তে যখন কিছু বিলম্ব হ'বে, তখন এখন থেকেই তিনি অনুমতি দিলে, তুমি এবৎসর নন্দনপুরের মহুয়ার ফশলটি আদায় ক'র্‌তে পার।

নতুবা পরে তা আর আদায় হ'বে না। আমি শুন্‌লাম, মহুয়াফুল এবৎসর কিছু 'নামী' হ'য়েছে, আর গাছে প্রচুর ফুলও ধ'রেছে। এই সবেমাত্র ফুল ঝরে প'ড়তে আরম্ভ হ'য়েছে। সাহেব তোমাকে বৈশাখের স্থরু থেকেই মৌজা বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন, তা ডেপুটী কলেক্টার ব'লছিলেন। স্থতরাং তাঁর কোনও আপত্তি না হ'বারই কথা। আমি দেখেছি যে, নন্দনপুরে অসংখ্য মহুয়া গাছ আছে। তুমি যদি মহুয়াফুল সংগ্রহ ক'রতে পার, তা হ'লে প্রথমেই কিছু টাকা পা'বে। তারপর মহুয়ার ফল পাক্‌লে, তার আঁটিগুলি সংগ্রহ ক'রবে। আঠি থেকে চমৎকার তেল বা'র হয়। তার নাম কঁচড়া তেল। এদেশের লোক এই তেল মাখে, খায়, আর প্রদীপে জ্বালায়। কিন্তু ইয়োরোপে এই তেলের বিলক্ষণ আদর! জর্ম্মেণীতে এই তেল থেকে মাখন (butter) প্রস্তুত হয়। তা খেতে দুগ্ধের মাখনের মতনই উপাদেয় ও উপকারী। এই তেল ক'লকাতায় চালান দিলে বিলক্ষণ দুই পয়সা পাবে। যখন ব্যবসা আরম্ভ ক'রেছ, তখন ব্যবসা ভাল করেই কর। আর যে সকল কুসুম গাছ আছে, তাঁদের ফলের আঠিগুলিও সংগ্রহ ক'রতে ভুল না। কুসুমের বীজ থেকেও সুন্দর তেল বা'র হয় ও অনেক কাজে লাগে। হরিতকী, বহেড়া, আমলার গাছও তো অনেক দেখ্‌লাম। তাদের

তলায় ফল বিছিয়ে আছে। এদেরও দাম আছে, তা তোমার জানা উচিত। এক বনজ ফল থেকেই তুমি অনেক টাকা পাবে।

"এই গেল এক কথা; আর এক কথা তোমায় আমি ব'লতে চাই। মৌজাটি বন্দোবস্ত হ'য়ে গেলেই, তুমি সার্ভে নক্সা ও চিঠার নকল নেবে। সার্ভে নক্সা ও চিঠায় মৌজার মোটামুটি বিবরণ আছে; কিন্তু মৌজাসম্বন্ধে তোমার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানা আবশ্যক। কত জমী আবাদযোগ্য, আর কত জমী আবাদের অযোগ্য, আর মৌজার কোন্ কোন্ অংশে সেইরূপ জমী আছে—তা জান্‌বার জন্য তোমাকে কিছু দিনের জন্য এক আমীন নিযুক্ত ক'র্‌তে হ'বে। আমি একজন ভাল আমীন ঠিক ক'রেছি। তাঁকে বেতন কিছু দিতে হ'বে না; কেবল বিনা সেলামীতে তাকে কিছু জমী বাৎসরিক খাজনায় বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, আর তার সঙ্গে জন চার কুলি দিতে হ'বে। সেও এই অঞ্চলে বসবাস ক'রে কৃষিকাজ করতে চায়। আমীন নক্সা প্রস্তুত কর্‌লে, তুমি তা দেখে মৌজার অবস্থা এবং কোন্ স্থানে কি প্রকার জমী আছে ও কত জমী আছে, তা বুঝ্‌তে পার্‌বে। মৌজাতে প্রজা স্থাপন করা আবশ্যক। রজনীদাদার ছেলে নিশি তো এখানে নিশ্চয় আস্‌বেই। সে ছাড়া যতীন চারু এবং আরও অনেকে

আস্‌বে। সকলেরই কাছ থেকে জমীর শ্রেণী অনুসারে
। যথাপ্রতি কিছু সেলামী নিতে হ'বে; আর তারা যেস্থানে
বাড়ী প্রস্তুত ক'র্‌বে, তাহাও নির্দ্দেশ ক'রে দিতে হ'বে।
আমার ইচ্ছা, নন্দনপুরে তুমি একটী আদর্শ গ্রাম স্থাপন
কর। রাস্তা ও জলনিকাশের পথ প্রভৃতি স্থির ক'রে,
তার পর গ্রাম বসা'বে। তা না হলে, যেখানে সেখানে
লোকে ঘর প্রস্তুত ক'র্‌বে,আর স্থানটিকে অস্বাস্থ্যকর ক'রে
ফেল্‌বে। এ বিষয়ে আমি আর হরিগোপাল তোমাকে
পরামর্শ দেব। আগে এই সমস্ত কাজ সম্পন্ন কর; তার
পর নন্দনপুরে যে সকল খনিজ পদার্থ আছে, তার কথা
আমি তোমাকে ব'ল্‌বো। তুমি কাল সাহেবকে তল-
সত্ত্বের কথা ব'লে ভালই করেছ। আর বাঘ ভালুকের ভয়
তুমি করো না! কাল্‌কের ঘটনা দেখে মনে করো না
যে, নন্দনপুরবা ঘভালুকে পরিপূর্ণ। তহশীলদার তার
প্রাণ বাঁচাবার জন্যই কাল অতিরঞ্জিত ক'রে বাঘভালুকের
কথা ব'লেছিল। আর বাঘভালুক থাক্‌লেও, যারা
সেখানে বাস করবে, তারাই তাদের তাড়াতে শিখ্‌বে।
ঘরমুখো ভীরু বাঙ্গালীর আদর্শ এদেশ থেকে যত শীঘ্র
তিরোহিত হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। সকলে সাহস
শিক্ষা করুক; বিপদের সম্মুখীন হ'তে শিখুক, আর
বিপদকে জয় করুক। মুস্কিলে না পড়্‌লে, কখনও সাহস
ও বুদ্ধি স্ফুরিত হয় না। ক'ল্‌কাতার ক্ষেত্রনাথ, আর

বল্লভপুরের ক্ষেত্রনাথের মধ্যে অনেক তফাৎ। তুমি যেন একটা নূতন মানুষ হ'য়েছ। তোমার উদ্যোগ ও অধ্যবসায় দেখে আমিই বিস্মিত হ'য়ে প'ড়েছি। সাহেব তো হবেনই। যাই হোক্, তুমি অদম্য উৎসাহে কাজ করে যাও; কিছুতেই পেছ-পা হয়ো না।"

ক্ষেত্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে সৌদামিনী ও সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া এবং কিছু জলযোগ করিয়া, সতীশচন্দ্র বল্লভপুর হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্ট চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বল্লভপুরের প্রজাবর্গ ক্রমে ক্রমে শুনিতে পাইল যে, ডেপুটী কমিশনার সাহেব তাহাদের জমীদার ক্ষেত্রবাবুকে নন্দনপুর মৌজা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। শুনিয়া সকলে দলে দলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল ও আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল। নন্দনপুরের জমীর কতকাংশ তাহাদিগকে বিলি করিয়া দিবার জন্য অনেকে তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইল। ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে বলিলেন যে, জমী লইলে তাহাদিগকে সেই মৌজায় গৃহ প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে হইবে। তদুত্তরে তাহারা বলিল, তাহাদের কোনও কোনও পুত্র বা ভ্রাতা নন্দনপুরে গিয়া বাস করিবে, আর কেহ বা বল্লভপুরেই থাকিবে। নতুবা তাহাদের শস্য রক্ষিত হইবে কিরূপে? অনেকে জমী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার আশায় নন্দনপুরে গমন করিতে লাগিল ও আপনাদের সুবিধামত ভূমি নির্ব্বাচন করিল।

ক্ষেত্রনাথের পত্রের উত্তরে ডেপুটী কমিশনার সাহেব তাঁহাকে নন্দনপুরের মহুয়া বৃক্ষসমূহের ফুল কুড়াইবার এবং অন্যান্য বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। ক্ষেত্রনাথ লখাই সর্দ্দারের সহিত পরামর্শ করিয়া গ্রামের প্রজাদিগকে বলিলেন যে, তাহারা

নন্দনপুরের মহুয়া ফুল কুড়াইলে, যে যত ফুল আনিবে, তাহাকে তিনি তাহার অর্দ্ধাংশ দিবেন। অনেক দরিদ্র প্রজা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ নন্দনপুরে মহুয়া ফুল কুড়াইতে আরম্ভ করিল। লখাইসর্দ্দার প্রভৃতি তাহাদের উপর তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। প্রত্যহ রাশি রাশি ফুল সংগৃহীত হইয়া ক্ষেত্রনাথের খামার বাড়ীতে বিশুষ্ক হইতে লাগিল। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ক্ষেত্রনাথ আমলকী ও হরিতকীও সংগৃহীত করিলেন। সকল দ্রব্যের ওজন হইলে দেখা গেল, মহুয়া সাত শত মণ, হরিতকী তিনশত মণ ও আমলকী দুইশত মণ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রজারা বলিল, দূরবর্ত্তী বা দুর্গম স্থানের ফুল বা ফল তাহারা কুড়াইতে পারে নাই। নতুবা তাহাদের পরিমাণ আরও অধিক হইত।

গো-মহিষের খাদ্যের জন্য পঞ্চাশ মণ মহুয়া রাখিয়া এবং লখাই সর্দ্দার ও মুনিষদিগকে পঞ্চাশ মণ মহুয়া পুরস্কার দিয়া ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরের হাটে অবশিষ্ট ছয়শত মণ মহুয়া প্রতিমণ বারআনা দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তিনি ৪৫০৲ টাকা পাইলেন। হরিতকী এবং আমলকী বিক্রয় করিয়াও তিনি ৬০০৲ টাকা পাইলেন। সুতরাং কেবল মহুয়া এবং হরিতকী ও আমলকী বিক্রয় করিয়া তিনি ১০৫০৲ টাকা পাইলেন।

ক্ষেত্রনাথের মনে অতিশয় উৎসাহ হইল। তিনি প্রজাবর্গকে বলিলেন, নন্দনপুরে যখন কুসুমফল ও কঁচড়া পাকিবে, তখনও যদি তাহারা উক্ত ফলসমূহের বীজ সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে তাহাদেরও অর্দ্ধেকাংশ দিবেন।

অনেক কুসুমবৃক্ষে লাহা ধরিয়াছিল। তিনি অর্দ্ধেক ভাগ দিতে স্বীকৃত হইয়া প্রজাদের দ্বারা লাহা ভাঙ্গাইতে-লাগিলেন। এইরূপে প্রায় পনর মণ লাহা সংগৃহীত হইল। ক্ষেত্রনাথ ২০্ টাকা দরে লাহা বিক্রয় করিয়া ৩০০্ টাকা পাইলেন।

জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম সপ্তাহে ডেপুটী কমিশনার ক্ষেত্র-নাথকে পুরুলিয়ায় আহ্বান করিলেন। পাট্টা ও কবুলতী সম্পাদিত হইয়া গেল। সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি মহুয়াফুল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না। তদুত্তরে ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে যথাযথ সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। সাহেব তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আমি যে ১৩৫০্ টাকা পাইয়াছি, তাহা নন্দনপুরের উন্নতিসাধনার্থ মৌজুৎ রাখিয়াছি। বল্লভপুর হইতে নন্দনপুর যাইবার জন্য পর্ব্বতের উপর দিয়া ব্যতীত অন্য কোনও সোজা পথ নাই। যে একটী পথ আছে, তদ্দ্বারা নন্দনপুর যাইতে হইলে, বহুদূর অতিক্রম করিতে হয়। আমি একটী

সহজ পথ আবিষ্কার করিয়াছি। আপাততঃ সেই পথ প্রস্তুত করিবার জন্য এই টাকা খরচ করিব।"

সাহেব ক্ষেত্রনাথের অকপটতা ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, আমি আপনার নীতির সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। কোনও স্থানে প্রজাস্থাপন করিতে হইলে, সেই স্থানে গমনাগমনের পথ সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। আপনি যে সহজ পথটি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ইঞ্জিনীয়ার হরিগোপালবাবুকে দেখাইবেন। তিনি আপনাকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ ও পরামর্শ দিবেন।"

বল্লভপুরের কাপাসক্ষেত্রে যে কাপাস উৎপন্ন হইয়াছে, ক্ষেত্রনাথ তাহার নমুনা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সাহেব তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। সতীশচন্দ্রও ইতিপূর্ব্বে তাহা দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় ক্ষেত্রনাথ হরিগোপালবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবগত হইলেন যে, সাহেব তাঁহাকে বল্লভপুর যাইতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং তাঁহার বাটী হইতে ঠিক দক্ষিণদিকে যে একটী সুঁড়িপথ সরলভাবে নন্দাজোড় দুইবার অতিক্রম করিয়া বল্লভপুরের পাকা রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহা প্রস্তুত করিতে কত ব্যয় হইবে, তাহা অবধারণ করিতে বলিয়া-

ছেন। তিনি শীঘ্রই বল্লভপুরে যাইবেন, এবং নন্দনপুরে যাইবার জন্য ক্ষেত্রবাবু যে সহজপথ আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহাও দেখিয়া আসিবেন।

গ্রীষ্মাবকাশর জন্য সুরেন্দ্রনাথের স্কুল বন্ধ হইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ তাহাকে সঙ্গে করিয়া বল্লভপুরে যাইতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্র বলিল যে, তাহার মাসীমাতা (সৌদামিনী) শীঘ্রই পিত্রালয়ে যাইবেন; সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে সেও বল্লভপুরে যাইবে। সৌদামিনীরও সেইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া ক্ষেত্রনাথ সুরেন্দ্রকে সঙ্গে লইলেন না।

নন্দনপুরের জরীপ করা আবশ্যক বুঝিয়া ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রের নির্ব্বাচিত আমীনকে সঙ্গে লইয়া বল্লভপুরে প্রত্যাগত হইলেন, এবং রক্ষকস্বরূপ বন্দুকসহ শিকারী কার্ত্তিক ভূমিজকে ও চারিজন কুলীকে তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আমীনের অবস্থানের জন্য বৈঠকখানার পার্শ্ববর্ত্তী একটী গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া লোকজনসহ নন্দনপুরে যাইতেন এবং মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে বল্লভপুরে প্রত্যাগত হইয়া স্নানাহার করিতেন।

একোনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

ইঞ্জিনীয়ার হরিগোপাল বাবু বল্লভপুরে আসিয়া নন্দা জোড়ের উপর দুইটী সেতু এবং কাছারীবাড়ীর দক্ষিণ দিকের সহজ রাস্তাটি প্রস্তুত করিতে কত টাকা ব্যয় হইবে, তাহা অবধারণ করিলেন। সেতুর গাঁথনীর জন্য প্রস্তর এবং চূণ বল্লভপুরে সুলভ; কেবল লোহার গার্ডার ও বীম ইত্যাদি ক্রয় করিতে হইবে এবং রাজ-মিস্ত্রী ও মজুরের বেতন লাগিবে। রাস্তাটি এবং দুইটী সেতু প্রস্তুত করিতে পাঁচশত টাকা খরচ হইবে, ইহা অবধারিত হইল।

কালী নদীর উপর সেতু প্রস্তুত করিতে যত টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল, তাহা হইতে তিন শত টাকা বাঁচিবার সম্ভাবনা। ডেপুটী কমিশনার সাহেব সেই তিন শত টাকার মধ্যে নন্দার উপরে দুইটী সেতু ও রাস্তাটি প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়াছেন। হরিগোপাল ববু বলিলেন "আরও দুই শত টাকা না হলে, এই কার্য্য সম্পন্ন হ'বে না। কিন্তু এবৎসর আমাদের বজেটে আর অধিক টাকা নাই।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তজ্জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। অপনি সাহেবকে ব'লবেন যে, বাকী দুই শত টাকা আমি দেব। কালী নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ ক'রতে আপনারা লোকজন লাগিয়েছেন; এখানেও লোক

লাগিয়ে দিন। আমি সাহেবের নিকট দুই শত টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

হরিগোপাল বাবু বলিলেন “তা যদি দেন, তা হ’লে বর্ষার আগেই আমি সেতু প্রস্তুত করে দেব।”

বল্লভপুরের দক্ষিণ সীমায় যে স্থানে নন্দার উপর সেতু প্রস্তুত হইবে, সেই স্থানে নন্দা দক্ষিণ-পূর্ব্ববাহিনী হইয়া দুইটী গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র উপত্যকার উত্তরসীমায় যে গিরিশ্রেণী আছে, তাহা বল্লভপুরের পূর্ব্বসীমায় এবং বল্লভপুর ও নন্দনপুরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই গিরিশ্রেণী উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত, কিন্তু দক্ষিণ দিকে নন্দার নিকটে আসিয়া সহসা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। উপত্যকার দক্ষিণ সীমায় যে গিরিশ্রেণী আছে, তাহা দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে প্রলম্বিত; কিন্তু তাহাও উত্তর দিকে নন্দার নিকটে আসিয়া সহসা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। যেন দুই দিক্ হইতে দুইটী পর্ব্বতশ্রেণী আসিয়া এই সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্যোবর্ত্তিনী নন্দার কোথাও শ্রুতিমধুর কুলু কুলু ধ্বনি, আর কোথাও অন্ধকারময় গভীর খাতের মধ্যে তাহার নিপতন-জনিত প্রচণ্ড নিনাদ শ্রবণ করিয়া সহসা স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, যেন তাহারা অনন্ত কাল ধরিয়া তাহার সেই মধুর অথচ ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়াও এখন পর্য্যন্ত অতৃপ্ত রহিয়াছে; এবং

বিস্ময়ে যেন পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছে। এই উপত্যকার উভয় পার্শ্বে দুইটী গিরিশ্রেণীরই প্রান্তভাগ উচ্চ ও দুরারোহ; দুই চারিটী আরণ্য বৃক্ষ ও পার্ব্বত্য বাঁশের ঝাড় ব্যতীত তাহাদের উপর অন্য কোনও উদ্ভিদ্ নাই। কিন্তু নন্দার উভয় তটই নিবিড় শালবনে সমাচ্ছন্ন; সেই শালবনের মধ্যে নন্দা সহসা যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া মনে হয়, এই দুইটী প্রকাণ্ড ও রুক্ষ গিরিশ্রেণীর শীলতাবর্জ্জিত রূঢ় দৃষ্টি হইতে আপনাকে আবৃত করিবার জন্যই নন্দা যেন আপনার অঙ্গের উপর শালবন-রূপ হরিদ্বসন টানিয়া দিয়াছে, এবং গিরিশ্রেণীদ্বয়কে তিরস্কার করিবার ছলেই সহসা যেন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

নন্দার উত্তর তটে বল্লভপুরের গিরিশ্রেণীর পদতলে উপত্যকাভূমির যে অংশ উচ্চ, তাহা অসম হইলেও, কিঞ্চিৎ প্রশস্ত। ক্ষেত্রনাথ এই অংশেই নন্দাতটের ধারে ধারে একটী পথ প্রস্তুত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। উপত্যকাভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধ মাইল ছিল; সুতরাং প্রস্তাবিত পথও দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধ মাইল হইবে। এই পথ প্রস্তুত হইলে, বল্লভপুর হইতে অক্লেশে নন্দনপুরে গমন করিতে পারা যাইবে। ক্ষেত্রনাথ হরিগোপালবাবুকে তাঁহার আবিষ্কৃত এই পথ বা উপত্যকাভূমি দেখাইলেন। হরিগোপালবাবু তাহা দেখিয়া চমৎকৃত

হইলেন, এবং এই পথ প্রস্তুত করিতে কত টাকা খরচ হইবে, তাহা অবধারণ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

দুইদিন পরে হরিগোপালবাবু ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "এই পথ প্রস্তুত ক'র্‌তে আপনার ছয় শত টাকার অধিক খরচ হবে না। কেবল স্থানে স্থানে পাহাড়ের গা সামান্য রকম কেটে ফেল্‌তে হ'বে, আর অসম স্থানগুলিকে সমান ক'র্‌তে হ'বে। তা ছাড়া নন্দার তটের দিকে বড় বড় পাথর একত্র রাশীকৃত ক'রে একটী অনুচ্চ দেওয়ালের মত ক'রে দিতে হ'বে। তা হ'লে গাড়ী, গরু, ঘোড়া,—কার'ও নন্দার গর্ভে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা থাক্‌বে না। আপনি সুন্দর পথ আবিষ্কৃত ক'রেছেন, ক্ষেত্রবাবু। এই পথ দিয়ে বল্লভপুর থেকে নন্দনপুরে তো অনায়াসেই যাওয়া যা'বে ; তা ছাড়া যারা রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে নন্দনপুরে আস্‌বে, তারাও নন্দার প্রথম সেতুটি পার হ'য়েই এই রাস্তা পাবে! এ ভারি সুবিধা হ'য়েছে। মাধবপুরের পেছন দিক্ দিয়েও নন্দা পার হ'য়ে নন্দনপুরে যাওয়া যায় ; কিন্তু সে দিকের পথ কিছু দুর্গম, আর নন্দাও সেখানে বিলক্ষণ প্রশস্ত। সেখানে নন্দার উপরে সেতু নির্ম্মাণ করা আর সে দিক্ দিয়ে রাস্তা প্রস্তুত করাও বহুব্যয়সাপেক্ষ। এই কারণে, আমি আপনার এই পথটির সম্পূর্ণ অনুমোদন ক'র্‌ছি। এখন আপনি লোক লাগিয়ে এটি প্রস্তুত ক'র্‌তে পারেন। আমি ওভারসিয়রকে

ব'লে দেব, তিনি আপনাকে এবিষয়ে সাহায্য কর্‌বেন। আমি এই রাস্তার একটী নক্সা ও এষ্টিমেট* আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি।"

জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যেই নন্দার উপরে দুইটী সেতু প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল। লোহার গার্ডার ও বীম্ আসিয়া পড়িল এবং নির্ম্মাণকার্য্য খরবেগে চলিতে লাগিল। বর্ষার জলে ভূমি সিক্ত না হইলে, পর্ব্বতের গাত্র ও প্রস্তরময় দৃঢ় অসমভূমি খনন করা কঠিন কার্য্য হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া ক্ষেত্রনাথ নন্দনপুর গমনের নূতন পথটি প্রস্তুত করিবার আশায় বর্ষার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

জ্যৈষ্ঠমাসে সৌদামিনীর সহিত সুরেন্দ্র বল্লভপুরে আসিল। বল্লভপুরের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, বিশেষতঃ হাট দেখিয়া, তাহারা উভয়েই বিস্মিত হইল। সুরেন্দ্র অবকাশের সময়টি কেবল এখানে সেখানে বেড়াইয়া, কখনও নন্দার উপরে সেতু-নির্ম্মাণ-প্রণালী দেখিয়া, কখনও লখাইসর্দ্দারের সহিত পাহাড়ে উঠিয়া, কখনও নকুর সহিত ক্রীড়া করিয়া, এবং হাটের দিনে সমস্ত দিন হাটে ঘুরিয়া ফিরিয়া কাটাইয়া ফেলিল। কেবল প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় সে দুই এক ঘণ্টাকাল পড়িত মাত্র।

বলা বাহুল্য, সৌদামিনী তাহার প্রতিশ্রুতিমত নকুর জন্য একটী গাড়ী লইয়া আসিল; কিন্তু তাহা তাহার কাকাবাবুর মত গাড়ী নহে। ছোট তিনটি চাকার উপর

কাষ্ঠের একটী ঘোড়া ছিল। নরু সেই গাড়ী দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল এবং ঘোড়ার পৃষ্ঠে চাপিয়া কাছারী বাটীর সম্মুখের মাঠে প্রত্যহ "ঘোড়-দৌড়" করিতে লাগিল।

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

বর্ষাসমাগমে সকলেই কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ক্ষেত্রনাথ কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত রহিলেন। নগেন্দ্রও হাট-বার ব্যতীত অন্য বারে কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধানে পিতার সহায়তা করিতে লাগিল। বর্ষার সময়ে হাটে দর্শকবৃন্দের সংখ্যা কিছু অল্প হইলেও, দোকানসমূহে ক্রয়-বিক্রয় মন্দীভূত হইল না।

নন্দাজোড়ের উপর দুইটী সেতু প্রস্তুত হইয়া গেল। কাছারীবাড়ীর দক্ষিণ দিকের রাস্তাও প্রস্তুত হইল। নন্দনপুর-গমনের নূতন রাস্তায় জনমজুর নিযুক্ত হইল।

নন্দনপুর হইতে কঁচড়ার (মহুয়া ফলের) আঁঠি সমূহ সংগৃহীত হইয়া স্তূপীকৃত হইল; কুসুম ফলের বীজও সংগৃহীত হইল। যথাসময়ে সেই বীজগুলি চূর্ণীকৃত ও জলে সিদ্ধ হইলে, স্থানীয় এক প্রকার পেষণ-যন্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় হইতে তৈল নিষ্কাশিত হইল। এইরূপে প্রায় পঞ্চাশ মণ কঁচড়া তৈল ও দশ মণ কুসুম তৈল হইল। এই সমস্ত তৈল কলিকাতায় চালান দিয়া ক্ষেত্রনাথ প্রায় ৬০০৲ টাকা পাইলেন। তিনি বল্লভপুরের হাটে প্রায় পাঁচ শত মণ কঁচড়া তৈল ক্রয় করিয়া তাহাও কলিকাতায় চালান দিলেন; তাহা হইতেও প্রায় সহস্র টাকা লাভ হইল।

বর্ষা উপস্থিত হইলে, তিনি নন্দার বাঁধ খুলিয়া দিলেন, নন্দার মুক্ত-জলরাশি কাছারীবাটীর নিকটবর্ত্তী সেতুর অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গ্রামের ধারে ধারে ছুটিতে লাগিল ; পরে দ্বিতীয় সেতুর ভিতর দিয়া উল্লাসে ছুটিতে ছুটিতে দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী সেই সঙ্কীর্ণ উপত্যকার বনাচ্ছন্ন ভূমিতে উপনীত হইল, এবং সেই স্থানে সকলের অলক্ষিতে প্রচণ্ড কলনাদে প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে লম্ফ প্রদান করিতে করিতে কিয়দ্দূরে কালী নদীর জলরাশির সহিত মিলিত হইতে লাগিল।

বর্ষার জল পাইয়া গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত নির্জ্জীব ধরা যেন সজীবতা লাভ করিল। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নব শস্যের অঙ্কুরোদ্গম হইল ; প্রান্তর ও পর্ব্বতগাত্রসমূহ শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত হইল ; বৃক্ষ সকল সরস ও সতেজ হইল ; কদম্ব, কেতকী ও কুটজ পুষ্পসমূহ বিকশিত হইল, এবং ময়ূরের অনবরত কেকারবে চতুর্দ্দিক্ ধ্বনিত হইতে লাগিল। জলদজাল পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে সংলগ্ন হইতে লাগিল, এবং মেঘের গুরুগর্জ্জনে পর্ব্বতের গুহাসকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই সময়ে কৃষকেরা আহার নিদ্রা ও বর্ষার ধারা উপেক্ষা করিয়া কৃষিকার্য্যে একান্ত মনোনিবেশ করিল।

বর্ষার পর শরৎ সমাগত হইল। আকাশ নির্ম্মল হইল। রবিকর আবার প্রখর হইল। পথের কর্দ্দম

বিশুষ্ক হইল। কুশ ও কাশ বিকশিত হইয়া চতুর্দ্দিকে শুভ্র শোভা বিস্তার করিতে লাগিল; বনে বনে অসংখ্য শেফালিকা বৃক্ষ পুষ্পিত হইল; শস্যক্ষেত্রে আশুধান্য পক্ক হইল, এবং হরিণের উপদ্রব হইতে শস্য রক্ষার জন্য গত বৎসরের ন্যায় অদ্ভুত উপায়সমূহ অবলম্বিত হইল। ক্ষেত্রনাথ গত বৎসর অপেক্ষা আরও অধিক ভূমিতে আলুর বীজ বপন করাইলেন এবং প্রজাদিগকেও আলুর চাষ করিবার জন্য সমুচিত উৎসাহ প্রদান করিলেন। তিনি আবার কার্পাস-বীজ বপন করিলেন এবং অনেক প্রজাকেও তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে উক্ত বীজ বপন করাইলেন। মাধবদত্ত মহাশয়ও মাধবপুরে কার্পাসের বীজ বপন করিলেন।

বর্ত্তমান বর্ষে যথাসময়ে সুচারু বৃষ্টিপাত হইতে থাকায়, গত বর্ষের ন্যায় অনাবৃষ্টির জন্য কোনও হাহাকার উঠিল না। হৈমন্তিক ধান্যের অবস্থা অতিশয় আশাপ্রদ হইল এবং সকলেই প্রচুর ফসলের আশায় উৎফুল্ল হইল।

এইবৎসর বল্লভপুরে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে হরিণের উপদ্রব না হইলেও, বন্য হস্তীর ভয়ানক উপদ্রব হইল। বল্লভপুরের উত্তরসীমাবর্ত্তী নিবিড় বনাচ্ছন্ন একটী পর্ব্বতে বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট এক হস্তী ও দুইটী হস্তিনী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। রাত্রিতে দুন্দুভির ভীষণ শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া তাহারা ধান্যক্ষেত্রে অবতরণ করিত না বটে; কিন্তু

দিনের বেলায় পর্ব্বতের পদতলবর্ত্তী ধান্যক্ষেত্রসমূহে নামিয়া প্রভূত ধান্য নষ্ট করিতে লাগিল। একদিন জনৈক কৃষক যুবক পর্ব্বতের সন্নিহিত একটী টাঁড়ে লাঙ্গল দিতেছিল, এমন সময়ে হস্তী ও হস্তিনীদ্বয় পাহাড় হইতে নামিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। হস্তী একটী বলদকে শুণ্ড দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল; তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ গতাসু হইল। অপর বলদটি কোনওরূপে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। কৃষক যুবক হস্তীদিগকে আসিতে দেখিয়াই লাঙ্গল ফেলিয়া কিঞ্চিদ্দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সভয়ে চীৎকার করিতে করিতে এই বীভৎস দৃশ্য দেখিতেছিল। হতভাগ্য যুবক সেই ক্রুদ্ধ হস্তীর নয়নপথে পতিত হইল। অমনই হস্তী ভীম হুঙ্কার করিতে করিতে রুষিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইল। যুবক প্রাণভয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে লাগিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে একটী প্রস্তরের উপর হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া গেল। সে সম্‌লাইয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে সেই কালান্তক তুল্য হস্তী তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে শুণ্ডদ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া একবার আকাশে উঠাইল এবং পরমুহূর্ত্তে তাহাকে সেই প্রস্তরের উপর আছাড়িয়া ফেলিল। বলা বাহুল্য, সেই হতভাগ্য যুবক তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত হস্তী

তাহাতেও যেন সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাকে তাহার ভীষণ পদতলে ফেলিয়া পিষ্ট করিয়া দিল, এবং তাঁহার দেহটি একটী মাংসপিণ্ডে পরিণত করিয়া ফেলিল। নিকটে ও দূরে অনেক কৃষক নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বচক্ষে এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইতে দেখিল। কিন্তু কেহই হস্তীর সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না; সকলেই প্রাণভয়ে পলাইতে লাগিল। হস্তী হতভাগ্য যুবকের মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া অধিকদূরে অগ্রসর হইল না, তাহার নিকটেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আর হস্তিনীদ্বয় ইচ্ছামত ধান্য খাইতে ও নষ্ট করিতে লাগিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এই শোকাবহ দুর্ঘটনার সংবাদ গ্রামের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইল। হতভাগ্য যুবকের বৃদ্ধা জননী ও যুবতী ভার্য্যা শোকে বিহ্বল হইয়া হাহাকার করিতে করিতে উন্মাদিনীর ন্যায় ঘটনাস্থলের দিকে দৌড়িতে লাগিল। গ্রামের লোকেরা বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ধরিয়া না রাখিলে তাহারা শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসে হস্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিশ্চিত প্রাণ হারাইত। তাহাদের আর্ত্তনাদ শুনিয়া কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে সমর্থ হইল না।

এই দুর্ঘটনায় সকলে যেরূপ শোকসন্তপ্ত হইল, তদ্রূপ ভীতও হইল। হস্তীদিগকে তাড়াইতে না পারিলে,

তাহারা সকলের ক্ষেত্রের ধান্য তো নষ্ট করিবেই, অধিকন্তু আরও বহুলোকের প্রাণনাশ করিবে। গ্রামের প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ জমীদারের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কাছারীবাটীতে উপনীত হইল। ক্ষেত্রনাথ, স্ত্রী ও পুত্রদের সহিত, ছাদে উঠিয়া এই লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রজাদের আহ্বানে নীচে নামিয়া আসিলেন। তাহারা সকলেই কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। পরে ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "হাতীর যেরূপ উপদ্রব দেখ্‌ছি তা'তে ঐ দাঁতালো হাতীটাকে মেরে ফেল্‌তে না পার্‌লে আর রক্ষা নাই। কিন্তু আমাদের হাতী মার্‌বার যো নাই; আর আমাদের কাছে হাতীমারা বন্দুকও নাই। আমি মনে কর্‌ছি ডেপুটী কমিশনার সাহেবের নামে একটা পত্র লিখে এখনই অমরকে পুরুলিয়ায় পাঠিয়ে দিই। তিনি হাতীমারা বন্দুক নিয়ে এসে হাতীটাকে মেরে ফেলুন। তা নইলে তো আর কোনও উপায় দেখ্‌ছি না।" উপস্থিত বিপদে এই প্রস্তাব অনেকেরই অনুমোদিত হইলে, অমর তৎক্ষণাৎ পত্র লইয়া পুরুলিয়া যাত্রা করিল।

হস্তী ও হস্তিনীদ্বয় বৈকাল পর্য্যন্ত ধান্যক্ষেত্রের ধান্য দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া পরিশেষে সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থান করিল। গ্রামের সাহসী লোকেরা রাত্রিতে মঞ্চে আরোহণ করিয়া সকল মঞ্চ হইতে

একযোগে ভীষণ ভাবে দুন্দুভি-বাদন করিতে লাগিল। ভোরের সময় পুরুলিয়া হইতে অমরনাথ এবং পুলীশ ইন্সপেক্টার ও দুজন কনেষ্টবল একটা হাতীমারা বন্দুক লইয়া বল্লভপুরে উপস্থিত হইল। সাহেব অসুস্থ থাকায়, তিনি স্বয়ং আসিতে অক্ষমতা জানাইয়া ক্ষেত্রনাথকে পত্র লিখিয়াছিলেন। হস্তীকে না মারিয়া যদি তাড়াইয়া দিতে পারা যায়, তজ্জন্যই তিনি তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে না মারিলে যদি প্রজাদের প্রণরক্ষার উপায় না থাকে, তাহা হইলে অগত্যা তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে নিকটবর্ত্তী পুলীশ ষ্টেশন হইতে এই দুর্ঘটনার তদন্ত করিবার জন্য কতিপয় কনেষ্টবল সহ দারোগা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুলীশইন্সপেক্টর দারোগার সহিত ঘটনাস্থলে গমন করিলেন। হতভাগ্য যুবকের লাস্ তখনও সেখানে পড়িয়া ছিল। কোনও কার্য্যবিশেষে ক্ষেত্রনাথ ব্যস্ত থাকায় তিনি তাঁহাদের সহিত সেখানে যাইতে পারিলেন না। পুলীশের কর্ম্মচারিবর্গ ও গ্রামের বহুলোক ঘটনাস্থলে সমবেত হইয়া লাস্ দেখিতেছিল, এমন সময়ে সহসা পর্ব্বতের দিক্ হইতে হস্তীর ভীষণ হুঙ্কার শ্রুত হইল। হস্তী আসিতেছে, এই আশঙ্কাকারিয়া সকলেই প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে সত্য সত্যই দেখা গেল যে করী ও করিণী-

দ্বয় দ্রুতপদে ঘটনাস্থলাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। হস্তী সেখানে উপস্থিত হইয়াই সেই মাংসপিণ্ডকে শুণ্ডদ্বারা উঠাইয়া আবার সেই প্রস্তরের উপর আছড়াইতে লাগিল, এবং ক্রোধে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পুলীশের কর্ম্মচারিদ্বয় ও কনেষ্টবলেরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাছারীবাটীতে উপনীত হইল। অনেক প্রজাও সেখানে সমবেত হইল। পুলীশ ইন্সপেক্টার কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন "আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, এই হাতীটাকে মেরে না ফেল্‌লে, আপনারা এখানে টিক্‌তে পার্‌বেন না। একে তাড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব; একে মেরে ফেলাই কর্ত্তব্য।" কেহ হাতী মারিতে যাইতে সাহস করিল না। অবশেষে কার্ত্তিকভূমিজ বলিল, সরকার বাহাদুর তাহাকে যদি বিলক্ষণ পুরস্কার দেন, তাহা হইলে, সে আগামী কল্য প্রাতঃকালে তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। ডেপুটী কমিশনার সাহেব একশত টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা বলিয়াছিলেন; তাহা ইন্সপেক্টার সকলকে জানাইয়া দিলেন। পুরস্কারের কথা শ্রবণ করিয়া কার্ত্তিকভূমিজ বলিল "বহুত আচ্ছা, হুজুর; কাল বিহানে হাতীটাকে আমি ঠোর মরাঁই দিব।"* এই বলিয়া সে হাতী-মারা জোড়া-নলী বন্দুকটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিল, এবং টোটাগুলিও দেখিল।

---

* কাল সকালে আমি হাতীটাকে একেবারে মেরে ফেল্‌বো।

হস্তী ও হস্তিনীদ্বয় প্রায় সমস্ত দিন ধান্য খাইয়া ও নষ্ট করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পর্ব্বতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। কার্ত্তিকভূমিজ বন্দুক ও টোটা লইয়া একটী মঞ্চের উপর উঠিয়া রাত্রি যাপন করিল। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া সকল মঞ্চেই দুন্দুভি বাদিত হইল। প্রত্যূষে দুন্দুভি-ধ্বনি নীরব হইবার পূর্ব্বেই, মঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কার্ত্তিক ভূমিজ বন্দুক ও টোটা লইয়া পর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থান করিল। হস্তিগণ যে পার্ব্বত্যপথ ধরিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করে, নির্ভীক কার্ত্তিক সেই পথ ধরিয়াই পর্ব্বতের উপর কিয়দ্দূর আরোহণ করিল। পরে পথপার্শ্বে ঘন শাখাপল্লব-সমন্বিত একটী বড় মহুয়া বৃক্ষ দেখিয়া নিঃশব্দে তাহাতে উঠিয়া একটী বিভক্ত শাখার সন্ধিস্থানে উপবিষ্ট হইল; অশ্বারোহী অশ্বের উপর যেরূপ আরূঢ় হয়, কার্ত্তিক সেই বৃক্ষ-শাখার উপর তদ্রূপ আরূঢ় হইয়া বসিল এবং পশ্চাদ্ভাগের বৃক্ষশাখায় পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিল। প্রভাত হইল এবং আকাশে সূর্য্যদেবও উদিত হইলেন; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত হস্তিগণ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা মস্ মস্ শব্দ সহসা কার্ত্তিকের শ্রুতিগোচর হইল। কার্ত্তিক চাহিয়া দেখিল, প্রকাণ্ডকায় দন্তী হেলিয়া দুলিয়া অগ্রে অগ্রে আসিতেছে এবং তাহার অব্যবহিত পশ্চাতে করিণীদ্বয় আসিতেছে। কার্ত্তিক বন্দুক উঠাইয়া প্রস্তুত রহিল। হস্তী বৃক্ষতলে আসিবা মাত্র কার্ত্তিক

তাহার কণ্ঠ হইতে একটী কর্কশ শব্দ নিঃসৃত করিল। হস্তী চকিতের ন্যায় সহসা গতিরোধ করিয়া বৃক্ষের দিকে ঘাড় ঘুরাইয়া চাহিল। অমনি দুড়ুম্ শব্দে বন্দুকের আওয়াজ হইয়া তাহার মস্তকের দুই কুম্ভের নিম্নে কপালের মধ্যবর্ত্তী স্থলে সংঘাতিক গুলি প্রবিষ্ট হইল। সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় এক ভয়ঙ্কর শব্দ হইল এবং পর মুহূর্ত্তেই হস্তী "কড় গাড়িয়া" ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। হস্তী এরূপ বেগে পতিত হইল যে, তাহার বৃহৎ দন্তদ্বয়ের কিয়দংশ মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়া গেল। হস্তিনীদ্বয় নিমেষমধ্যে ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বিকট আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সহসা গন্তব্য পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং পর্ব্বতের শিখরদেশের দিকে ধাবমান হইল। কার্ত্তিকের বন্দুকের আর একটী নলে টোটা ছিল। সে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হস্তিনীকে লক্ষ্য করিয়া তাহাও ছুড়িল। হস্তিনীর পশ্চাদ্ভাগের বামপদে গুলি লাগিবামাত্র সে ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে একবার বসিয়া পড়িল; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে আবার উঠিয়া অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিল। কার্ত্তিক দেখিল, তাহার সেই পদটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং তাহা হইতে রুধিরধারা ছুটিতেছে।

বৃক্ষের নীচে একটী বৃহৎ শৈলের ন্যায় প্রকাণ্ডদেহ করিবর নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট ভাবে আসীন রহিয়াছে।

কার্ত্তিক বুঝিল, এক গুলিতেই তাহার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তথাপি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল সে বৃক্ষের শাখা হইতে অবতরণ করিতে সাহস করিল না। যখন তাহার কপাল-নিঃসৃত প্রবল রক্তধারা মৃত্তিকা সিক্ত করিয়া শুকাইয়া গেল এবং ক্ষতস্থানে ঝাঁকে ঝাকে মক্ষিকা আসিয়া বসিতে লাগিল, তখন তাহার মৃত্যুসম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনও সংশয় রহিল না। সে বৃক্ষ হইতে নামিয়া একবার তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, পরে লম্ফ দিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। পুনর্ব্বার সেখান হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে নামিয়া বন্দুক ঘাড়ে করিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিল।

দূর হইতে কার্ত্তিক ভূমিজকে বন্দুক ঘাড়ে করিয়া আসিতে দেখিয়া সকলেই হস্তীর বিনাশ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইল। কার্ত্তিক কাছারীবাড়ীতে উপনীত হইয়াই ক্ষেত্রনাথকে এবং ইন্‌স্‌পেক্টার ও দারোগাকে সেলাম করিল। সকলের সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে কার্ত্তিক আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল বৃত্তান্ত বলিল। শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইল।

অনেকে মৃত হস্তীকে দেখিতে যাইবার জন্য উৎসুক হইল; কিন্তু হস্তিনীদ্বয়ের আশঙ্কায় সেখানে যাইতে কাহারও সাহস হইল না। কার্ত্তিক ভূমিজ বলিল তাহারা পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া এতক্ষণ নিশ্চয়ই পলাইয়া গিয়াছে।

সেই সময়ে সোনাবুরু হইতে এক পথিক কাছারীবাড়ীতে উপনীত হইয়া বলিল যে, সে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে দুইটা হস্তিনীর সম্মুখে পড়িয়াছিল ; তাহাদের মধ্যে একটার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও সে অতিকষ্টে চলিতেছে। সেই দুইটা হস্তিনী বল্লভপুরের পাহাড় ত্যাগ করিয়া সোনাবুরু পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল। পথিকের বাক্যে সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া মৃত হস্তী দেখিতে ছুটিল।

ইন্সপেক্টার বাবু কার্ত্তিক ভূমিজকে হস্তী-মারা বন্দুকে আবার টোটা দিতে বলিয়া এবং ক্ষেত্রবাবুর তিনটি বন্দুকও সঙ্গে লইতে উপদেশ দিয়া, ক্ষেত্রবাবু প্রভৃতির সহিত মৃত হস্তী দেখিতে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর হইতে মনে হইতে লাগিল, হস্তী যেন পথের উপর বসিয়া রহিয়াছে ; সুতরাং কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। তাহা দেখিয়া কার্ত্তিক ভূমিজ অগ্রসর হইয়া লম্ফ দিয়া হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিল এবং হস্তীর নিকটে আসিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিল।

ঐরাবতের ন্যায় প্রকাণ্ড হস্তী দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। তাহার প্রত্যেক দন্ত দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন হাত হইল। সকলেই কার্ত্তিক ভূমিজের সাহস ও হাতের "ইস্তমালে"র প্রশংসা করিতেছে, এমন সময়ে পুরুলিয়া হইতে স্বয়ং ডেপুটী কমিশনার সাহেব সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, গতকল্য ইন্সপেক্টারের কোনও

রিপোর্ট না পাইয়া তিনি স্বয়ং বল্লভপুরে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি হাতী-মারার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কার্ত্তিক ভূমিজের প্রশংসা করিলেন এবং তাহাকে এক শত টাকা নগদ ও একটী টোটাদার বন্দুক পুরস্কার দিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। পুলীশ ইন্স্‌-পেক্টারকে তিনি বলিলেন "আপনি এই হস্তীর দন্ত দুইটী ছাড়াইয়া পুরুলিয়াতে লইয়া আসিবেন এবং হস্তীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটাইয়া তৎসমুদয় একটা গর্ত্তের মধ্যে নিক্ষেপ করাইবেন ও তাহাদের উপর পাঁচ সাত মণ লবণ ছিটাইয়া মাটি দিয়া উত্তমরূপে ঢাকাইবেন। নতুবা হস্তীর গলিত মাংসের দুর্গন্ধে এই স্থানের বায়ু দূষিত হইয়া উঠিবে।" ক্ষেত্রবাবুর সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর সাহেব বল্লভপুর ত্যাগ করিয়া ষ্টেশন অভিমুখে গমন করিলেন।

একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

হস্তীর উপদ্রব নিবারিত হইল, সকলে আবার নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। আমীন নন্দনপুরের জরীপ শেষ করিয়া চিঠা প্রস্তুত করিলেন। অনেক প্রজা প্রতি বিঘায় দুই টাকা সেলামি দিয়া উক্ত মৌজার জমা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে লাগিল। তিন বৎসর পরে, তাহারা প্রতি বিঘায় এক টাকা হিসাবে খাজনা দিতে স্বীকৃত হইল। অনেকে জমীর মাটী কাটাইয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহারা উক্ত মৌজায় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিল, ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে তজ্জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, এবং যে প্রণালীতে গৃহ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাও দেখাইয়া দিলেন। প্রজাবর্গ জমীর সন্নিকটে গৃহ প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় নন্দনপুরের স্থানে স্থানে এক একটী মনোহর পল্লীর সৃষ্টি হইল। এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে গমনাগমনের জন্য সুগম পথও প্রস্তুত হইতে লাগিল। নন্দনপুরে যাইবার জন্য সহজ পথ ও নন্দার উপর সেতু প্রস্তুত হওয়ায়, দুরবর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামের প্রজাবর্গও সেখানে আসিয়া গৃহ-বাটী নির্ম্মাণ করিল এবং জমা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে লাগিল। পল্লীতে পল্লীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানও বসিল।

অনেক নিবিড়বনাচ্ছন্ন ভূমির বৃক্ষাদি কর্ত্তিত হওয়ায়, সেই-সমস্ত ভূমি পরিষ্কৃত হইল, এবং তজ্জন্য বন্য পশুর ভয়ও অনেকাংশে তিরোহিত হইল। গোমহিষাদি গৃহপালিত পশুগণ স্বচ্ছন্দে নন্দনপুরের বিস্তৃত তৃণাচ্ছন্ন ভূমিসমূহের উপর বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মৃগপাল ক্রমে ক্রমে সেই বিচরণভূমিসমূহ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

শিকারী কার্ত্তিক ভূমিজ অন্যান্য শিকারীদের সহিত মিলিত হইয়া নন্দনপুরের বনসমূহে কতিপয় ব্যাঘ্র নিহত করিল, এবং প্রজাবর্গকে কিয়ৎপরিমাণে নিরুপদ্রব করিয়া দিল। ক্ষেত্রনাথ তজ্জন্য তাহাদিগকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার প্রদান করিলেন। বন্যপশুবধে তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি প্রচারিত করিয়া দিলেন যে, নন্দনপুরে কেহ একটী বড় ব্যাঘ্র বধ করিলে সাত টাকা, একটী ছোট ব্যাঘ্র বধ করিলে পাঁচ টাকা এবং একটী ভল্লুক বধ করিলে তিন টাকা পুরস্কার পাইবে। কিন্তু তিনি সকলকেই বিনা কারণে মৃগবধ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। একে পুরস্কারের লোভ, তাহার উপর মৃগয়ার আনন্দ। এই উভয়বিধ আকর্ষণে, অনেক শিকারী শিকারের অন্বেষণে নন্দনপুরের বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বন্যপশুগণ তাহাদের নিরুপদ্রব বিহারভূমিতে জনসঞ্চার হইতে দেখিয়া ধীরে

ধীরে তাহা পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইতে লাগিল।

নন্দনপুর প্রকৃতিদেবীর ভীম ও কান্ত সৌন্দর্য্যের আধার। ইহার উত্তরসীমায় নিবিড়বনাচ্ছন্ন উন্নত পর্ব্বত-রাজি। একটী পর্ব্বতের উপর আর একটী পর্ব্বত উঠিয়াছে। তাহার উপর আর একটী উঠিয়াছে—এইরূপ পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত উঠিয়া সর্ব্বোচ্চ শিখর যেন গগন স্পর্শ করিয়াছে; এই সর্ব্বোচ্চশিখরের নাম কালাবুরু। কিন্তু এই নামানুসারেই সমগ্র পর্ব্বতরাজি "কালাবুরুর পাহাড়" নামে অভিহিত হয়। বহুক্রোশ ব্যাপিয়া এই পর্ব্বতরাজি অবস্থিত। এই পর্ব্বতরাজির নিম্নস্তরসমূহে কোল মুণ্ডারী প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতিগণের বাস আছে; কিন্তু উচ্চস্তরসমূহ অতীব দুরারোহ, দুর্গম এবং মহারণ্যে সমাচ্ছাদিত। সেই অরণ্যসমূহে হস্তিযুথ, মৃগযুথ ও বৃহদাকার ভীষণ ব্যাঘ্রসমূহ বাস করে। বহুদূর হইতে এই পর্ব্বতরাজি ও ইহাদের সর্ব্বোচ্চশিখর কালাবুরু ঘনকৃষ্ণ নিবিড় মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। নন্দনপুর হইতে সর্ব্বোচ্চ শিখর প্রায় পনর ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই উচ্চ শিখর হইতে গিরিমালা ক্রমশঃ আনত হইয়া নন্দন-পুরের নিকটে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে এবং একটী শাখা উত্তরদক্ষিণে প্রলম্বিত হইয়া বল্লভপুর ও নন্দনপুরের মধ্য-স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই গিরিশাখা নন্দাতটিনীর

দ্বারা বিভক্ত হইয়া নন্দা অতিক্রম পূর্ব্বক দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে প্রধাবিত হইয়াছে। অপর কতিপয় শাখা বল্লভপুরের উত্তর দিক্ বেষ্টন করিয়া পশ্চিম দিঁকে প্রলম্বিত হইয়াছে; তাহা হইতে আর একটী শাখা বহির্গত হইয়া বল্লভপুরের দক্ষিণ দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অপর গিরি-শ্রেণীর সমান্তরালে ধাবমান হইতেছে। নন্দনপুরের উত্তর সীমায় গিরিরাজি যেস্থানে সহসা সমাপ্ত হইয়াছে সেইস্থানের কিয়দংশ নৈসর্গিক কারণে যেন হঠাৎ বসিয়া গিয়া একটি সুগভীর খাতের সৃষ্টি করিয়াছে। এই খাতের অব্যবহিত উত্তর সীমায় পর্ব্বতের ধূসর-কৃষ্ণ প্রস্তররাজি সুবৃহৎ উচ্চ ভিত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। দেখিয়া মনে হয়, যেন কোনও অতীত যুগে পর্ব্বতের পাদমূল কোনও কারণে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেলে, তাহার বহির্দ্দিকের ভগ্নখণ্ডটি খাতের মধ্যে নিপতিত হইয়াছে। এই খাতটি গভীর জলে পরিপূর্ণ ও প্রায় তিন শত বিঘা স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে কালিঞ্জরের খাত বলে। প্রবাদ এই যে, পূর্ব্বকালে কালিঞ্জর নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্য ছিল। সে কালাবুরু পর্ব্বত-বাসী ইন্দ্রদেবতার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। বহুকাল ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। যুদ্ধের সময় দৈত্যের পদভরে মেদিনী ঘন ঘন বিকম্পিত হইত। এইরূপ বহুকালব্যাপী যুদ্ধের পর, কালাবুরুর দেবতা কালিঞ্জরকে বিনষ্ট করিবার

জন্য তাহার উপর বজ্রবাণ নিক্ষেপ করেন। সেই বজ্রবাণে কালিঞ্জরের প্রাণনাশ হয়; কিন্তু তাহার প্রকাণ্ড দেহ পর্ব্বত-শিখর হইতে নীচে গড়াইয়া পড়িবার সময় পর্ব্বতের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলে। যে স্থানে কালিঞ্জরের প্রকাণ্ড দেহ পতিত হয়, দেহের ভারে সেই স্থানে একটী গভীর খাত হয়। অবশেষে দৈত্য-সৈন্যেরা কালিঞ্জরের মৃতদেহ লইয়া পাতালে প্রবিষ্ট হয়। সেই কারণে প্রবাদ এই যে, কালিঞ্জরের খাত পাতাল-পর্য্যন্ত গভীর। এই কালিঞ্জরের খাত নন্দনপুর মৌজার অন্তর্গত। ভয়ে কেহ ইহার জলে অবতরণ করে না। এই বৃহৎ সরোবরের মধ্যস্থলে ঘনকৃষ্ণ জলরাশি; কিন্তু ইহার চতুর্দ্দিকেই কমল বন; সুতরাং ইহার চতুর্দ্দিক অগভীর। কখনও কখনও আরণ্য হস্তিযূথ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া কালিঞ্জরের জলে অবগাহন পূর্ব্বক জলক্রীড়া করে এবং কমলবন ভগ্ন করে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, কালাবুরু দেবতার বাহন আরণ্য গজসমূহ কালিঞ্জর দৈত্যের সেই পুরাতন শত্রুতা এখনও ভুলিতে না পারিয়া তাহার মৃতদেহের অনুসন্ধানের জন্য সময়ে সময়ে তাহার খাতে অবতীর্ণ হয়।

কালিঞ্জরের খাতের সহিত স্থানীয় লোকের এইরূপ একটী ভীতিজনক কিম্বদন্তী বিজড়িত থাকিলেও, তাহা দেখিতে পরম রমণীয়। তাহার জল স্বাদু ও কাচের

ন্যায় স্বচ্ছ। মরাল, হংস প্রভৃতি বহুবিধ জলচর পক্ষী তাহার জলে বিচরণ করে, এবং তাহাদের চীৎকার দ্বারা এই নির্জ্জন স্থানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য, কচ্ছপ প্রভৃতি জলচর জন্তুসকলও ইহার জলে নির্ব্বিঘ্নে বাস করে। শরৎকালে ইহার জলে যখন কমল-রাশি বিকশিত হয়, তখন ইহাকে "কালিঞ্জরের খাত" না বলিয়া "নন্দন-সরোবর" বলিতে ইচ্ছা হয়। এই সরোবরের পশ্চিম দিকে কতিপয় বনাচ্ছন্ন ও নগ্নদেহ কৃষ্ণ শৈল; দক্ষিণদিকে নিবিড় শালবন ও পূর্ব্বদিকে একটী অনুচ্চ গিরিস্কন্ধ ও তাহার পাদমূলে একটী ক্ষুদ্র খাল বা জোড়; বর্ষাকালে কালিঞ্জর স্ফীত হইয়া উঠিলে, তাহার অতি-রিক্ত জলরাশি সেই খাল দিয়া বহির্গত হইয়া অদূরে কালীনদীর সহিত মিলিত হয়।

নন্দনপুর মৌজার পূর্ব্বসীমায় কালীনদী। কালাবুরু পর্ব্বত হইতে ইহা নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম কালী হইয়া থাকিবে। উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া ইহা দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইতেছে। নদীর বামভাগে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে বনাচ্ছন্ন অবিরল গিরিশ্রেণী এবং পশ্চিম দিকে বনাচ্ছন্ন অনুচ্চ শৈলরাজি। এই শৈলরাজি হইতে ভূমি আনত হইয়া আসিয়া নন্দনপুরের মধ্যভাগে একটী সুবিস্তৃত অধিত্যকা ভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। এই অধিত্যকা ভূমি সুরক্ষিত বৃহৎ শালবৃক্ষে এবং মধুক কুসুম্ভ

প্রভৃতি আরণ্যবৃক্ষে পরিশোভিত হইয়া একটী প্রকাণ্ড কানন বা উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। এই অধিত্যকা ভূমি উত্তরদিকে আনত হইয়া কালিঞ্জরের ধারে মিলিত হইয়াছে এবং দক্ষিণ দিকে আনত হইয়া নন্দার তটভূমির সহিত মিলিত হইয়াছে। নন্দার অপর পারে অর্থাৎ দক্ষিণ-ভাগে অনুচ্চ বনাচ্ছন্ন শৈলমালা ; সেই অনুচ্চ শৈলমালার তলদেশে প্রবাহিত হইয়া নন্দা কিয়দ্দূরে কালী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

নন্দনপুরের পশ্চিম সীমায় বল্লভপুরের গিরিমালা। সেই গিরিমালার পদতলে একটী ক্ষুদ্র জোড় গিরিগাত্র হইতে বর্ষার জল বহন করিয়া নন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র জোড়ের উপরেও ক্ষেত্রনাথ একটী প্রস্তরময় সেতু প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

নন্দনপুরের অধিত্যকাভূমি মৃৎ-প্রস্তরময় ; কিন্তু তাহার দুই পার্শ্বে যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডদ্বয় আনত হইয়া এক-দিকে কালিঞ্জর ও অপর দিকে নন্দার অভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে, তাহা অতিশয় উর্ব্বর। এই অধিত্যকা হইতেও উভয় দিকে কতিপয় ক্ষুদ্র খাল যথাক্রমে নন্দা ও কালিঞ্জরের সহিত মিলিত হইয়াছে। অধিত্যকাভূমি হইতে নন্দনপুরের চারিদিকের শোভা মনোহারিণী। কিন্তু বল্লভপুরের গিরিমালার শিখরদেশ হইতে নন্দন-পুর একটী সুবৃহৎ চিত্রপটের ন্যায় চক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত

হয়। সেই স্থান হইতে চক্ষু ইহার বিচিত্র ও রমণীয় দৃশ্যাবলী, এবং ভীম ও কান্ত সৌন্দর্য্যরাশি একেবারে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, এবং মন বিস্ময়মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে সিক্ত হইতে থাকে।

এই প্রদেশের প্রজাবর্গ প্রায় সহস্র বিঘা ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া তাহাদের মনোরম পল্লীসমূহে বাস করিতে লাগিল। আমীন ভৈরবচন্দ্র মিত্রের উপর সুব্যবস্থামত প্রজাস্থাপনের ভার অর্পিত হইল। তিনি একটী পল্লীর নিকটে অধিত্যকার উপর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং সেই স্থানে বাস করিয়া সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

সতীশচন্দ্রের পরামর্শক্রমে,নন্দনপুরের অধিত্যকাভূমির পূর্ব্ব প্রান্তে ও কালী নদীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী একটী উচ্চ শৈলের উপরে, ক্ষেত্রনাথ কাছারী-বাটী নির্ম্মাণ করিবার অভিপ্রায় করিলেন। সেই স্থান হইতে মৌজার প্রায় সমগ্র স্থল দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। গৃহনির্ম্মাণের উপযুক্ত প্রস্তররাশি এই স্থানে সুলভ দেখিয়া তিনি সেই প্রস্তরেই গৃহের ভিত্তি গাঁথাইবার সঙ্কল্প করিলেন। নিকটে কালী-নদীর সমীপবর্ত্তিনী এবং অদূরে নন্দার তটবর্ত্তিনী ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা দেখিয়া, খাস দখলে রাখিবার জন্য তিনি ছয়শত বিঘা ভূমি নির্ব্বাচন করিলেন। এই ভূমি বনাকীর্ণ ছিল না। সুতরাং তাহাতে যে অনায়াসে শস্যক্ষেত্র-সমূহ প্রস্তুত হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

দ্বি-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

আশ্বিন মাসে পূজাবকাশের সময় রজনীবাবু বল্লভপুরে আগমন করিলেন। তাঁহার পুত্র নিশিকান্ত এবং যতীন্দ্র, চারু প্রভৃতি আরও কতিপয় যুবক তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিলেন। সকলেই বল্লভপুরের শরৎকালীন রমণীয় শোভা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। একবৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে বল্লভপুরের শ্রী একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া রজনীবাবুর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। বল্লভপুরের হাট একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার বলিয়া তাঁহার মনে হইল। নন্দার উপর দুই সেতু এবং তাহাদের উপর দিয়া যে সরল পথ প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বল্লভপুরের শ্রী যে শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন।

রজনীবাবু ব'লিলেন "ক্ষেত্রবাবু, জমীদার ও বড় লোকের কথা ছেড়ে দিন, বড় বড় সম্রাটেরও প্রমোদ-উদ্যানের যে শোভা, আপনার এই বল্লভপুরের তার চেয়ে অধিক শোভা। প্রমোদ-উদ্যানে কেহ একটী কৃত্রিম খাল কেটে তার উপর একটী সেতু নির্ম্মাণ করেন; কোথাও মাটী একটু উঁচু আর কোথাও মাটী একটু নীচু ক'রে উন্নতানত ভূমির অনুকরণ করেন; কোথাও কতকগুলি পাথর একত্র সাজিয়ে রেখে শৈল দেখার সাধ

মেটান; কোথাও কতকগুলি বৃক্ষ একত্র রোপণ ক'রে কুঞ্জবনের সৃষ্টি করেন; কোথাও একটী ফোয়ারা বসিয়ে নির্ঝরের অনুকরণ করেন; আর কোথাও বা দুই একটী বন্য পশু পিঞ্জরের মধ্যে আটক ক'রে, কিম্বা দুই দশটি পাখী খাঁচার মধ্যে ধ'রে রেখে বন্য পশুপক্ষী দেখার আমোদ অনুভব করেন। এইরূপ একটী প্রমোদ-উদ্যান প্রস্তুত করতে তাঁদের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যায়। কিন্তু আপনার এই প্রমোদ-উদ্যানের সহিত কি সেই-সব প্রমোদ-উদ্যানের তুলনা হয়? তাঁদের প্রমোদ-উদ্যান সামান্য মালীতে প্রস্তুত করে; আর স্বয়ং প্রকৃতিদেবী আপনার জন্য এই প্রমোদ-উদ্যানের রচনা করেছেন! তিনি এখানে কেমন উন্নতানত ভূমির সৃষ্টি করেছেন; চারিদিকে কেমন পাহাড় সাজিয়ে রেখেছেন; পাহাড়ের গাত্র শ্যামল বন দিয়ে কেমন ঢেকে রেখেছেন; আপনার সমতল ক্ষেত্রে কেমন কানন, উপবন ও কুঞ্জবনের রচনা করেছেন; গিরিনন্দিনী নন্দা কুলুকুলু তানে কেমন অনবরত প্রবাহিত হ'য়ে যাচ্ছে; তার উপরে ঐ দুইটী প্রস্তর-সেতু কেমন রমণীয় হয়েছে! কি সুন্দর, কি অপূর্ব্ব, কি চমৎকার! আপনার অরণ্যসমূহে ও গিরিকন্দরে কত বন্যপশু, বাঘ, ভালুক, হরিণ, খরগোশ, বন্যবরাহ, হস্তী—আর ঐ বন ও উপবনসমূহে কত মধুরকণ্ঠ পক্ষী মুক্তভাবে ও স্বচ্ছন্দে বিহার করছে! অরণ্যে, পর্ব্বতে

ও প্রান্তরে কত বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের সমাবেশ হয়েছে! প্রকৃতিদেবীর উদ্যানে কত সুরভি কুসুম নিত্য প্রস্ফুটিত হচ্ছে! এমন প্রমোদ-উদ্যান কার আছে? পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটেরও নাই। এরূপ একটী প্রমোদ-উদ্যান প্রস্তুত করতে খর্ব্ব-নিখর্ব্ব পদ্ম-মহাপদ্ম টাকারও অধিক টাকা খরচ হ'য়ে যায়, অথচ এমনটি হয় না! তাই বল্‌ছি, ক্ষেত্রবাবু, আপনি সম্রাট্; অথবা সম্রাটের চেয়েও অধিক।"

রজনীবাবুর ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ বিস্ময়ের সহিত প্রচুর আমোদ ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক বস্তুর সৌন্দর্য্য ও অভিনবত্ব রজনীবাবুর হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়া তাঁহার ভাবুকতাকে জাগাইয়া তুলিতেছিল। ক্ষেত্রনাথ বুঝিলেন, রজনীবাবু যে-চক্ষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দরসে নিমগ্ন হইতেছেন, সেই চক্ষেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পারিলে, তবে তাহার যথার্থ রসাস্বাদ হয়। তিনি রজনীবাবুর বাক্যের কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া কেবল ঈষৎ হাস্য করিলেন। নিশিকান্ত, যতীন্দ্র ও চারু এই প্রদেশে বসতি করিয়া ক্ষেত্রনাথের ন্যায় কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সম্মত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, বল্লভপুরে বিলি করিবার মত আর জমী নাই। তবে নন্দনপুরে বহু জমী আছে; সেই জমী তিনি

বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন। তাঁহারা নন্দনপুর দেখিতে যাইবার অভিপ্রায় করিলে, ক্ষেত্রনাথ পরদিন প্রাতঃকালে সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া নন্দনপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সকলেই পদব্রজে চলিলেন। বন্দুক লইয়া লখাই সর্দ্দার ও কার্ত্তিক ভূমিজ সঙ্গে সঙ্গে চলিল। নন্দনপুর যাইবার নূতন পথের পার্শ্বে উপত্যকা-মধ্যবর্ত্তী শালবনের অভ্যন্তরে নন্দার অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়া ও কুলুকুলুধ্বনি শ্রবণ করিয়া একটী নবাগত যুবক বিস্ময়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

যুবকটি কবিত্বভাবাপন্ন; নাম অতুলচন্দ্র ঘোষ। তিনি সেই বৎসর বি, এ, পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া এম-এ পড়িতেছিলেন। নন্দাতটের পার্শ্বে তাঁহাকে একাকী দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। অতুল-চন্দ্র বলিলেন "আপনারা চলুন, আমি যাচ্ছি; এখানকার যা সৌন্দর্য্য, তা জগতে দুর্লভ। এই সৌন্দর্য্য আমায় একটু উপভোগ কর্‌তে দিন।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "সৌন্দর্য্য উপভোগ করুন, তায় কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু আপনি একলা থাক্‌লে, হয়ত কোনও বন্য জন্তু এসে আপনার উপভোগে বাধা দেবে।"

বন্যজন্তুর কথা শুনিয়া যুবকের কবিত্ব-প্রস্রবণ সহসা

বিশুষ্ক হইল। তিনি দ্রুতপদে তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন "বলেন কি মশাই! বন্য জন্তু! কি রকম বন্যজন্তু?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "কি রকম বন্য জন্তু? এই—বাঘ ভালুক বন্যশূকর—এই-সব আর কি!"

যুবকের মুখমণ্ডল বিশুষ্ক হইল। যাইতে যাইতে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন "দেখ্‌ছি, এই জগতের মধ্যে কোথাও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগের স্থান বা অবসর নাই! সবুজ ও সুকোমল ঘাস দেখে যদি তার উপর বস্‌তে যাই, অমনি সাপ ও বিছার কথা মনে হয়। রাত্রিকালে তারকাখচিত নীল নভোমণ্ডল দেখ্‌বার জন্য যদি ছাদে গিয়ে বসি, অমনি হিম লেগে সর্দ্দি হয়। গোলাপ ফুলটি তুল্‌তে গেলে হাতে কাঁটা ফুটে। আজ একটী নধর শিশুকে দেখে যদি আনন্দিত হই, দেখি যে কাল তার অসুখ! এই আপনার এখানে এসে ঐ ছোট নদীটি দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছি, আর অমনি আপনি বন্য জন্তুর ভয় দেখালেন! এখন যাই কোথায়, দেখি কি, আর করি কি, বলুন দেখি? তবে কি জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও আনন্দ নাই?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। এই জগৎ সেই আনন্দময়েরই বিকাশ। কিন্তু তিনি স্বয়ং নির্দ্বন্দ্ব; এই কারণে মনে হয় কেবল

একমাত্র তিনিই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ কর্‌তে সমর্থ হন। আর আমরাও যদি নির্দ্বন্দ্ব হ'তে পারি, তা হ'লে আমরাও সেই আনন্দ উপভোগের যোগ্য হ'তে পারি।"

অতুলচন্দ্র বলিলেন "আপনার কথা ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "ধরুন, এই নন্দার শোভা দেখে আপনি আনন্দিত হচ্ছিলেন ; কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে বন্যজন্তুরও ভয় এসে পড়্‌লো। সুতরাং এই স্থানে যেমন আনন্দ আছে, তেমনই ভয়ও আছে। এরই নাম হ'ল দ্বন্দ্ব। যদি ভয়ের কারণ তিরোহিত হয়, তা হ'লে আর দ্বন্দ্ব থাকে না ; থাকে কেবল একটি জিনিষ—তার নাম হচ্ছে আনন্দ। এই দেশের এমন সুন্দর শোভা, এমন উর্ব্বর মাটী যে, এখানে বাস কর্‌লে মানুষের খুব সুখ ও আনন্দ হ'তে পারে ; কিন্তু এদেশে বন্যজন্তুর ভয়ানক উপদ্রব। কাজেই লোকে এদেশে বাস করার সুখ ও আনন্দ উপভোগ কর্‌তে পারে না। আমরা বন্য জন্তু-গুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে, নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় উপনীত হ'তে চেষ্টা কর্‌ছি। বাঘ-ভালুকের ভয় না থাক্‌লে, আপনি এই মনোহর দেশের সৌন্দর্য্য দেখ্‌বার আনন্দ ভোগ কর্‌তে পার্‌বেন। এদেশে আমি প্রথম এসে যেমন একদিকে জীবনযাত্রার সুবিধা দেখ্‌লাম, তেমনই অসুবিধাও দেখ্‌তে পেলাম। অসুবিধাগুলিকে দূর করে আমি

নির্দ্বন্দ্বে উপনীত হবার চেষ্টা কর্‌ছি। বাহ্য জগতের যে নিয়ম, মনোজগতেরও তাই। মনের বাঘ-ভালুক-গুলিকে তাড়াতে পার্‌লে, আমরা বিমল আনন্দ উপভোগ কর্‌তে সমর্থ হই। অধ্যাত্ম-জগতেরও এই নিয়ম, তা শুনেছি। সে জগৎটি আমার কাছে তত পরিচিত নয় ব'লে, আমি তার সম্বন্ধে বেশী কিছু বল্‌তে পার্‌বো না। কিন্তু সব জগৎ যে একই নিয়মে বাঁধা, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। যথার্থ আনন্দকে লক্ষ্য রেখে, আমরা তা লাভ কর্‌বার জন্য যা-কিছু করি, সবই সেই আনন্দময়কে লাভ করবারই উপায়; এজগতে, এইরূপ কোনও কাজই নিকৃষ্ট নয়। সম্মুখে ঐ যে কুলী মাটী কেটে পথ সুগম ক'রে আমাদের গমনের সুবিধা ক'রে দিচ্ছে, সেও এইরূপ মহৎ কাজেই নিযুক্ত। যে কাজে নিজের সুখ, সুবিধা ও মঙ্গল হয় এবং অপর দশজনেরও সুখ, সুবিধা ও মঙ্গল হয়, সেইরূপ কাজ মাত্রই মহৎ, এবং আনন্দময়কে লাভ কর্‌বার একটী উপায়। আমি তো এই ভাবে প্রণোদিত হ'য়েই কাজ কর্‌বার চেষ্টা করি।"

রজনীবাবু ক্ষেত্রনাথের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং নিশিকান্ত, যতীন্দ্র ও চারুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তোমরা ক্ষেত্রবাবুর কথাগুলি মন দিয়ে শুন্‌লে আর বুঝ্‌লে? এদেশে সুখ ও সুবিধালাভের আশায়

তোমরা এসে বাস কর্‌তে চাও ; কিন্তু তা লাভ কর্‌বার আগে অনেক প্রকার দুঃখ ও অসুবিধার মধ্যে পড়তে হ'বে। সেই দুঃখ ও অসুবিধা-সকলকে জয় কর্‌তে না পার্‌লে, তোমাদের সুখ ও সুবিধা হবে না। নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় তোমাদের উপনীত হ'তে হবে। ক্ষেত্রবাবু যে ভাবে প্রণোদিত হ'য়ে কাজ ক'রে সুখ ও আনন্দলাভে অনেকটা কৃতকার্য্য হয়েছেন, তোমরাও যদি সেই ভাবের সাধনা কর্‌তে পার, তা হ'লে তোমাদেরও চেষ্টা সফল হবে ; নতুবা তোমরা কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না ; কেবল পণ্ডশ্রম ও অর্থনাশ হবে মাত্র। তোমরা বেশ করে নিজের নিজের মন বুঝে দেখ। ক্ষেত্রবাবু তোমাদের সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রয়েছেন। এঁর দৃষ্টান্তের যদি অনুসরণ কর্‌তে পার, তা হ'লে তোমাদের চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হবে। ক্ষেত্র-বাবু এক কথায় চমৎকার উপদেশ দিয়েছেন—'সকল কাজেই নির্দ্বন্দ্ব হবার চেষ্টা কর।' এই উপদেশটি সকলেরই পক্ষে অমূল্য।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা নন্দনপুরে উপনীত হইলেন। নন্দনপুরের স্তরবিন্যস্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত, পুলকিত ও চমৎকৃত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহাদিগকে অধিত্যকার উপরে লইয়া গিয়া সেখান হইতে বিশালকায় গগন-

স্পর্শিনী গিরিমালা ও শুভ্র জলদজালবিজড়িত কালাবুরু পর্ব্বত-শিখর, গিরিমালার পদতলে কুমুদ-কহ্লার-শোভিত প্রকাণ্ড কালিঞ্জর হ্রদ, চারিদিকের গিরিশ্রেণী, তৃণাচ্ছাদিত বিশাল প্রান্তর, বনাচ্ছন্ন শৈলমালা, অরণ্য, বন, কানন উপবন, উপত্যকা, অধিত্যকা, পার্ব্বতীয় নদী এবং নবস্থাপিত প্রজাপল্লী প্রভৃতি দেখাইলেন। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া রজনীবাবু ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, সতীশ সেবার যথার্থই বলেছিল, নন্দনপুর যেন স্বর্গের নন্দন-কানন। বল্লভপুরের সৌন্দর্য্য দেখে কাল আমি বলেছিলাম, আপনি সম্রাটের চেয়েও শ্রেষ্ঠ; কিন্তু এই নন্দনকানন-তুল্য নন্দনপুর দেখে, আমি বল্‌ছি—আপনি ইন্দ্র, অথবা মহেন্দ্র! আমি জীবনে কখনও কোথাও এরূপ স্থান দেখি নাই। এর সঙ্গে আপনার বল্লভপুরের তুলনাই হয় না। পদ্মফুল ও সুঁদি-ফুলের মধ্যে যে প্রভেদ, ময়ূর ও দাঁড়কাকের মধ্যে যে প্রভেদ,—নন্দনপুর ও বল্লভপুরের মধ্যেও সেই প্রভেদ! কার সঙ্গে কার তুলনা! আহা, ভগবান্ কত স্থানে যে কত সৌন্দর্য্য ও কত অপূর্ব্ব দৃশ্য সঞ্চিত ক'রে রেখেছেন, তা মানুষের স্বপ্নেরও অগোচর। হত-ভাগা মানুষ এই-সব স্থান ছেড়ে সহরে বাস করে কেন? তা হ'লে যে অনায়াসে সে ভগবানকে জান্‌তে পারে, আর শোকদুঃখের তাপ থেকে মুক্তিলাভ

কর্‌তে পারে। আজ এই নন্দনপুরে এসে আমি ধন্য হলাম ও আমার জীবন সার্থক হ'ল! ভগবান্—ভগবান্—কি অপূর্ব্ব লীলা তোমার! আর কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যই তোমার! আহা, এই স্থানটিকে বাসযোগ্য ও কৃষিযোগ্য ক'রে আপনি যে কি মহৎ পুণ্যের অধিকারী হচ্ছেন, তা আমি একমুখে বল্‌তে পারি না! ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন ও আপনি দীর্ঘজীবী হউন। পৃথিবীর পাপময় কোলাহল থেকে ভগবান্ এই স্থানটিকে যেন আড়াল ক'রে রেখে, এর মধ্যে স্তরে স্তরে সৌন্দর্য্যরাশি সাজিয়ে রেখেছেন! ক্ষেত্রবাবু, আমি বার্দ্ধক্যসীমায় উপনীত হয়েছি; কিন্তু এই স্থানটি দেখে আমারই হৃদয়ে যৌবনের বল ও উৎসাহ ফিরে আস্‌ছে। আপনি আমাকে এখানে একটু স্থান দেবেন; আমি এখানে একটী কুটীর বেঁধে আপনার এই মহৎ কার্য্যে আপনাকে সাধ্যমত সহায়তা কর্‌বো।"

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলিলেন "আমি এই মৌজায় সামান্য অংশমাত্র প্রজাগণকে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছি। অবশিষ্ট সমস্ত স্থানই প'ড়ে আছে। যে স্থান আপনি নির্ব্বাচন কর্‌বেন, তাহাই পাবেন। আপনাদের ন্যায় প্রতিবাসী পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা?"

অতুলচন্দ্র দেখিয়া শুনিয়া বিস্ময়ে ও ভাবাবেশে অনেকক্ষণ নির্ব্বাক্ ছিলেন। পরে ক্ষেত্রবাবুকে বলি-

লেন "মশায়, আমরা যে কবিত্বের সেবা করি, সে কবিত্বে প্রাণ নাই। আপনার যে কার্য্য, তাহাই প্রকৃত কবিত্ব, এবং আপনার কবিত্বই যথার্থ প্রাণময়। বিদ্যা-শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে একটা চাকরী কিম্বা ওকালতী কর্‌বো মনে করেছিলাম, কিন্তু আজ থেকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌লাম। এ বৎসর এম্, এ, পরীক্ষা দিয়ে, আমিও এই নন্দনপুরে এসে বাস করবো, আর আপনার ন্যায় কৃষিকাজ কর্‌বো। আজ আমার জীবনে যেন একটা নূতন আলোকের ছটা এসে পড়েছে! ধন্য আপনি আর ধন্য আপনার কার্য্য! আজ থেকে আপনি আমা-দের গুরু হলেন। নিজ হাতে লাঙ্গল ধর্‌তেও আমার আর লজ্জা নাই। আপনি কোন্ জমী আমাকে দেবেন, তা আজই আমাকে দেখিয়ে দিন্। আমি তা চিহ্নিত ক'রে যাব। আর কৃষিকাজ করতে কত টাকা মূলধন আবশ্যক, তাও আমাকে ব'লে দিন। আমি এম্-এ পরীক্ষা দিয়েই এখানে চ'লে আস্‌বো, আর এই স্থানে বাস কর্‌বো। আমি যেন ঐ কালাবুরুর শিখর আর আপনার ঐ কালিঞ্জর হ্রদ দেখ্‌তে দেখ্‌তে শেষে প্রাণ-ত্যাগ কর্‌তে পারি। তা হ'লেই আমার জীবনধারণ করা সার্থক হবে।"

ক্ষেত্রনাথ তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং সকলকে কৃষিযোগ্য ভূমিসমূহ দেখাইতে লাগিলেন।

তিনি তাঁহাদিগকে অধিত্যকার উপরে বাসযোগ্য ভূমিও দেখাইলেন। সকলেই তাহা দেখিয়া তাহার অনুমোদন করিলেন। ক্ষেত্রবাবুর প্রস্তাবিত নূতন কাছারীবাটীর নিকটে রজনীবাবু নিজের জন্য একটী কুটীর নির্ম্মাণের অভিপ্রায় জানাইলেন।

এইরূপে নন্দনপুর পরিদর্শন করিয়া মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে সকলে বল্লভপুরে উপনীত হইলেন।

ত্রি-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার সময় বল্লভপুরের কাছারীবাটীর বারাণ্ডায় বসিয়া সকলে গল্প করিতেছিলেন। শুক্লা ত্রয়োদশীর চন্দ্র শুভ্র জ্যোৎস্নাজাল বিকীর্ণ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী প্রাকৃতিক দৃশ্যনিচয়ের উপর একটি অপার্থিব শোভার সঞ্চার করিতেছিলেন। অদূরে কতিপয় শেফালিকা বৃক্ষের প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি হইতে সুমধুর গন্ধ আসিয়া সকলের চিত্ত প্রফুল্ল করিতেছিল, এমন সময়ে রজনীবাবু ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"ক্ষেত্রবাবু, আজ সমস্ত দিন আমি আপনার 'নির্দ্বন্দ্ব-ভাবের সাধনা'র কথা চিন্তা কর্‌ছিলাম। আমার মনে হচ্ছে, আপনার কথাটি অমূল্য। যতই ভাব্‌ছি, ততই আমার মনে বড় আনন্দ হচ্ছে। নির্দ্বন্দ্ব হবার জন্য অনেকে সংসার ত্যাগ ক'রে বনে যেতে চান। ভগবান্‌কে লাভ কর্‌বার পথে সংসারের কোলাহল যে একটী ভয়ানক অন্তরায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ভগবান্ যদি সংসার-ছাড়া হ'ন, আর সংসারে বাস ক'রে তাঁকে পাওয়া না যায়, তা হ'লে তিনি এই সংসারটি সৃষ্টি কর্‌লেন কেন? সেই আনন্দময়কে লাভ করাই যদি মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে যেখানে থাক্‌লে, আমরা তাঁকে পাব না,

সেখানে আমাদের ফেলে রাখা কি তাঁর উচিত হয়েছে? কেহ সংসারের নিন্দা করলে, আমার মনে হয়, তিনি যেন ভগবানের চেয়ে বেশী জ্ঞানী, আর ভগবান যেন এই সংসারটি সৃষ্টি ক'রে একটা ভয়ানক নির্ব্বোধের মত কাজ করেছেন! শুধু তাই নয়, তিনি যেন একজন মস্ত ঠক্, কেননা তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক সকলকে ভ্রান্তির মধ্যে ডুবিয়ে রেখে ব'সে ব'সে কেবল মজা দেখ্‌ছেন! বলা বাহুল্য যে, পরমেশ্বরের এইরূপ চিত্র কখনই সত্য নয়, এবং কখনই সত্য হতেও পারে না। তাঁর অনন্ত জ্ঞানের পরীক্ষা করতে পারে এমন কে আছে? তিনিই এই সংসার সৃষ্টি ক'রে, তার মধ্যে আমাদিগকে রেখে দিয়েছেন। এর ভিতর কি তাঁর কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য নাই? অবশ্যই আছে। আমার মনে হয়, সেই উদ্দেশ্যটী হচ্ছে, আপনার ঐ নির্দ্বন্দ্ব ভাবের সাধনা। জীবমাত্রই স্বভাবতঃ আনন্দের অন্বেষণ করে, কেননা ভগবান্ স্বয়ং আনন্দময়, আর এই সংসারটি তাঁর আনন্দ হতেই স্ফুরিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত আনন্দ খুঁজে নেবার জন্য তিনি কৌশলক্রমে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আমরা চাই সুখ, কিন্তু সুখের পাশেই তিনি দুঃখ দিয়েছেন। দুঃখটিকে জয় না করতে পারলে আমরা কিছুতেই দুঃখবর্জ্জিত খাঁটি সুখ লাভ বা আস্বাদন করতে পারি না। যে সুখের নিত্য সহচর দুঃখ, তাহা সুখই নহে,

তাহা দুঃখের নামান্তর মত্রে। দুঃখাতীত যে সুখ, তাহাই প্রকৃত সুখবাচ্য। কিন্তু তাহা লাভ কর্‌তে হ'লে সুখজড়িত দুঃখ, আর দুঃখজড়িত সুখ এই উভয়ের, অর্থাৎ এই দ্বন্দের অতীত হতে হবে। এরই নাম হচ্ছে, আপনার 'নির্দ্বন্দ্ব ভাবের সাধনা।' আমরা আমাদের জীবনের সামান্য সামান্য কার্য্যে ও ব্যাপারে যদি নির্দ্বন্দ্ব ভাবের সাধনা কর্‌তে পারি, তা হ'লে সেই সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে আমরা একদিন সেই পূর্ণানন্দকেও লাভ কর্‌তে সমর্থ হব। এই কারণে, আমাদের সংসার আর সাংসারিক ব্যাপার উপেক্ষার বস্তু নয়। সংসার শিক্ষার ও সাধনার স্থল, এইখানে আমরা যদি নির্দ্বন্দ্ব ভাবের সাধনা ক'রে ছোট ছোট পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হ'তে পারি, তা হ'লে বড় পরীক্ষাতেও সমুত্তীর্ণ হ'তে পার্‌বো। সেই পূর্ণানন্দকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রেখে যিনি সাংসারিক ব্যাপারে সফলতা লাভ করেন ও জীবন-সংগ্রামে জয়ী হ'ন, আমার মনে হয়, তিনিই যথার্থ সাধক ও ভক্ত। আমিও আপনাকে সেই সাধক ও ভক্ত-দলের মধ্যেই ফেলেছি।"

ক্ষেত্রনাথ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "আপনি আমায় কি বল্‌ছেন? শুনে আমার বড় লজ্জা হচ্ছে। আমার মত ঘোর সংসারী আর কেউ নাই। আমি বাল্যকাল থেকে এই কঠোর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছি। কেমন

ক'রে সংসার প্রতিপালন কর্‌বো, কি উপায়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গকে পোষণ কর্‌বো, অহরহঃ আমার কেবল সেই চিন্তা। আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভগবানের নাম-নেবারও সময় পাই না। দিন রাত কেবল কাজ আর কাজ। আমি একএকবার ভাবি, ভগবান এতগুলি জীবের পালন-ভার আমার উপর অর্পণ করেছেন, তাদের জন্য আমি যদি না খাটি, তা হ'লে আমার কর্ত্তব্য করা হবে না। সেইজন্য সর্ব্বদা কেবল কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকি। ভগবান্‌কে লাভ কর্‌বার জন্য কখনও আমি সাধনা করি নাই; সাধনা করবার ইচ্ছা থাক্‌লেও, আমি সাধনার সময় পাই না।"

রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন "আপনার কথা শুনে দেবর্ষি নারদের সেই গল্পটি আমার মনে পড়ছে। গল্পটি নূতন নয়, পুরাতন; অনেকেই তা শুনেছেন, আপনিও শুনে থাক্‌বেন। কিন্তু তথাপি প্রসঙ্গক্রমে এইখানে তার উল্লেখ না ক'রে থাক্‌তে পারছি না। সকলেই জানেন, দেবর্ষির মত ভগবদ্ভক্ত কেউ ছিলেন না। তিনি সকল কাজ পরিত্যাগ ক'রে তাঁর বীণাযন্ত্রটি নিয়ে দিনরাত কেবল ভগবানের নাম কীর্ত্তন কর্‌তেন। নাম-কীর্ত্তনে যে কি আনন্দ, তা তিনিই বুঝেছিলেন। এমন সাধনা কেউ কখনও করেন নাই। সেই সাধনার ফলে তিনি ভগবানের দর্শন পেলেন ও তাঁর প্রিয়পাত্র হলেন। কিন্তু

অত্যুন্নত আধ্যাত্মিক জগতেও জীবের শত্রু আছে। অভিমান, গর্ব্ব, অহঙ্কার এইগুলি জীবের পরম শত্রু। নারদ মনে করলেন, বুঝি তাঁর মত ভগবানের ভক্ত আর কেউ নাই। সর্ব্বান্তর্যামী নারায়ণ তা জানতে পারলেন। একদিন নারদ নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলেন 'প্রভু, আপনার শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে?' নারায়ণ হেসে বললেন 'অমুক গ্রামের অমুক লোক আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।' ভগবানের এই শ্রেষ্ঠ ভক্তটিকে দেখবার জন্য নারদের বড় কৌতূহল হ'ল। তিনি সেই গ্রামে উপস্থিত হ'য়ে জানলেন যে, সে লোকটি একজন সামান্য কৃষক মাত্র। নারদ কৃষকের বাড়ী গিয়ে দেখলেন, কৃষক তার ক্ষেতে লাঙ্গল নিয়ে গেছে। কৃষকপত্নী মুনিকে দেখে পরম যত্নে তাঁর সৎকার করলেন। যথাসময়ে কৃষক লাঙ্গল নিয়ে বাড়ী এল; এসে তার গরুগুলিকে খেতে দিলে; তার পর মুনিকে দেখে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে তাঁর যথোচিত সৎকার করা হয়েছে কি না, তা জিজ্ঞাসা করলে। মুনি বললেন যে, তাঁর সৎকারের কোনও ত্রুটি হয় নাই। তখন কৃষক বাড়ীর ভেতরে গিয়ে দেখলে যে, তার একটি ছেলের অসুখ হ'য়েছে। তখনি সে ছুটে গিয়ে কবিরাজ ডেকে এনে তার ঔষধের ব্যবস্থা করলে। তার পর সে হাত-পা ধুয়ে, তেল মেখে স্নান করে এল, আর তার স্ত্রী সামান্য যা রেঁধেছিল, তাই খেলে! কৃষক তারপর আবার গৃহ-

কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ল। গরুগুলিকে সে আর একবার ঘাস খড় খেতে দিয়ে কোদালি নিয়ে আবার ক্ষেতে কাজ করতে গেল। সেখান থেকে সন্ধ্যার পর বাড়ী এসে আবার গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ল। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাজ-কর্ম্ম ক'রে এবং অতিথির সম্যক সৎকার ক'রে ও তাঁর অনুমতি নিয়ে সে শয়ন করতে গেল। কৃষক অতি প্রত্যুষে উঠেই লাঙ্গল নিয়ে আবার জমী চষ্‌তে গেল। এই-সব দেখে নারদ ভাবতে লাগ্‌লেন 'এই কৃষকটি ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত কিরূপে হ'ল ? সে তো সমস্ত দিন সংসারের কাজ নিয়েই ব্যস্ত; কখনও তো একবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে ভগবানের নাম গ্রহণ করে না; আর আমি সমগ্র জীবন ভগবানের নাম কীর্ত্তন ক'রেও তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত হ'তে পারলাম না! জানি না, লীলাময় ভগবানের কিরূপ বিচার।' এইরূপ ভাবতে ভাবতে নারদ সেখান থেকে চ'লে গেলেন। কিয়দ্দূর গিয়ে তাঁর মনে হ'ল, সে লোকটি ভগবানের নাম করে কি না, আর করলে কখন করে, তা তো তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই! সে কথাটা তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। এই ভেবে, তিনি মধ্যাহ্নের সময় আবার সেই কৃষকের বাড়ীতে ফিরে এলেন। কৃষক তাঁকে দেখে আহ্লাদিত হ'ল ও তাঁর সৎকার করবার জন্য ব্যস্ত হ'ল। নারদ বললেন 'বাপু, তুমি থাম; আমার সংকারের জন্য

ব্যস্ত হয়ো না; আমি আজ আর তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ কর্‌ব না। আমি কেবল একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌তে এলাম;—তুমি তো সমস্ত দিন কাজকর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত থাক, তা দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি ভগবানের নাম কর কখন?' কৃষক হেসে বল্‌লে 'ঠাকুর, ভগবান্ এত কাজের ভার আমার উপর দিয়েছেন যে, আমি সমস্ত দিন তাঁর কাজেই ব্যস্ত থাকি; তাঁর নাম কর্‌বার জন্য একটুও সময় পাই না। সর্ব্বদা তিনি ও তাঁর কাজ মনের মধ্যে জাগরূক থাকে।' কৃষকের কথা শুনে নারদের চৈতন্য হ'ল। তিনি ভাব্‌লেন, কৃষক সত্য সত্যই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। সে আপনাকে প্রভুর দাস মনে ক'রে সর্ব্বদাই তাঁর কাজ কর্‌ছে। তার নিজের কাজ কিছুই নাই, সবই প্রভুর কাজ! যার প্রাণ এমন প্রভুময়, যে সর্ব্বদাই প্রভুকে মনের মধ্যে দেখ্‌তে পাচ্ছে, যে প্রভুর কাজেই দিন রাত ব্যস্ত, যার আমিত্বের কোনও জ্ঞান নাই, ও প্রভুই সব, এবং প্রভুর কাজে ব্যস্ত থেকে প্রভুর নাম কর্‌বারও যার সময় হয় না, সে প্রভুর শ্রেষ্ঠ ভক্ত হবে না তো কে হবে? নারদ এইরূপ চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে সেই স্থান হ'তে চলে গেলেন।

"ক্ষেত্রবাবু, নারদের এই গল্পটি শুন্‌লেন তো? আমরা যদি জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে পারি,

আর সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মকেই ভগবানের কাজ, ব'লে মনে কর্‌তে পারি, তা হ'লে নির্জ্জনে ব'সে ভগবানের নাম নিতে না পার্‌লেও আমরা তাঁর ভক্ত। সংসারটি মায়ার ক্ষেত্র নয়; এই সংসারেই ধর্ম্মের উচ্চসাধনা হয়। ভেবে দেখুন, আমাদের কত কাজ রয়েছে। সবই কি আমরা পালন কর্‌তে পারি? কিন্তু সাধ্যানুসারে যিনি যত কর্ত্তব্য পালন করতে পারেন, তিনিই আমাদের মধ্যে তত শ্রেষ্ঠ। আত্মোন্নতি সাধন করে, অপর দশজনের উন্নতিসাধনের জন্য আমাদের চেষ্টা কর্‌তে হবে। দেখুন এই প্রদেশের—কেবল এই প্রদেশের কেন ?—আমাদের সমগ্র দেশের লোক কত অজ্ঞ। এদের মধ্যে জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ করা শিক্ষিত লোকের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। লোকসেবাই ভগবানের সেবা; দশজনের মঙ্গলের মধ্যেই আত্মমঙ্গল নিহিত আছে। যেখানে দুঃখ ও দারিদ্র্য আছে, সেখানে আমরা যদি সুখ ও স্বচ্ছন্দতা আন্‌তে পারি; যেখানে অজ্ঞানান্ধকার ঘনীভূত, সেখানে যদি একটী জ্ঞানের প্রদীপ জ্বাল্‌তে পারি; যেখানে এক গাছি তৃণ জন্মে, সেখানে যদি দুই গাছি তৃণ জন্মাতে পারি, তা হ'লেই আমাদের জন্মগ্রহণ ও জীবনধারণ করা অনেকটা সার্থক হয়। নতুবা কতকগুলি টাকা উপার্জ্জন ক'রে যদি নিজেরই সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও সুবিধা দেখি, আর কারও মুখপানে না চাই,—আত্মোন্নতি-সাধনেই যদি

আমাদের সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়, তা হ'লে পশু ও আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট প্রভেদ কি ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আপনার আদর্শ উচ্চ ও মহান্। এই আদর্শ সম্মুখে রেখে আমাদের সকলেরই যে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার এই উচ্চ আদর্শ মনের মধ্যে সম্যক্ উপলব্ধি কর্‌তে পারি।"

চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে ক্ষেত্রবাবুর সহিত আবার নন্দনপুরে গিয়া সকলে কৃষিযোগ্য ভূমি সকল পুনর্ব্বার পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। সমস্ত দেখা শেষ হইলে, রজনীবাবু ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, আমার ছেলে নিশি আর যতীন্দ্র, চারু ও কতিপয় ভদ্রলোক এই প্রদেশে যৌথ কৃষি ও যৌথ-কারবার কর্‌বার অভিপ্রায়ে একটী কোম্পানী বা সমবায় সংগঠন ক'রেছেন। সতীশের উপদেশেই এই সমবায় সংগঠিত হ'য়েছে। এক এক জনের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে কৃষি বা ব্যবসায় করা কিছু কঠিন; কিন্তু আপনার ও সতীশের উপদেশক্রমে সকলে যদি মিলে মিশে কাজ করে, আর সেই কাজ যদি সুপরিচালিত হয়, তা হ'লে অনায়াসে কৃষিকাজ ও ব্যবসা চ'ল্‌তে পারে। নিশি, যতীন, চারু প্রভৃতি সকলেই অনভিজ্ঞ ও অল্পবয়স্ক। এরা একলা একলা কোনও কাজ ক'র্‌তে পার্‌বে না। এই জন্য সমবায় বা কোম্পানী হ'য়েছে। সমবায়ের মূলধন ২৮০০০৲ টাকা অবধারিত হ'য়েছে। আপাততঃ সকলে মিলে ৭০০০ টাকা দেবে; তার পর যেমন যেমন টাকার আবশ্যক হ'বে, তেমনি টাকা দেবে। উপস্থিত আমরা নন্দনপুরে আপনার কাছে সাত শত বিঘা জমী বন্দোবস্ত ক'রে নেব, আর এইস্থানেই এদের জন্য একটী

বাটী প্রস্তুত করবো। বাটীতে এরা থাক্‌বে, আর তারই একটী কামরা আপিস ঘরে পরিণত হ'বে। সর্ব্বপ্রথমে জমীকেই কৃষিযোগ্য করা আবশ্যক। আমরা এই অধিত্যকার দক্ষিণ দিকে নন্দাতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী চকে সাত শত বিঘা জমী চাই। আপনি তা নির্ব্বাচন ক'রে দিন, আর সেই জমীকে কৃষিযোগ্য ক'র্‌তে কত টাকা খরচ হ'বে, তা অবধারণ করুন।" ক্ষেত্রনাথ যৌথকৃষির কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন এক চকেই সাত বিঘা জমী লওয়া কর্ত্তব্য। তা হ'লে আপনারা বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী অবলম্বন ক'রে অল্পখরচে ও অল্প পরিশ্রমে তা'তে বহু শস্য উৎপন্ন ক'র্‌তে পারিবেন। সতীশ সেদিন ষ্টীমে পরিচালিত লাঙ্গলের কথা ব'ল্‌ছিল। সেই লাঙ্গল চালাতে হ'লে বিস্তৃত সমতল ভূমির আবশ্যক। অধিত্যকার ঐ দক্ষিণ-ভাগে নন্দাতট পর্য্যন্ত যে ভূমিখণ্ড আপনারা নির্ব্বাচন ক'রেছেন, তা সেই উদ্দেশ্যের জন্য সুন্দর হ'বে। এই ভূমিকে সমতল ও কৃষিযোগ্য করতে আনুমানিক দুই হাজার টাকা খরচ হ'বে। আর এঁদের থাক্‌বার জন্য একটী বাটী প্রস্তুত ক'র্‌তে হ'লে, তিন হাজার টাকার বেশী খরচ হ'বে না। বাটীখানি পাথরের প্রস্তুত করতে হ'বে ; কেননা পাথর এখানে সুলভ। কালীনদী ও নন্দাতে বালির অভাব নাই। চূণও এখানে সুলভ।

কেবল তীর-বরগা-দরজা-জানলার জন্য কাঠ চাই। সে কাঠও এদেশে সুলভ।”

রজনীবাবু বলিলেন “এই নির্ব্বাচিত ভূমির উপরিভাগে ঠিক্ মধ্যস্থলে অধিত্যকার উপর বাটীনির্ম্মাণ করা উচিত। আমরা তজ্জন্য এই চক্‌টি পছন্দ ক'র্‌ছি। এই স্থানটী বড় চমৎকার। এখানে কেমন বড় বড় সুন্দর গাছ র'য়েছে। এর পরিমাণ আনুমানিক পঞ্চাশ বিঘা হ'বে। এত বড় স্থান লওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, এদের থাক্‌বার বাটী ব্যতীত, শস্য রাখ্‌বার জন্য খামারবাটী, গো-মহিষের জন্য গোয়ালঘর, চাকরবাকরদের থাক্‌বার ঘর—এই সমস্ত প্রস্তুত ক'র্‌তে হ'বে। তা ছাড়া কোম্পানীর কোনও কোনও সভ্য সপরিবারে এখানে বাস ক'র্‌তে চাইলে, তাঁদের জন্যও স্বতন্ত্র বাটীনির্ম্মাণের আবশ্যকতা। সে সমস্ত বাটী কোম্পানী প্রস্তুত ক'রে দেবে না। যে সভ্য সেরূপ বাটী প্রস্তুত ক'র্‌তে চান, তিনি তা নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত ক'রে নেবেন। কিন্তু তাঁকে তো বাটী নির্ম্মাণের জন্য স্থান দিতে হ'বে? সভ্যগণের মধ্যে অন্ততঃ দশজন কখনও কখনও এখানে এসে সপরিবারে বাস ক'র্‌বেন, এইরূপ অনুমান হয়। তাঁদের বাটীগুলি পাশাপাশি থাক্‌লেই সুবিধা হ'বে। প্রত্যেকের বাটীর জন্য অন্ততঃ দুইবিঘা পরিমিত স্থান চাই। অবশিষ্ট ভূমিতে আফিস্-

ঘর, খামার-বাড়ী প্রভৃতি থাকবে। আপনি কি বলেন ?”

ক্ষেত্রনাথ কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন “আপনার ব্যবস্থা অতিশয় সুন্দর। আপনি যে এমন সুব্যবস্থা ক'র্‌তে পারেন, তা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি।”

রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন “আরে, মশাই, না, না; এ ব্যবস্থা আমার নয়। এই সমস্ত ব্যবস্থাই সতীশের। আমরা পুরুলিয়ায় নেমে সতীশের বাসায় তিনদিন ছিলাম। সেই সময়ে সে নন্দনপুরের নক্সা এঁকে, কোন্ খানে জমী নিতে হ'বে, কোন্ খানে বাড়ী-ঘর প্রস্তুত ক'র্‌তে হ'বে, সব আমাদের ব'লে দিয়েছিল। এমন কি, সে বাড়ীর একটী মোটামুটী নক্সাও প্রস্তুত ক'রে দিয়েছে। সে সাহস না দিলে কি আমরা কখনও এই সব কাজে এগুতে পারি ?”

ক্ষেত্রনাথ তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন “এই নন্দনপুরে আমার যে কাছারীবাটী হ'বে, সতীশ তারও নক্সা প্রস্তুত ক'রে দিয়ে গিয়েছে।”

রজনীবাবু বলিলেন “বেশ কথা মনে ক'রে দিয়েছেন, মশাই। ঐ পাহাড়ের উপর যেখানে আপনার কাছারীবাড়ী হ'বে, আপনি সেখানে আমাকে পাঁচ বিঘা জমী বন্দোবস্ত ক'রে দিতে ভুল্‌বেন না। আমি আপনার কাছারী-বাড়ার পাশেই একটী ছোট কুঁড়েঘর

বেঁধে মাঝে মাঝে সেখানে এসে থাকৃব। এদের এই কোম্পানীর আমি কোনও সভ্য নই, তা মনে রাখ্‌বেন। আমি মাঝে মাঝে এখানে এসে দুই এক মাস থাকৃব মাত্র।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "আমি ঐ পাহাড়ের উপর আপনার জন্য স্থান নিশ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট করে রাখ্‌ব।"

অতুলচন্দ্র কোম্পানীর সভ্য ছিলেন না। তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া পার্ব্বতীয় দেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন মাত্র। গতকল্য নন্দনপুরে আসিয়া তাঁহারও কৃষিকার্য্য করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি স্বতন্ত্রভাবেই কৃষিকার্য্য করিবেন। কিন্তু এখন কোম্পানীর কার্য্য প্রণালী ও ব্যবস্থার বিষয় অবগত হইয়া, তিনিও কোম্পানীর সহিত যোগদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। অতুলচন্দ্র রজনীবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মশাই, চোদ্দটি সভ্য নিয়ে আপনারা এই কোম্পানী গঠিত কর্‌ছেন; কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমাকেও গ্রহণ করুন। কোম্পানীর মূলধন ২৮০০০৲ টাকা না ক'রে ৩০০০০৲ টাকা ক'রে ফেলুন। মশায়, আমায় ফেলে যাবেন না। এক যাত্রার যেন পৃথক ফল না হয়।" রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন "বেশ তো; তার জন্য ভাবনা কি? আপনাকেও একজন সভ্য ক'রে নেওয়া যাবে। আর আপনি যখন নন্দনপুরে এসে বাস কর্‌তে চান, তখন তো আমরা আপনাকে এক-

জন 'সকর্ম্মক' সভ্য ব'লে গণ্য কর্‌তে পার্‌ব। 'অকর্ম্মক' সভ্য অপেক্ষা 'সকর্ম্মক' সভ্যের সংখ্যা অধিকতর হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

সভ্য শব্দের "সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক" বিশেষণ শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। অতুলচন্দ্র বলিলেন "কিন্তু, মশায়, আমি সকর্ম্মক সভ্য হ'লেও, আপনাদের এই প্রস্তাবিত ব্যারেকে বাটী প্রস্তুত কর্‌ব না। আমি ঐ পাহাড়ের উপর ক্ষেত্রবাবুর প্রস্তাবিত কাছারী-বাটীর উত্তরদিকে একটী স্থান দেখে এসেছি; সেই স্থানে আমি বাটী প্রস্তুত কর্‌তে চাই—তা আগেই আপনাকে ব'লে রাখ্‌ছি। ঘরের মধ্যে ব'সে বা শুয়ে আমি যেন কালাবুরু আর কালীঞ্জর দেখ্‌তে পাই।"

রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, তার জন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই।"

অতুলচন্দ্র বলিলেন "মশায় এসব বিষয়ে আমার কোনও চিন্তা নাই, তা বুঝ্‌লাম। কিন্তু একটা বিষয়ে চিন্তা থাক্‌ছে! আমাদের যে কোম্পানী গঠিত হচ্ছে, তা'তে কি আমরা ক্ষেত্রবাবুকে একজন সভ্য ও প্রধান পরিচালকরূপে পাবার আশা কর্‌তে পারি না? কাল ওঁকে আমি গুরুর পদে বরণ করেছি; আর এই জীবন-সংগ্রাম-ব্যাপারে ইনিই আমাদের যথার্থ গুরু ও নেতা হবার যোগ্য। ক্ষেত্রবাবুর মতন লোক যদি আমাদিগকে

পরিচালনা করেন, তা হ'লে আমি সকর্ম্মক সভ্য হ'তে পারব ; নতুবা ঠিক্ অকর্ম্মক হ'য়ে যাব।"

রঞ্জনীবাবু হাসিয়া বলিলেন "আপনি ঠিক্ কথাই বলছেন। ক্ষেত্রবাবুকে সভ্য ও পরিচালকরূপে পেলে তো কোম্পানীর কার্য্যের সফলতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না, কিন্তু আমরা সাহস ক'রে এঁর কাছে সে প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারি নাই। ইনি নিজের নানা কাজে ব্যস্ত—"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "কোম্পানীর মধ্যে আমাকে লওয়া যদি আপনাদের অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে আমাকেও নেবেন। আমিও আপনাদের মধ্যে থাকলাম।"

রঞ্জনীবাবু আনন্দিত হইয়া বলিলেন "বস্! আর কোনও চিন্তা নাই। ক্ষেত্রবাবু যখন সকলের পরিচালক ও অভিভাবক হ'তে সম্মত হলেন, তখন কোম্পানীর উন্নতি অবশ্যম্ভাবিনী। ক্ষেত্রবাবু, সাত শত বিঘা নয়— আপনি কোম্পানীকে আট শত বিঘা জমি বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন, আর ঘর বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য আপাততঃ পঞ্চাশ বিঘা জমী হ'লেই যথেষ্ট হবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সকলে বল্লভপুরে প্রত্যাগত হইলেন। সেই দিন সন্ধ্যার পর রঞ্জনীবাবু প্রভৃতি পুরুলিয়া যাত্রা করিলেন।

কোম্পানীর নাম "নন্দনপুর কৃষি ও বাণিজ্য সমবায়" হইবে, তাহা স্থির হইয়া গেল।

পঞ্চ-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে সমবায় সংগঠিত ও দলীল রেজেষ্টরী হইয়া গেল। নিশিকান্ত ও যতীন্দ্র কলিকাতা হইতে টাকা লইয়া নন্দনপুরে আসিল।

ক্ষেত্রনাথ ইতিপূর্ব্বেই নন্দনপুরের কাছারী-বাটী নির্ম্মাণের জন্য পাথর কাটাইতে লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি আরও অধিক লোক নিযুক্ত করিয়া পাথর কাটাইতে লাগিলেন। চূনের পাথর পোড়াইয়া তিনি প্রচুর চূনও সংগ্রহ করিলেন। বহু বৃহৎ শালকাষ্ঠও সংগৃহীত হইল। ক্ষেত্রনাথ তাহা হইতে দরজা, জানালা প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। নিশি ও যতীন্দ্র সেই-সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল।

নন্দনপুরে আমীনের বাটীর নিকটে একটী সুবৃহৎ তৃণাচ্ছাদিত গৃহ প্রস্তুত হইল। তাহাতে গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী মাল-মশলা ও কাষ্ঠ ইত্যাদি রক্ষিত হইতে লাগিল। নিশি ও যতীন্দ্র দিনের বেলায় সেই গৃহে থাকিয়া সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিত। পুরুলিয়া হইতে তাহারা একটী পাচক ব্রাহ্মণ আনিয়াছিল। নন্দনপুরে আহারাদি সমাপন করিয়া বন্য জন্তুর ভয়ে তাহারা রাত্রিতে বল্লভপুরে চলিয়া আসিত।

সতীশচন্দ্রের প্রস্তুত নক্সা অনুসারে গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্য

আরম্ভ হইল। ক্ষেত্রনাথ শুভদিনে গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। একসঙ্গে কাছারী-বাটী ও কোম্পানীর কার্য্যালয় নির্ম্মিত হইতে লাগিল। কৃষিক্ষেত্রের মাটী কাটিবার জন্যও বহু লোক নিযুক্ত হইল।

বড়দিনের ছুটীর সময়ে সতীশচন্দ্র সৌদামিনীকে লইয়া বল্লভপুরে আসিলেন। তিনি ক্ষেত্রনাথের সহিত নন্দনপুরের সকল স্থান দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে কাছারী-বাটী ও কার্য্যালয়ের ভিত্তি উঠিয়া গিয়াছে দেখিয়া তাঁহার মনে বিস্ময় জন্মিল। ছাদের জন্য টালির অভাব দেখিয়া সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "টালির জন্য তোমার ভাবনা কি? ভগবান্ এখানে অনেক টালি প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছেন। তুমি কি তোমার শ্লেটের পাহাড় দেখ নাই?"

ক্ষেত্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন "কই না! শ্লেটের পাহাড় কোথায়?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "তুমি তো চমৎকার লোক দেখ্‌চি! কালীঞ্জরের পশ্চিমদিকে ঐ যে দুটো কাল পাহাড় পিরামিডের মতন উঁচু হ'য়ে উঠেছে, ঐ দুইটী পাহাড়ই শ্লেটের পাহাড়। এমন স্তরে স্তরে শ্লেট সাজানো আছে যে, তা দেখলে তুমি চমৎকৃত হবে। এখান থেকে পাহাড় দুইটী প্রায় দেড় মাইল দূরে রয়েছে; ওখানে যেতে হলে ঐ নিবিড় বনটা পার হ'তে হয়। সুতরাং

একলা ওখানে যাওয়া নিরাপদ নয়। আমি শ্লেট আনিয়ে তোমায় এখনি দেখাচ্ছি।” এই বলিয়া তিনি লখাই সর্দার ও আর একটী ভৃত্যকে বন্দুক সহ সেখানে গিয়া একখানি চৌড়া শ্লেট পাথর কুড়াইয়া আনিতে আদেশ করিলেন।

ভৃত্যেরা শ্লেট আনিতে গমন করিলে সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন “তুমি বুঝি এখনও এই মৌজার সকল স্থানে ঘুরে বেড়াবার অবসর পাও নাই? তুমি এক কাজ কর। একটা পাহাড়ীয়া টাট্টু পোষ ও ঘোড়ায় চড়্‌তে শেখ। তোমার হাটে ভাল ভাল টাট্টুর আম্‌দানী হয়। একটা ভাল টাট্টু কিনে তার উপরে চ’ড়ে লোকজন সঙ্গে নিয়ে মৌজার সকল স্থান ভাল ক’রে দেখে বেড়াও। তা না হলে তুমি এত বড় মৌজা শাসন কর্‌বে কিরূপে? তুমি সব স্থান দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, এই মৌজায় কত মূল্যবান্ বস্তু সঞ্চিত আছে। ঐ শ্লেটের পাহাড় দুটীর সমস্ত শ্লেট দশপুরুষেও বার হবে কি না সন্দেহ। ঐ শ্লেট বেচেই তুমি ও তোমার বংশধরেরা লক্ষ লক্ষ টাকা পাবে। কল্‌কাতা অঞ্চলে টালির জন্য ভাল শ্লেট আম্‌দানী হয় না; সেইজন্য লোকে শ্লেটের ছাদ করে না। তুমি কল্‌কাতায় শ্লেটের নমুনা পাঠিয়ে দাও; দেখ্‌তে পাবে, সাহেবেরা শ্লেট দেখেই পছন্দ কর্‌বেন। শ্লেটের ছাদ দেখ্‌তে চমৎকার, আর বেশ মজবুত। রজনীদাদার জন্য এখানে যে বাঙ্গলা প্রস্তুত হবে, আমি সেই বাঙ্গলাটি

শ্লেট দিয়ে ছাওয়াবো মনে করেছি। আর তোমাদের সদুঠাকুরুণের জন্যও এই নন্দনপুরে একখানা বাড়ী প্রস্তুত করতে হবে। তাতেও আমি শ্লেট লাগাব। শিমলা-পাহাড়ে, দেরাদুনে, মুশৌরী পাহাড়ে আমি শ্লেটের ছাদের অনেক বাড়ী দেখেছি। ঐ শ্লেটের পাহাড় ছাড়া তোমার এই মৌজাতে অভ্রের খনিও আছে। দশ ইঞ্চি এক ফুট লম্বা আর প্রায় ছয় ইঞ্চি চৌড়া অভ্র আমি এখানে দেখেছি। লাল, সবুজ, সাদা, হল্‌দে সব রকমের অভ্র আছে। অভ্র যে কত মূল্যবান্ বস্তু, তা তুমি জান। তোমার মৌজাতে তামারও খনি যদি বা'র হয়, তাতে তুমি বিস্মিত হয়ো না। আমি তারও চিহ্ন দেখেছি। আর ঐ যে কালাবুরু পাহাড়টি দেখ্‌ছ, ঐ পাহাড়টি রত্নের আকর। আমি গত অক্টোবর মাসে ঐ পাহাড়ে উঠে-ছিলাম। সেখানে সোনার খনি আছে, হীরার খনি আছে, আর কত কি যে আছে, তা ভগবানই জানেন। সেখানে এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছের অরণ্য আছে যে, তা দেখলে বিস্মিত হবে। অবশ্য সমতল ভূমিতে যে-সকল অরণ্য ছিল, সে-সকল কাটা হয়েছে। এখন যে অরণ্যগুলি আছে, সেগুলি দুর্গম স্থানে অবস্থিত। আমার মনে হয় যেন সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে সেই অরণ্যসমূহের গাছে আজ পর্য্যন্ত কুড়ুলের ঘা পড়ে নাই। এক একটা শালের গুঁড়ি ত্রিশ চল্লিশ হাত লম্বা, আর গুঁড়ির বেড়ও

পাঁচ ছয় হাত হবে। তোমার নন্দনপুর থেকে দশ বার ক্রোশ দূরে এই কালীনদীর ধারেই একটা পাহাড়ের উপর প্রায় এক হাজার বিঘা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছের বন আছে। সেই পাহাড়ের মালিক একজন মুণ্ডা। সে সেই পাহাড়টি দশ বার বছরের জন্য ইজারা দিতে চায়। ইজারার সেলামীও সে বেশী চায় না। দুই হাজার টাকা পেলেই সে পাহাড়টি বন্দোবস্ত করে দিতে প্রস্তুত আছে। তোমাদের কৃষি ও বাণিজ্য সমবায় যদি সেই অরণ্যটি ইজারা নেয়, তা হলে তোমরা বড় লোক হয়ে যাবে। পাহাড়ে গাছ কেটে, আর সেইখানেই তা ফেড়ে চিরে বর্ষার সময় মাড় বেঁধে সমস্ত কাঠ কালীনদীতে ভাসিয়ে অনায়াসে নন্দনপুরে নিয়ে আস্‌তে পার্‌বে। তা কর্‌লে বহানী খরচ তোমাদের সামান্য মাত্র হবে। আমি ফাল্গুন মাসে আবার ঐ অঞ্চল পরিদর্শন কর্‌তে যাব। তুমি যদি সেই সময় আমার সঙ্গে সেখানে যাও, তা হলে নিজের চোখে সব দেখ্‌তে পাবে। বড়লোক হবার সুবিধা এদেশে যেমন আছে, এমন আর কোনও দেশে নাই। সেই পাহাড়ে এঞ্জিন বসিয়ে কলের করাতে গাছ ফাড়তে হবে; তা হলে তোমাদের খরচ অনেক কম হবে। তোমাদের 'সকর্ম্মক' অংশীদারদের মধ্যে দুই তিনজনকে সেই পাহাড়ে রাখ্‌তে হ'বে; তাদের একটু সাহসী হওয়া আবশ্যক।... হাঁ ভাল কথা মনে হয়েছে। যতীন আর

নিশি রোজ সন্ধ্যার সময় বল্লভপুরে যায় কেন? এত লোক নন্দনপুরে ঘর বেঁধে রয়েছে; কেউ বাঘের মুঁখে পড়ে না, আর তারাই পড়বে? এত ভীরু হ'লে কি তারা কাজ কর্‌তে পার্‌বে? তাদের বন্দুক ছুড়্‌তে ও শিকার কর্‌তে শেখাও। তা হ'লে সাহস হবে। আর তোমার নগিনকেও নন্দনপুরের সব স্থান দেখাও। তোমার নগিন বেশ শিকারী হয়েছে। শুন্‌লাম, সেদিন নাকি সে একটা চিতা বাঘ মেরেছে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময়ে লথাই সর্দ্দার এক খণ্ড শ্লেট্ বহন করিয়া আনিল। ক্ষেত্রনাথ শ্লেট্ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। সতীশচন্দ্র বলিলেন "এই শ্লেট্ খানা প্রায় দুই ইঞ্চি পুরু। এর মধ্যে কত স্তর রয়েছে, দেখ। এক একটী স্তর ছাড়ালে এক একটী গোটা শ্লেট্ পাবে। এই শ্লেট্ কত শক্ত দেখেছ? ছাদের টালির জন্য এত পুরু শ্লেটের প্রয়োজন নাই। সিকি ইঞ্চি পুরু টালি হলেই যথেষ্ট হ'বে। টালির কোনও নির্দ্দিষ্ট আকার না ক'রে, যেমন যেমন আকারের শ্লেট্ পাবে, তেমনই তেমনই টালি প্রস্তুত করাবে। ঘরের দেওয়ালের উপর কাঠামো ক'রে চাল প্রস্তুত কর্‌তে হ'বে; আর তার উপর টালি বিছিয়ে চাল ঢাক্‌তে হ'বে। খড়ো ঘরের চাল যেমন হয়, তেমনই হবে। তফাৎ এই যে, খড়ো ঘরের চাল খড় বা বিচালী দিয়ে ছাওয়া

হয়; আর এই ঘর শ্লেটের টালি দিয়ে ছাওয়া হবে। তোমার এখানে শাল কাঠের অভাব নাই। সেই কাঠ চিরিয়ে ঘরের জন্য মজবুৎ কাঠামো প্রস্তুত করাও। তুমি কাল থেকেই টালি প্রস্তুত করতে লোক নিযুক্ত কর।”

শস্যক্ষেত্রের কোন্ কোন্ স্থানে মাটী কাটাইতে হইবে, সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে তাহা দেখাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন “সমতল ভূমি দেখ্‌লেই এক একটী ক্ষেত যত বড় কর্‌তে পার, তা করবে। চল্লিশ পঞ্চাশ বিঘাতেও যদি একটী ক্ষেত হয়, তাও কর্‌বে; কিন্তু ভূমি সমতল হওয়া আবশ্যক; যেন সকল স্থানেই সমান ভাবে জল দাঁড়াতে পারে। তোমার নন্দনপুরে জলের কোনও অভাব হবে না। কালী নদী বা নন্দাতে যদি একটী, আর কালীঞ্জর হ্রদে যদি আর একটী এঞ্জিন্ বসিয়ে দাও, তা হ’লে সমগ্র নন্দনপুরের জমীতেই জল সেঁচন কর্‌তে পার্‌বে। কিন্তু তোমার প্রজারা এঞ্জিন বসাতে পার্‌বে না। তোমাদের কোম্পানী একটী এঞ্জিন্ বসাবেন, আর তুমি তোমার প্রজাদের জন্য কালীঞ্জরে একটী এঞ্জিন্ বসিয়ে দেবে। জল সেচনের জন্য প্রজাদের নিকট বিঘা প্রতি কিছু কর আদায় কর্‌লে, এঞ্জিন্ চালাবার খরচ আর এঞ্জিনের দামও উঠে যাবে। কিন্তু জলসেচনের সুব্যবস্থা ক’রে দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক। মাটীতে যে সার দেওয়া যায়, তাই শস্যে পরিণত হয় বটে; কিন্তু মাটী

সরস না থাক্‌লে, শস্য ফলে না। এই কারণে, শস্য উৎপাদনের জন্য একদিকে যেমন সারের প্রয়োজন, তেমনই অপর দিকে জলেরও প্রয়োজন। যে দেশ কেবল দেব-মাতৃক, সে দেশে দেবতা অকৃপা কর্‌লে কিছুই হবার যো নাই। এই কারণে জমীতে জলসেচনের সুব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তোমার এই নন্দনপুরের মাটীতে সকল প্রকারের শস্য তো হবেই; কিন্তু এখানে কার্পাসের ফসল যেমন হবে, নিকটে আর কোনও মৌজার মাটীতে তেমনটি হবে না। এই এক নন্দনপুর মৌজাতেই যদি বৎসরে দশ পনর হাজার মণ তূলা উৎপন্ন হয়, তা'তে বিস্মিত হয়ো না। এক মণ তূলার দাম যদি ২৫ টাকা হয়, তা হ'লে এই মৌজা থেকে আড়াই লক্ষ তিন লক্ষ টাকার কেবল তূলাই উৎপন্ন হবে। আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তোমাদের এই অঞ্চলে কালক্রমে তূলা ধুন্‌বার কল, সূতার কল, এবং এমন কি, কাপড়ের কলও প্রতিষ্ঠিত হবে।"

সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "বড় বড় ক্ষেত এইজন্য প্রস্তুত কর্‌তে তোমায় বল্‌ছি যে, আবশ্যক হ'লে নন্দনপুরে ষ্টীমের লাঙ্গল চালাতে হবে। আগেও একবার তোমাকে সেই কথা বলেছি। ষ্টীমের লাঙ্গলে মাটী গভীর ভাবে খনিত হবে আর অল্প সময়ের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে। ভারত-

বর্ষের কোনও কোনও স্থানে ষ্টীমের লাঙ্গল চল্‌ছে ব'লে শুনেছি। আমেরিকায় ষ্টীমের লাঙ্গলেই মাটী চষা হয়। ষ্টীমের লাঙ্গলের নীচেই ঘোড়ার লাঙ্গল; তার নীচে মহিষের লাঙ্গল; আর তার নীচে বলদের লাঙ্গল। বড় বড় ক্ষেত না হ'লে ষ্টীমের লাঙ্গল চালানো যায় না। এই কারণে আমার অনুরোধ, কোম্পানীর জমীতেই হোক্, আর তোমার নিজের জমীতেই হোক্, বড় বড় ক্ষেত কাটাতে উপেক্ষা ক'রো না।

"এই গেল এক কথা; আর একটা কথা আমি তোমায় বল্‌তে চাই। এই নন্দনপুরে যেরূপ তৃণাচ্ছাদিত ভূমি ও শালবন আছে, তা'তে এখানে অনায়াসে উৎকৃষ্ট জাতীয় গরু, ঘোড়া, মহিষ ও মেষ উৎপাদন করা যেতে পারে। গোচারণের মাঠের অভাবে বাঙ্গালা দেশের গোবংশ তো শীঘ্রই লোপ পাবে ব'লে মনে হয়। জমীদার মহাশয়েরা এই গোচর ভূমিগুলিকেও গ্রাস ক'রে বসেছেন। তুমি যেন এই মৌজার মধ্যে উৎকৃষ্ট তৃণাচ্ছাদিত ভূমি—অন্ততঃ পাঁচ শত বিঘা—আলাদা ক'রে রেখে দিতে কিছুতেই ভুলো না। তোমার দ্বারা হোক্, আর তোমার ছেলেদের দ্বারাই হোক্, এক দিন না এক দিন এখানে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট জাতীয় গো মহিষ ও অশ্ব উৎপাদনের কোনও ব্যবস্থা হ'লে তাতে যে কেবল প্রচুর লাভ হবে, তা নয়; পরন্তু দেশেরও প্রভূত মঙ্গল হবে। মোটামুটি

এই সকল উদ্দেশ্য চক্ষের সম্মুখে রেখে কাজ ক'রে যাও।"

এই বলিয়া সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে কি যেন মনে হওয়াতে তিনি হাসিয়া বলিলেন "হাঁ, একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। তোমাদের কবি অতুলচন্দ্র এবৎসর রসায়ন-শাস্ত্রে এম্‌-এ পরীক্ষা দিয়েছেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি বি-কোর্স নিয়েছিলেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাঁর বেশ জ্ঞান আছে দেখেছি। লোকটি এক অদ্ভুত রকমের কবি—অপর কবিদের মত কেবল ফুলে, ফলে, লতায় পাতায়, পাখীর গানে, চাঁদের জোছনায় ও নারীর প্রেমে কবিত্ব দেখেন না। তিনি বলেন, রসায়নে কবিত্ব আছে, বিজ্ঞানে কবিত্ব আছে, লোকসেবায় কবিত্ব আছে, কার্য্যে কবিত্ব আছে, সুখে কবিত্ব আছে, দুঃখেও কবিত্ব আছে। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডটিই তাঁর নিকট কবিত্বময়, এবং স্বয়ং পরমেশ্বর এক, অদ্বিতীয় ও মহান্‌ কবি। বড় চমৎকার লোক। তিনি এম্‌-এ পরীক্ষার ফল দেখেই এখানে আস্‌বেন। 'এখন পর্য্যন্ত বিয়েটিয়ে কিছুই করেন নাই'। মনে করেছি, কোনও ভাল কৃষিকলেজে কিছুদিন পড়্‌বার জন্য আমি তাঁকে বল্‌ব। তিনি বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ ক'রে এলে, তোমাদের বিলক্ষণ উপকার হবে। তাঁকে তোমার ঐ কাছারী-বাড়ীর কাছে উত্তর-

দিকে খানিকটা জায়গা দিতে হবে, তার জন্য তোমায় বল্‌তে আমায় ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ ক'রে গেছেন।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "অতুলের জন্য আমি স্থান নির্ব্বাচন ক'রে রেখেছি।"

ষট্পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

ফেব্রুয়ারী মাসে ডেপুটী কমিশনার সাহেব, পুলীশ সাহেব ও রঁাচির জুডিশিয়াল্ কমিশনার সাহেব প্রভৃতি নন্দনপুরে মৃগয়া করিতে আসিলেন। অধিত্যকার উপর তাঁহাদের তাম্বু পড়িল। ডেপুটী কমিশনার সাহেব ক্ষেত্রনাথের উদ্যোগ ও কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। সকলেই তাঁহার প্রস্তরনির্ম্মিত দুইটী বাটী ও বাটীর উপরে শ্লেটের ছাদ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

মৃগয়াতে সাহায্য করিবার জন্য চতুর্দ্দিকের গ্রাম হইতে বহুলোক আনীত হইল। তাহারা এক একটী অরণ্য তিন দিকে বেষ্টন করিয়া দুন্দুভি প্রভৃতি বাজাইতে বাজাইতে ও ভীষণ রবে চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। যে দিক্ লোকদ্বারা বেষ্টিত হয় নাই, সেই দিকে দুই তিনটি উচ্চ মঞ্চের উপর সাহেবেরা বন্দুক লইয়া বসিয়া রহিলেন। দুন্দুভির ধ্বনিতে ও লোকের চীৎকারে সন্ত্রস্ত হইয়া বন্য পশুপাল সেই মঞ্চসমূহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অমনই সাহেবেরা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে লাগিলেন। কতকগুলি পশু নিহত হইল; কিন্তু অধিকসংখ্যক পশু বেগে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। প্রথমদিনের মৃগয়াতে একটী

নরখাদক বড় ব্যাঘ্র, তিনটি চিত্রেক বা চিতা বাঘ, সাতটি ভল্লুক ও দশটি হরিণ নিহত হইল।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনের মৃগয়াতেও অনেক বন্য পশু নিহত হইল। সর্ব্বসমেত দুইটী নরখাদক বৃহৎ ব্যাঘ্র, দশটি চিত্রক, পঁচিশটি ভল্লুক ও সাতাইশটি হরিণ নিহত হইল। মৃগয়া করিয়া সাহেবদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা কালীঞ্জরের হ্রদ এবং তাহাতে অসংখ্য জলচর পক্ষী দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিন্তু কালীঞ্জরে কোনও নৌকা বা জলিবোট না থাকায়, সেখানে পাখী মারিবার সেরূপ সুবিধা হইল না। যাহা হউক, আগামী বৎসর শীতকালে তাঁহারা মৃগয়া করিবার জন্য আবার যে নন্দনপুরে আসিবেন, তাহা ক্ষেত্রনাথকে বলিয়া গেলেন।

এই মৃগয়ার পর নন্দনপুরের অরণ্যসমূহ অনেক পরিমাণে নিরুপদ্রব হইল। ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক প্রজাগণের গোমহিষাদি বিনষ্ট হওয়ার কথা আর শ্রুত হইল না। ক্ষেত্রনাথ অরণ্যের কিয়দংশের বৃক্ষাদি কাটাইয়া দিয়া তন্মধ্যে একস্থান হইতে স্থানান্তর গমনাগমনের নিমিত্ত সুপ্রশস্ত ও সুগম পথসমূহ প্রস্তুত করাইয়া দিলেন।

মার্চ্চমাসে ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রের সমভিব্যাহারে কালাবুরু পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী সেই শালের অরণ্য দেখিয়া আসিলেন। মুণ্ডা আঠার শত টাকা সেলামী

লইয়া বার বৎসরের জন্য সেই অরণ্য ইজারা দিতে সম্মত হইল। তৎসম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিবার জন্য অন্যান্য পরিচালকগণকে পত্র লিখিত হইল।

কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গের বাসগৃহ ও খামারবাড়ী প্রস্তুত করিতে ২০০০৲ টাকা, আটশত বিঘা ভূমির সেলামীতে ১৬০০৲ টাকা এবং চারিশত বিঘা ভূমিকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতে ২০০০৲ খরচ হইল। এতদ্ব্যতীত কর্ম্মচারিগণের বাসাখরচ এবং চাকর ও ব্রাহ্মণের বেতন ইত্যাদিতেও প্রায় ৩০০৲ টাকা খরচ হইল। এইরূপে ৮০০০৲ টাকার মধ্যে ৫৯০০৲ টাকা খরচ হইয়া ২১০০৲ টাকা অবশিষ্ট রহিল। ষ্টীম্‌পরিচালিত লাঙ্গল আনয়নের অপেক্ষা না করিয়া ক্ষেত্রনাথ পরিচালকগণের পরামর্শক্রমে এখন গোমহিষের লাঙ্গল দ্বারাই চাষ আবাদ করা স্থির করিলেন। তদনুসারে বার জোড়া মহিষ ও তের জোড়া বলদ এক হাজার টাকায় ক্রীত হইল এবং অবশিষ্ট টাকা চাষের খরচপত্রের জন্য সঞ্চিত রাখা হইল। এক বৎসরের মধ্যে কৃষিকার্য্যে কত টাকা লভ্য হয়, তাহা দেখিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ পরে শালের অরণ্য বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিবেন, তাহা জানাইলেন।

ক্ষেত্রনাথের উপদেশ ও পরিচালনে নিশি, যতীন্দ্র,

চারু ও অতুলচন্দ্র কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

বৎসরের শেষে চৈত্রমাসে হিসাব নিকাশ করিয়া ক্ষেত্রনাথ দেখিলেন যে, তাঁহাদের দোকানে সর্ব্বপ্রকার খরচবাদে প্রায় ৩৫০০৲ টাকা লাভ হইয়াছে। মাধব দত্ত মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। লভ্যের টাকা গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা তদ্দ্বারা দোকানসমূহের মূলধন বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন।

নববর্ষের প্রথমভাগেই নন্দনপুরের মহুয়া ফুল, কচড়া তৈল, কুসুম তৈল, লাহা, তসর, হরিতকী, আমলা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ক্ষেত্রনাথ প্রায় ৫০০০৲ টাকা পাইলেন। ব্যবসায়ের হিসাবে কঁচড়া তৈল প্রভৃতি কলিকাতায় রপ্তানী করিয়াও তিনি ৪০০০৲ টাকা লভ্য পাইলেন।

রজনী বাবু শ্রাবণ মাসে নন্দনপুরে আসিয়া কৃষিক্ষেত্র-সমূহের এবং প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহদ্বয়ের শোভা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি তাঁহার নির্ব্বাচিত ভূমির উপর একটী বাঙ্গলা নির্ম্মাণের জন্য ক্ষেত্রনাথের উপর ভার অর্পণ করিলেন।

সেই বৎসর সুচারুরূপে বৃষ্টিপাত হওয়ায় নন্দনপুর-কৃষি-কোম্পানী তাঁহাদের কর্ষিত চারিশত বিঘা ভূমি হইতে দুই হাজার চারিশত মণ ধান্য, দেড়শত মণ

কলাই, একশত মণ অড়হর, পঞ্চাশ মণ মুগ ও ছয়শত মণ গোলআলু প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ বিঘা ভূমিতে কার্পাস ছিল। কার্পাস ব্যতীত শস্য ও ফসলের মূল্য প্রায় ৫৫০০৲ টাকা অবধারিত হইল। সমগ্র মূলধনের মধ্যে কেবল ৮০০০৲ টাকা মাত্র গৃহাদি নির্ম্মাণে, গবাদি পশুক্রয়ে ও কৃষিকার্য্যে ব্যয় করিয়া এত টাকার শস্য ও ফসল উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা কলিকাতার পরিচালকগণ প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এই কারণে, রজনীবাবু তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নন্দনপুরে আসিলেন। সকলেই নন্দনপুরের শোভা এবং কৃষিজাত শস্যাদি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারাও পার্ব্বত্যনিবাসের জন্য নন্দনপুরে একএকটী গৃহনির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিলেন।

অবশিষ্ট চারিশত বিঘা ভূমিকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইল। ক্ষেত্রনাথের পরিচালনা এবং অতুলচন্দ্র প্রভৃতির যত্ন, উদ্যম, ও পরিশ্রম সকলেরই প্রশংসার বিষয় হইল। আগামী বর্ষ হইতে অতুলচন্দ্রের মাসিক ৭৫৲ টাকা এবং চারু, যতীন্দ্র ও নিশিকান্তের মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া বেতন অবধারিত হইল। পরিচালকগণ ক্ষেত্রনাথকেও মাসিক ১০০৲ টাকা বেতন দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ক্ষেত্রনাথ বলিলেন যে, কোম্পানার বর্ত্তমান অবস্থায় তিনি কিছুই গ্রহণ করিবেন না।

পরিচালকগণের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষেত্রনাথের সহিত সেই শালের অরণ্যটি দেখিয়া আসিলেন; মুণ্ডার নিকট তাহা বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া স্থিরীকৃত হইল। জঙ্গলের সেলামী ও জঙ্গলের কার্য্য করিবার জন্য পরিচালকগণ ৮০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিলেন।

ক্ষেত্রনাথ নন্দনপুরের কাছারীবাটীর সমীপবর্ত্তী তাঁহার খাশদখলী সাতশত বিঘা ভূমির মধ্যে দুইশত বিঘা ভূমি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিলেন এবং আগামী বর্ষ হইতে তাহা নিজে চাষ-আবাদ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। নগেন্দ্রনাথ দোকান লইয়া ব্যস্ত থাকায়, তিনি অমরনাথকে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে নন্দনপুরের কৃষিকার্য্যের ভার প্রদান করিলেন এবং তাহাকে পঁচিশ বিঘা ভূমি বিনা সেলামীতে বার্ষিক খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অমরনাথের পদে আর একটী ব্যক্তি পাঠশালার শিক্ষক ও পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হইলেন।

সপ্ত-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

নন্দনপুর-কৃষি-কোম্পানীর বার্ষিক বিবরণ পাঠ করিয়া সতীশচন্দ্র অতীব আহ্লাদিত হইয়া ক্ষেত্রনাথকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। অন্যান্য কথার পর সতীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন ঃ—

"তোমাদের প্রথমবর্ষের কৃষিকার্য্যের ফল অতীব আশাপ্রদ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিবর্ষেই যে ফল এইরূপ আশাপ্রদ হইবে, তাহা মনে করিও না। কৃষির শত্রু অনেক। প্রথমতঃ অনাবৃষ্টি ; দ্বিতীয়তঃ অতিবৃষ্টি ; তৃতীয়তঃ উপযুক্ত সারের অভাব ; চতুর্থতঃ যথাসময়ে জলসেচনের অভাব ; এবং পঞ্চমতঃ শস্যের নানাপ্রকার রোগ ও শস্যনাশক কীটপতঙ্গাদির উৎপাত। এই-সমস্ত আপৎ-নিবারণের জন্য তোমাদিগকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নন্দনপুরে তোমরা জলসেচনের সুব্যবস্থা করিয়াছ ; সুতরাং তাহার অভাব হইবে না এবং অনাবৃষ্টির আশঙ্কাও তোমাদিগকে পীড়িত করিতে পারিবে না। কিন্তু অতিবৃষ্টি হইলে, যাহাতে বৃষ্টির জল শস্যক্ষেত্রসমূহ হইতে সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কারণে সর্ব্বত্র drainage বা জলনিকাশের সুব্যবস্থা করিবে। নন্দন-

পুরের মাটী এখন স্বভাবতঃই উর্ব্বর আছে। বহুকাল হইতে জঙ্গলের গলিতপত্র ও উদ্ভিজ্জাদি পচিয়া মাটীর সহিত মিশিয়াছে। এই কারণে নন্দনপুরে মাটীতে এখন দুই চারি বৎসর সার না দিলেও চলিবে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে মাটীর সারই শস্যে পরিণত হয় (It is manure that is converted into crops)। প্রতি বৎসর যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, সেই পরিমাণে জমীর উৎপাদিকা শক্তি অর্থাৎ সারাংশও কমিয়া যায়। সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য জমীতে প্রতিবৎসর গোময় প্রভৃতি দিতে হয়। দুই তিন বৎসর পরে, তোমাদের জমীতে সার দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইবে। নতুবা ফসল আশানুরূপ উৎপন্ন হইবে না। তোমাদের জমীর পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। কোম্পানী এখন চারিশত বিঘা জমী আবাদ করিতেছেন; তোমারও আবাদী জমীর বর্ত্তমান পরিমাণ দুই তিন শত বিঘা হইবে। ভবিষ্যতে তোমাদের জমীর পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এত জমীর জন্য তোমরা প্রচুর সার পাইবে কোথা হইতে? কৃষক মাত্রেই বহুসংখ্যক গো-মহিষ পালন করে এবং তাহাদের পুরীষগুলি জমীতে সাররূপে ব্যবহার করে। তোমা-দিগকেও এইজন্য বহুসংখ্যক গোমহিষ পুষিতে হইবে। চাষের জন্য তোমরা যতগুলি মহিষ-বলদ রাখিবে, কিম্বা

দুগ্ধের জন্য যতগুলি গাভী পালন করিবে, তাহাদের পুরীষ তোমাদের সমস্ত জমীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত সার হইবে না। পর্য্যাপ্ত সারের জন্য তোমাদিগকে আরও অধিকসংখ্যক গোমহিষ পালন করিতে হইবে। কিন্তু বহু গোমহিষ পালন করিতেও বিস্তর অর্থব্যয় হয়। এই কারণে কৃষি-কাজের সঙ্গে সঙ্গে যদি গোয়ালারও কাজ করা যায়, তাহা হইলে সুবিধা হইতে পারে। 'গোয়ালার কাজ' এই বাক্যটি পাঠ করিয়াই নাসিকা সঙ্কুচিত করিও না। ইহা নিকৃষ্ট কাজ বা নীচবৃত্তি নহে। ইংরেজীতে তোমরা এই কাজকে dairy-farming বলিয়া থাক। আপনাদিগকে যদি গোয়ালা বলিয়া পরিচিত করিতে লজ্জা হয়, তাহা হইলে dairy-farmers বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিও। ডেয়ারী স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে বিশুদ্ধ দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত ও জমান দুগ্ধ যোগাইতে পারিলে, বিস্তর লাভ করিতে পারিবে; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গোপালন এবং গোজাতির উন্নতিসাধনও করিতে সমর্থ হইবে। আমি যে তোমাকে পাঁচশত বিঘা গোচারণের ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে বলিয়াছি, তাহা এই উদ্দেশ্যেই বলিয়াছি। বহু গোমহিষ পালন করিলে, তাহাদের দুগ্ধ হইতে তো বিস্তর লাভ হইবেই, অধিকন্তু তোমাদের জমীর জন্য প্রচুর সারেরও অভাব হইবে না। আমার মনে হয়, আমাদের দেশে এখনও ষাঁড়ের লাঙ্গল পরি-

চালনের সময় উপস্থিত হয় নাই। ষ্টীমের লাঙ্গল সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে, গোজাতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে গোময়েরও অভাব হইবে। তোমাদের কোম্পানী যেরূপ বৃহদাকারে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে দুই একটী কলের লাঙ্গল চালাইতে পারা যায়, সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধারণতঃ গোমহিষের লাঙ্গলই আমাদের দেশের পক্ষে একান্ত উপযোগী। যাহা হউক, ইহা স্মরণ রাখিবে যে, গোময় সংগ্রহ করিয়া তোমাদের জমীতে সার দিতে হইবে এবং যাহাতে প্রচুর গোময় সংগৃহীত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। সার-সংগ্রহের জন্য আর একটী উপায় অবলম্বন করিবে। নন্দনপুরে অরণ্যের অভাব নাই। প্রতি বৎসর ফাল্গুন চৈত্র মাসে অরণ্যের বৃক্ষসমূহ হইতে বিস্তর পাতা ঝরিয়া পড়ে। সেই পাতাগুলি শুকাইয়া নষ্ট হয়। আমার প্রস্তাব এই যে, তোমরা স্থানে স্থানে একএকটী গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে শুষ্ক পাতাগুলি নিক্ষেপ করিবে। বর্ষার জলে সেই পাতাগুলি পচিয়া গেলে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট সার হইবে। তোমরা যদি এই উপায় অবলম্বন কর, তাহা হইলে, তোমাদের কখনও সারের অভাব হইবে না। গোময় ও পচা পাতা ব্যতীত, খইলও উৎকৃষ্ট সার। সরিষা, গুঞ্জা ও তিলের খইল সাররূপে ব্যবহার করিতে গেলে, তোমাদের ব্যয় অধিক হইবে

এবং গোমহিষের আহার্য্যেরও অভাব হইবে। এই কারণে, আমার প্রস্তাব এই যে, তোমরা টাঁড় জমীতে প্রতিবৎসর রেড়ীর চাষ করিয়া, তাহা হইতে তৈল নিষ্কাশিত করিলে, তোমাদের বিলক্ষণ লাভ হইবে; অধিকন্তু রেড়ীর খইল সাররূপে ব্যবহার করিতে পারিবে। রেড়ীর খইল হইতে উৎকৃষ্ট সার হয়। এইরূপ নানা উপায়ে তোমাদের জমীর জন্য প্রচুর সার সংগ্রহ করিতে কথনও শৈথিল্য করিও না। জমীর সারই যে শস্য ও ফসলে পরিণত হয়, এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। মাটী যেরূপই হউক না কেন, তাহাতে যদি সার দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা উর্ব্বর হইবে এবং ফসলও উৎপাদন করিবে। সামান্য জল হইলেও, ফসল হইতে পারে; কিন্তু জমীতে সার না থাকিলে, কেবলমাত্র প্রচুর বৃষ্টি বা জলসেচন দ্বারা কথনও ভাল ফসল হইতে পারে না।

"এই গেল এক কথা; আর একটা কথা আমি তোমাকে বলিতে চাই; তাহাও তোমাদের প্রণিধান-যোগ্য। একই জমীতে প্রতিবৎসর একজাতীয় শস্য বপন করিও না। এক এক বৎসর এক এক জাতীয় শস্য বপন করিবে। বিভিন্ন জাতীয় শস্যের বিভিন্ন গুণ আছে। সকল শস্যেরই খাদ্য একপ্রকার নহে। কোনও শস্য মাটী হইতে একপ্রকার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বর্দ্ধিত হয়; অপর

শস্য আবার অন্যপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করে। যদি একজাতীয় শস্য একই মাটীতে প্রতিবৎসর বপন করা যায়, তাহা হইলে, সেই শস্যের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব হইয়া পড়ে। কাজেই, তাহার ফসল ভাল হয় না। এই কারণে পর্য্যায়ক্রমে (by rotation) জমীতে বিভিন্ন জাতীয় শস্য বপন করিবে। আর সকল জমীতেই প্রতিবৎসর শস্যের আবাদ করিও না। ভূমি সত্যসত্যই গর্ভধারণ করে। সকলেই জানে যে, স্ত্রীলোকের প্রতি-বৎসর সন্তান হইলে প্রসূতি দুর্ব্বল ও নির্জ্জীব হইয়া পড়েন এবং সন্তানগুলিও দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়। কিন্তু যাঁহার তিন চারিবৎসর অন্তর সন্তান হয়, তিনি নিজে সবল ও সুস্থ থাকেন, এবং সন্তানগুলিও সবল ও সুস্থ হয়। সেইরূপ প্রতিবৎসর শস্য উৎপাদন করিতে করিতে ভূমির প্রজননী শক্তির হ্রাস হয়। সেই লুপ্তশক্তির পুনঃসঞ্চয়ের জন্য ভূমিকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। বিশ্রাম করিতে না দিলে, ভূমি পূর্ব্ববৎ আর উর্ব্বর থাকে না এবং নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। এই কারণে দুই এক বৎসর অন্তর এক এক বৎসরের জন্য ভূমিকে অনাবাদী (fallow) অবস্থায় ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সেই ভূমিতে কেবল লাঙ্গল দিয়া রাখিলে, তাহা বায়ুমণ্ডল হইতে তাহার উর্ব্বরশক্তি-সাধক বস্তুচয় আকর্ষণ করিয়া লইয়া পুষ্ট ও সতেজ হয়। তোমাদের কোম্পানীর যখন আটশত বিঘা ভূমি আছে,

তখন তোমরা অনায়াসে একবৎসর চারিশত বিঘা ভূমি আবাদ করিয়া অপর চারিশত বিঘা ভূমি ফেলিয়া রাখিতে পার। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে চাষ করিলে, তোমাদের কখনও প্রচুর ফসলের অভাব হইবে না।

"আলু, কার্পাস, ধান্য প্রভৃতি ফসলের কখনও কখনও নানাবিধ রোগ উপস্থিত হয়। সময়ে সময়ে নানাপ্রকার কীটাণু প্রভৃতিও জন্মিয়া ফসল নষ্ট করিয়া থাকে। এই সকল উৎপাত নিবারণ না করিলে, ভাল ফসল হয় না। যখনই এইরূপ কোনও উৎপাত উপস্থিত হইবে, তখনই কোনও বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানাভিজ্ঞ (expert) ব্যক্তির দ্বারা রোগের পরীক্ষা ও প্রতীকার করাইবে। আমার বিবেচনায় তোমাদের অতুলচন্দ্রকে কোনও কৃষি-কলেজে কিছুদিন কৃষিবিজ্ঞান শিখিবার জন্য যদি পাঠাইতে পার, তাহা হইলে খুব ভাল হয়। আমিও অতুলকে এই কথা বলিয়াছি।

"উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, তোমরা কেবল কৃষাণ মুনিষের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না। 'আঁতে পুতে চাষ'—এইরূপ একটী প্রবাদ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। এই প্রবাদবাক্যটি খুব সত্য। নিজে না দেখিলে, কৃষিকার্য্যে কেহ কখনও লাভবান্ হইতে পারে না। এই কারণে, কৃষিকার্য্যের প্রত্যেক অঙ্গ নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিবে। প্রত্যেক ফসলের পুঙ্খানু-

পুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। কি কারণে ফসল ভাল বা মন্দ হইল, তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক ফসলের বিবরণের নিম্নে নিজ মন্তব্যও লিখিয়া রাখিবে; তদ্দ্বারা তোমাদের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মিবে। এই অভিজ্ঞতাফলে তোমরা কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইবে।

"হাঁ, একটী কথা তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কাপাসের বীজ গোমহিষের পক্ষে বিলক্ষণ পুষ্টিকর খাদ্য। গোমহিষকে গোটা বীজ না খাওয়াইয়া, বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত করিয়া লইয়া তাহার খইল তাহাদিগকে খাইতে দিবে। কার্পাস-বীজের তৈল অনেক কাজে লাগে এবং তাহা মূল্যবান্ সামগ্রী। সুতরাং প্রচুর কার্পাস জন্মিতে আরম্ভ করিলে, তাহার বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত করিতে ভুলিও না।"

অষ্ট-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

পাঁচবৎসর পরে নন্দনপুরের শ্রী একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। অধিত্যকার উপর প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহশ্রেণী শোভা পাইতে লাগিল; নির্জ্জনস্থান সজন হইল। ক্ষেত্রনাথ নন্দনপুরেও হাটবাজার স্থাপন করিলেন।

নন্দনপুরে অনেক সুবিন্যস্ত ও সুদৃশ্য প্রজাপল্লী স্থাপিত হইল। পাঁচবৎসর পূর্ব্বে যে স্থানে জনমানবের সঞ্চার ছিল না, সেই স্থানের লোকসংখ্যা সহস্রাধিক হইল। হিংস্রজন্তুর উপদ্রব একেবারে তিরোহিত হইল।

নন্দনপুরের কাছারীবাটীর উত্তরভাগে অতুলচন্দ্র একটী মনোরম বাঙ্গলা প্রস্তুত করাইলেন এবং অবসর সময়ে একখানি আরামচৌকীতে উপবিষ্ট হইয়া কালাবুরু ও কালীঝরের মনোহারিণী শোভা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন।

অতুলচন্দ্র একটী কৃষিবিদ্যালয়ে দুইবৎসর পড়িয়া এবং স্বহস্তে কাজ করিয়া ও স্বচক্ষে কৃষিকার্য্য দেখিয়া বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী শিক্ষা করিলেন। নানাস্থানে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত আদর্শ কৃষিক্ষেত্র-সমূহও পরিদর্শন করিয়া তিনি কৃষিবিদ্যায় বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। সেই অভিজ্ঞতাফলে বল্লভপুর ও নন্দনপুরের কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতিসাধন হইল।

রজনীবাবু মধ্যে মধ্যে সপরিবারে নন্দনপুরে আসিয়া বাস করিতেন এবং নন্দনপুরের কৃষি ও বাণিজ্য সমবায়ের ক্রমোন্নতি দেখিয়া আনন্দলাভ করিতেন।

সতীশচন্দ্র পুরুলিয়া হইতে বীরভূমে বদ্‌লী হইয়াছেন। নন্দনপুরে ক্ষেত্রনাথের কাছারীবাটীর দক্ষিণভাগে তিনিও একটী মনোহর প্রস্তরময় গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, এবং প্রতিবৎসর পূজাবকাশের সময় সপরিবারে নন্দনপুরে আসিয়া তাহাতে বাস করেন। সৌদামিনীর ক্রোড় দেবশিশুর ন্যায় একটী পুত্ররত্নে অলঙ্কৃত হইয়াছে। যে সময়ে সৌদামিনী নন্দনপুরে আসেন, সেই সময়ে মনোরমাও দুই তিন দিন অন্তর নন্দনপুরে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। সৌদামিনীও অবসরক্রমে মনোরমাদের বাটীতে ও পিতৃগৃহে গমন করেন।

কোম্পানীর অংশীদারগণের মধ্যেও অনেকে সময়ে সময়ে সপরিবারে নন্দনপুরে আসিয়া নিজ নিজ বাটীতে বাস করেন। নন্দনপুরে যাঁহাদের কোনও প্রকার কার্য্য-সংস্রব নাই, কলিকাতাবাসী এইরূপ অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও বায়ুপরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে সেখানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে নিজ নিজ বাটীতে আসিয়া বাস করেন।

"নন্দনপুর কৃষি ও বাণিজ্য-সমবায়" কৃষিকার্য্যে বাৎসরিক ১৫০০০৲ টাকা এবং কাষ্ঠের কারবারে বাৎসরিক

১৮০০০৲ টাকা লাভ করিতেছেন। তাঁহাদের সঞ্চিত মূলধন ৭০০০০৲ টাকা হইয়াছে এবং তাহা কলিকাতার একটী ব্যাঙ্কে মৌজুৎ করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক অংশী-দার সর্ব্বপ্রকার খরচবাদে বার্ষিক প্রায় ১৫০০৲ টাকা লভ্য পাইতেছেন। অতুলচন্দ্র এখন মাসিক ১০০৲ টাকা এবং যতীন্দ্র প্রভৃতি মাসিক ৭৫৲ টাকা বেতন গ্রহণ রিতেছেন।

ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুর ও নন্দনপুরের প্রজাগণের নিকট প্রায় ৪০০০৲ টাকা খাজনা আদায় করিতেছেন। নন্দী পুরের বনজদ্রব্যাদি হইতে বার্ষিক ৬০০০৲ টাকা, দোকান হইতে বার্ষিক ৫০০০৲ টাকা, কৃষিকার্য্য হইতে বার্ষিক ১২০০০৲ টাকা, কলিকাতায় প্রতিবৎসর কঁচড়াতৈলাদি চালান দিয়া গড়ে ৫০০০৲ টাকা এবং কোম্পানীর কার-বার ও কৃষি হইতে বার্ষিক ১৫০০৲ টাকা লভ্য ও মাসিক বেতন ১২৫৲ টাকা প্রাপ্ত হইতেছেন। সর্ব্বসমেত তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় ৩৫০০০৲ টাকা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কলিকাতার একটী প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কে তাঁহার যে লক্ষ টাকা মৌজুৎ হইয়াছে, তাহা হইতেও তিনি বার্ষিক ৪০০০৲ টাকা সুদ পাইতেছেন।

যে ব্যক্তি ক্ষেত্রনাথের কলিকাতার পৈত্রিক বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি তাহা বিক্রয় করিতে উদ্যত হওয়ায় ক্ষেত্রনাথ তাহা ১৫০০০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন।

এবং তাহার সংস্কার ও তাহা দুই অংশে বিভাগ করিয়া একাংশ মাসিক ৬০৲ টাকা ভাড়ায় বিলি করিয়াছেন ও অপরাংশ আপনাদের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তিলাভ করিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ-এ পড়িয়াছিল, এবং এফ-এ পরীক্ষাতেও মাসিক ২৫৲ টাকা [illegible]ভ করিয়া উক্ত কলেজে বি-এ পড়িয়াছিল। সে [illegible]বৎসর বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে ফার্ষ্ট ক্লাস অনার প্রাপ্ত হইয়া শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

বল্লভপুরে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা নাই দেখিয়া নরুর মাসীমাতা সৌদামিনী তাহাকে বীরভূমে আপনার কাছে লইয়া গিয়াছেন এবং সে সেই স্থানের স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া উৎসাহের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিতেছে।

বল্লভপুরের পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায়, তাহা একটী মধ্যবাঙ্গলা ও মধ্যইংরাজী স্কুলে পরিণত হইয়াছে এবং ক্ষেত্রনাথ তাঁহার বাটীর পশ্চিমদিকের মাঠে একটী পাকা স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। স্কুলে চারিজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। বালিকাদের জন্যও ক্ষেত্রনাথ একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন; তাহার জন্যও দুইজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।

গভর্ণমেণ্ট আমাকে কোনও সম্মান বা উপাধি প্রদান না করেন, তজ্জন্য আপনি পুনর্ব্বার গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া আমাকে সুখী ও নিশ্চিন্ত করিবেন।” কিন্তু ক্ষেত্র-নাথের এই প্রার্থনা বিফল হইল; যথাসময়ে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে “রায় বাহাদুর” উপাধিভূষণে ভূষিত করিলেন। এই উপাধিলাভে ক্ষেত্রনাথ ও কমিশনার সাহেব কেহই সন্তুষ্ট হইলেন না। কমিশনার সাহেব ক্ষেত্রনাথের জন্য কোনও উচ্চতর উপাধির প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। সেই আশা বিফল হওয়াতে তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষেত্র-নাথ সম্বন্ধে আর একটী সুবিস্তৃত ও প্রশংসাসূচক রিপোর্ট করিলেন। তাহার ফলে দুই বৎসর পরে ক্ষেত্রনাথ সি, আই, ঈ (C. I. E.) উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। কলিকাতার “বেল্‌ভিডিয়ার” প্রাসাদের দরবার উপলক্ষে ক্ষেত্রনাথকে এই শেষোক্ত উপাধি প্রদানের সময় ছোট লাট বাহাদুর তাঁহার উদ্যম, অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতার উল্লেখ করিয়া তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিবার নিমিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণকে সাদরে আহ্বান করেন এবং ক্ষেত্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

নন্দনপুরে ক্ষেত্রনাথের কার্য্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই। নন্দনপুরের বহু শত বিঘা জমী এখনও অকৃষ্ট ও পতিত রহিয়াছে; এখনও শ্লেটের পাহাড় দুইটী তেমনই দণ্ডায়মান রহিয়াছে; এখনও নন্দনপুরের অভ্র, তাম্র ও লৌহের

খনিসমূহ তেমনই স্বাভাবিক অবস্থায় পতিত রহিয়াছে; এখনও নন্দনপুরের সর্ব্বত্র বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই, এবং এখনও নন্দনপুরে কার্পাস-বিধূনন-যন্ত্র ও বস্ত্রবয়নযন্ত্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ ইঞ্জিনীয়ার হইয়া আসিয়া এই সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, তাহা সে তাহার পিতাকে বলিয়াছে। সুরেন্দ্র ইঞ্জিনীয়ার হইয়া আসিয়া নন্দনপুরের কি প্রকার উন্নতি সাধন করে, তাহা দেখিবার জন্য সকলের ঔৎসুক্য থাকিলেও, তজ্জন্য আরও পাঁচ বৎসর কাল পাঠকবর্গের ধৈর্য্যশক্তি পরীক্ষা করা অন্যায় ভাবিয়া অরণ্যবাসের এই অদ্ভুত ইতিবৃত্ত আমি এই স্থানেই সমাপ্ত করিলাম।